গ্রন্থকারের নিবেদন

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার—গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা', গিরিশচন্দ্রের "বুদ্ধদেব চরিত" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন" এই তিনখানি নাটকের সমালোচনা গ্রথিত করা হয়েছে। গ্রন্থকারমাত্রেরই যা' নিবেদন আমার নিবেদনও তাই,—পাঠকরা গ্রন্থখানি পড়ে আনন্দিত হ'লে আমি সার্থককাম হব। তবে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বিশেষ বক্তব্য থাকে, আমারও আছে এবং সেই বিশেষ বক্তব্যটুকু এক্ষেত্রে এই যে, অল্পদামের পাতলা কাগজে, ছোট অক্ষরে এবং ঘন-পংক্তিতে ছাপা আলোচনা দেখলেই গ্রন্থকে "অর্থ-পুস্তক" নাম দেওয়া এ রেওয়াজ আগে শুধু অল্পমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; এখন শিক্ষকদের মধ্যেও অল্পাধিক সঞ্চারিত হয়েছে। আমাদের মত ছোট ছোট অখ্যাতনামা গ্রন্থকারের পক্ষে, অর্থাৎ যাঁরা বহুমূল্যের মোটা কাগজে, বড় অক্ষরে এবং বৃহৎ কলেবরে বই ছাপতে পারে না তাঁদের পক্ষে, ব্যাপারটি খুবই ভয়ের। আরো ভয়ের এই কারণে যে যাঁরা এই ব্যাপারে বিধাতার আসনে বসে আছেন, যাঁদের প্রসন্ন দৃষ্টির উপরে গ্রন্থের জীবন এবং অপ্রসন্ন দৃষ্টির উপরে গ্রন্থের অপমৃত্যু নির্ভর করে, তাঁরা কেমন যেন উদাসীন এবং আত্ম-সমাহিত। বর বা অভয় কোনটিই তাঁরা দান করেন না। বর বা অভয় দিতে হ'লে যেটুকু সময় ও মন দেওয়া দরকার সে সময় ও মন তাঁদের কোথায়? আমাদের দেশে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের হাতে সময় খুবই কম। ফলে অপরের লেখা পড়ার সময় ও ধৈর্য তাঁদের থাকে না বললেই চলে। এই কারণেই তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই "পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি" হ'য়ে থাকেন। এবং তাঁদের উদাসীনতার সুযোগ নিয়েই স্বার্থসেবীরা নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকেন। এ শোচনীয় অবস্থাই বটে!

এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে এবং কিভাবে হবে বিশেষজ্ঞরাই তা'

বলতে পারবেন। আমার বলার কথা শুধু এই—পাঠকরা যেন মনে না করেন—অ-পাঠ্য গ্রন্থমাত্রই অপাঠ্য বা "অর্থ-পুস্তক"। অর্থপুস্তক এবং সমালোচনা গ্রন্থের পার্থক্য কি তা' বুঝিয়ে বলতে তথা পাঠকদের বিচার বুদ্ধির অসম্মান করতে আমি চাইনে। এত কথা যে বলতে হ'ল, তাতেই আমি অতিশয় লজ্জিত। আশাকরি যাঁরা গ্রন্থগুলি মন দিয়ে পড়বেন তাঁরা এদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আলোচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে বিশেষ বিশেষ নাটকের জাতি, গঠন, রস ও চরিত্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে যত রকম প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি তাদের উত্থাপন এবং যথাসাধ্য আলোচনা করেছি। কোন সমস্যাকেই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। সমাধান করতে পেরেছি কি না সে বিচার পাঠকরা করবেন।

এ কথা ঠিক বটে যে কোন কোন বিষয়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সাধারণ পাঠকের কাছে যা' সুবোধ্য তা'র বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিনি; কিন্তু এ কথাও ব'লতে চাই যে সমগ্র আলোচনা পড়ার পরে, সব পাঠকেরই মনে নাটকের গঠন-বৈশিষ্ট্য চরিত্র-সৃষ্টি, অঙ্গীরস জাতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। সব ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনাকে ভাগ করা হয়নি; তার অর্থ এ নয় যে সেই বিষয়টি আলোচিত হয়নি। যেমন দেখা যাবে, মেবার-পতন নাটকের আলোচনায়, গঠন-বিচার প্রসঙ্গে এবং রসবিচার প্রসঙ্গে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে ব'লে চরিত্র বিচারের জন্য পৃথক কোন অধ্যায় যোজনা করা হয়নি। পৃথক অধ্যায় নেই বলে কেউ যদি মনে করেন, আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে আছে তা' হ'লে লেখকের উপরে খানিকটা অবিচারই করা হবে। আশা করি সহৃদয় পাঠকরা এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

এই গ্রন্থখানি রচনা করার সময়ে আমার সহকর্মীদের অনেকেই আমাকে

অনেকভাবে সাহায্য করেছেন—কেউ বই দিয়ে, কেউ তথ্য দিয়ে, কেউ বা নানা রূপ প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে। এই সাহায্যকারীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ দাবী করতে পারে আমার 'প্রীতিভাজন ছাত্র এবং সহকর্মী শ্রীমান নলিনী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমান নলিনীরঞ্জন একাধারে সু-অভিনেতা এবং নাট্য-সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক। মেবার-পতন নাটকের জাতি ও রস সম্বন্ধে শ্রীমান আমার কাছে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, আলোচনাকালে তা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছে। প্রশ্নের মত প্রশ্ন উত্তরের অর্ধেক—এই কথা সত্য হ'লে, এই সব প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমানের অংশ আছে। এ জন্য শ্রীমান নলিনীরঞ্জন অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। বহু ধন্যবাদার্হ নৃত্য-নাট্য-সংগীত একাডেমির নাট্য বিভাগের ডীন নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়; গ্রন্থখানির সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করার সুযোগ দিয়ে তিনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন; তাঁকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তারপর, যাঁর কৃপাকণা পেয়ে আমি চিরকৃতার্থ, আমার সমস্ত কর্মের মূলে যাঁর উৎসুক দৃষ্টি নিত্য প্রেরণা হ'য়ে বিরাজ ক'রছে, সেই পরমপূজ্যপাদ পিতৃকল্প অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রণাম জানাচ্ছি।

অবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রীতিভাজন শ্রীশ কুণ্ড মহাশয়কে এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীবীরেন্দ্র কুমার নিয়োগী মহাশয়কে। তাঁদের কাছ থেকে উৎসাহ ও তাড়নায় না পেলে, গ্রন্থখানি এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারতাম না। পাঠকদের কাছে, দোষত্রুটির জন্য আর একবার মার্জনা চেয়ে, এখানেই নিবেদন শেষ করছি।

"ক্ষীরোদা-স্মরণ"
৫৬ নং শরৎ বসু রোড
সুভাষনগর
দমদম গোরাবাজার
কলিকাতা—২৮

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

সীতা নাটকের উপাদান এবং তার প্রযোজনা

এক নদীতে কেউ যেমন দু'বার স্নান করতে পারে না, তেমনি একের পক্ষেও এক নদীতে একবারের বেশী স্নান করতে নামা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে নদী যেমন ভিন্ন নদীতে পরিণত হচ্ছে, তেমনি প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তির মধ্যেও রূপান্তর ঘটছে—ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে। যুগের পরিবর্তন যুগ-মানসের তথা ব্যক্তি-মানসের পরিবর্তন হাত ধরাধরি ক'রে এগিয়ে চলেছে। কোন দু'টো ভিন্ন যুগের বা একই যুগের দু'টি ব্যক্তির মানসিক গঠন একরূপ নয়। সেখানেও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন চলেছে। অযোধ্যার রাজা দশরথের পরিবারে, রামের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে স্ময়ণীয় ঘটনা ঘটেছিল, তা হয়ত অনেকের মনেই অনেক ভাব ও ভাবনা জাগিয়েছিল এবং অনেকে চারণ কবিরই বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু মহাকবি বাল্মীকির কবিমানসের ভাব কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রামকাহিনী যে রসরূপ লাভ করেছিল, তা' একান্তভাবে ছিল বাল্মীকিরই সৃষ্টি। লৌকিক রামের জন্মভূমি অযোধ্যা বটে, কিন্তু রামায়ণের অর্থাৎ অলৌকিক রামের জন্মভূমি—বাল্মীকিরই মনোভূমি। এই মনোভূমি বাল্মীকিরই জাতি-যুগ-মুহূর্তের জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সংস্কার দিয়ে গঠিত। যুগের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বাল্মীকি যে পরিমাণে স্বীকরণ ও সমীকরণ করতে পেরেছিলেন—সেই পরিমাণেই তাঁর মানস বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। রামায়ণ বাল্মীকির ঐ পরিবর্তমান অথচ বিশিষ্ট মানসেরই রচনা। রামায়ণের চরিত্র পরিকল্পনায়, কল্পনায়, চরিত্রের আচার আচরণে এই বিশিষ্ট যুগ-মনের ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রয়েছে।

কিন্তু যেমন যুগপ্রবৃত্তির ঐক্য থাকলেও, বাল্মীকির যুগেরই আর কোন কবির পক্ষে এই রামায়ণ রচনা করা সম্ভব ছিল না, তেমনি যুগের পরিবর্তনের ফলেই তথা যুগ প্রবৃত্তির এবং কবি মানসের পরিবর্তনের ফলেই, রামকাহিনীর

পরিকল্পনা ও বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ভিন্ন যুগে ভিন্ন কবি-মানস, এবং ভিন্ন তাঁর বাসনা ও রূপ কল্পনা—এ নিয়ম অমোঘ। বাল্মীকির পরবর্তী যুগে রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন ক'রে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের পরিকল্পনা ও কল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। দেখা যায়, কবিরা প্রবৃত্তি অনুসারে কাহিনীর কোন অংশ বা ঘটনা বর্জন করেছেন, এবং কোন অংশ অন্যভাবে উপস্থাপনা বা কল্পনা করেছেন। এই স্বাধীনতা কবিরা নিজেরাই নিয়েছেন এবং সাহিত্যশাস্ত্রকারগণও এই স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সূত্র বেঁধে দিয়েছেন ঃ—

যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ ॥

(সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে। "উদাত্তরাঘব নাটকে বালীবধ আদৌ দেখানো হয়নি এবং 'বীরচরিত' নাটকে বালীবধ অন্যভাবে কল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ দেখানো হয়েছে বালীই রামকে বধ করতে এসে রামের হাতে নিহত হয়েছে। এই অন্যথাপরিকল্পনার স্বাধীনতা কবিরা কতখানি ভোগ করতে পারবেন, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররা বিশেষ কিছু না বলায়, আমরা দেখতে পাই— 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ' প্রবচনের সুযোগ প্রত্যেক যুগের কবিরাই নিয়ে আসছেন। শুধু ঘটনার অন্যথাকল্পনা করেই কবিরা ক্ষান্ত থাকেন নি ; চরিত্রের এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অন্যথাকল্পনা করতেও তাঁদের বাধেনি। কেন এমন হয় তার ব্যাখ্যা আগেই দিয়েছি অর্থাৎ যুগপ্রবৃত্তি এবং কবিমানসের জ্ঞান অনুভব-ইচ্ছার প্রকৃতিই যে এর মূল কারণ, এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে বলেছি। বাংলায় ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতির প্রবর্তক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, ভবভূতির "উত্তর চরিত" সমালোচনা প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে আমার বক্তব্য আমি সমর্থন করতে চেষ্টা করতে পারি—"উত্তর চরিতের উপাখ্যান ভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত।

ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। মূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোল কল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তর চরিত্রে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তর চরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।.........অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ বলিয়া ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।......উত্তর চরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠক সমাজে বিলক্ষণ পরিচিত।... চিত্রদর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।.... ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জন করেন।......বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল-প্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। ......তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য্য রাজগণ [illegible]র স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়রা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা তাহাদের চরিত্র কোমল প্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীর-লক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়।" যুগের প্রভাবে রামচরিত্র পরিকল্পনা, চরিত্রের গঠন কেমন ভিন্ন হয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণ এবং উত্তরচরিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তার সবটাই উদ্ধৃতিযোগ্য বলে, উদ্ধৃত করার লোভ সামলে নিয়ে, কৌতূহলী পাঠককে

প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য এতে শুধু এই কথাটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কবিমানস যুগের প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে উঠে।

বাল্মীকির পরবর্তী বিভিন্ন রাম-চরিত্রের এবং সীতাচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার পূর্বে, বাল্মীকির যুগ এবং তাঁর রামচরিত্র ও সীতাচরিত্র সম্বন্ধে সামান্যভাবে একটু আলোচনা ক'রে নেওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—রামায়ণের রামচরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী; রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ এবং আর্য্যজাতি তখন বীরজাতি ছিল। বাল্মীকির যুগ প্রাচীন যুগ, নিঃসন্দেহ; রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন এ বিষয়েও কোণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিচয়টুকু যুগের অতিবাহ্য পরিচয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে বললে বলা যায়—বাল্মীকির যুগ কৃষিভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক এবং মুনি-ঋষি-পুরোহিত শাসিত। সেই সমাজে গোষ্ঠী চেতনার প্রবল প্রাধান্য। ব্যক্তি সেখানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বিধানের অধীন; সমাজ নিয়মের বাইরে, ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ব'লে কোন কিছু নেই। সেখানে ব্যক্তি-সত্তা সামাজিক-সত্তার সম্পূর্ণ অধীন।

বাল্মীকির রাম সেই যুগের প্রবৃত্তি দিয়ে গঠিত। তিনি শুধু বীরস্বভাব সম্পন্নই নন। তাঁর মধ্যে সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা রাজ-সত্তারই প্রাধান্য। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা—অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের সুখসম্ভোগ অপেক্ষা, বংশের স্বার্থ, জনপদের স্বার্থ অনেক বড়। রামের অন্তরাত্মা সীতাকে শুদ্ধা বলে জানলেও, রাজা-রাম পৌরাপবাদ এবং জনপদের অপবাদ উপেক্ষা করতে পারেন নি। যে অকীর্তির ভয়ে রাম সীতাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তারই অপর নাম সমাজের নিন্দা। যে কাজ সমাজ প্রশংসিত নয় তারই নাম অকীর্তি, আর যে কাজ সমাজ প্রশংশিত তারই নাম কীর্তি। মহাত্মারা এই কীর্তিই কামনা করেন; জীবন দিয়েও কীতি রক্ষা করেন। বাল্মীকির রামের জীবনে সীতাহারা হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ আর

কিছুই ছিল না, সত্য, কিন্তু কীর্তিহীন হওয়ার অপমৃত্যুর তুলনায় সে দুঃখও বরণীয় ছিল। যে দুঃখ সম্বন্ধে রাম বলেছিলেন—"নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ দুঃখমতোধিকং"—সেই দুঃখের ভরা পানপাত্র রাম নিঃশেষে পান করেছিলেন, তবু কীর্তিভ্রষ্ট হননি অর্থাৎ সমাজ-সত্তাকে একটুও সঙ্কুচিত করেন নি।

এই নির্বিচার সমাজানুগত্য ছিল বলেই, রাম ব্রাহ্মণ বালকের অকাল মৃত্যুর দায়িত্ব—ব্রাহ্মণের অভিযোগ—"রাজার দোষেই প্রজারা বিপদগ্রস্ত হয়, রাজা অধর্মচারী হ'লে প্রজা মরে। অথবা নগর ও গ্রামের লোকে দুষ্কার্য করছে রাজা তাদের শাসন করেন না, তারই এই ফল। রাজার দোষেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে"—মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন এবং অকালমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নারদ যে যুক্তি দিয়েছিলেন সেই যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে, তাঁরই নির্দেশে নির্বিকার চিত্তে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শিরচ্ছেদ করেছিলেন। রাজা-রাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য জাতির তপস্যার অধিকার সুরক্ষিত রাখবার জন্য, উচ্চবর্ণের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যই, শম্বুককে বধ করেছিলেন। সমাজ ধর্মের বহির্ভূত ধর্মাধর্মের অন্য কোন আদর্শ খুঁজতে রাম যান নি।

এই আনুগত্য বাল্মীকির রামের জীবনে কখনই শিথিল হয়নি। অশ্বমেধ-যজ্ঞে সমাগত মুনিগণ এবং অতিথিগণের সঙ্গে লবকুশ-গীত রামায়ণ গান শোনার পর রামের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল—কুশলব সীতারই পুত্র। তখন তিনি বাল্মীকির কাছে দূত পাঠিয়ে নিবেদন করলেন—"সীতা যদি শুদ্ধাচারিণী পাপহীন হন, তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন। কাল প্রভাতে এই যজ্ঞপরিষদে আমার ও সকলের সমক্ষে সীতা শপথ গ্রহণ করুন।" বাল্মীকি সম্মত হ'লে রাম সভাস্থ ঋষি ও নৃপতিদের বললেন—"কাল প্রভাতে আপনারা সকলে সীতার শপথ শুনবেন এবং অন্য পরীক্ষা যা আবশ্যক হয়, তাও প্রত্যক্ষ করবেন।" আমরা দেখি, এই পরীক্ষাসভায়, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, পুলস্ত্য, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, নারদ, গৌতম প্রভৃতি ঋষি মহাবল রাক্ষস ও বানরগণ, বহুসহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র

সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সমবেত হয়েছিলেন। এই পরীক্ষার সমাজনৈতিক তাৎপর্য লক্ষণীয়। সীতাগ্রহণের পথে লোকাপবাদ ছাড়া আর কোন বাধাই ছিল না। কারণ, রাম নিজে সীতাকে শুদ্ধা অপাপা বলেই জানতেন এবং সীতার প্রতি তাঁর যে প্রেম তাতেও কোন বৈগুণ্য দেখা দেয়নি। কাঞ্চনী প্রতিমাই তার বড় প্রমাণ। রাম প্রেমে একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই সীতাত্যাগের দুঃখ এত মর্মান্তিক এবং সেই দুঃখ যত মর্মান্তিক, তত বড়ই প্রজানুরঞ্জক রাজা-রামের মহিমা। সীতাগ্রহণ সমস্যার সমাধান ছিল সীতাত্যাগের কারণের মধ্যেই—অর্থাৎ লোকের—প্রজাসাধারণের মতবাদ বা মনেকরার মধ্যে। প্রজাসাধারণ যতক্ষণ সীতাকে অপাপা ব'লে মনে না করছে, ততক্ষণ রাজা-রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন কি ক'রে? যখন—ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদবিদ্যায় ন্যায়, বাল্মীকির পশ্চাতে সীতাকে আসতে দেখে সভায় মহান সাধুবাদ উত্থিত হল, বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে শোকে আকুলিত হয়ে তুমুল কোলাহল ক'রে উঠলেন" এবং যখন মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি প্রচেতার দশম পুত্র কখনও মিথ্যা বলেছি এমন স্মরণ হয় না। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছি, মৈথিলী যদি দোষযুক্তা হন তবে সেই তপস্যার ফল যেন আমি ভোগ না করি। আমি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা জেনেই বনপ্রদেশে তাঁকে গ্রহণ করেছিলাম," তখনই রাম বলেছিলেন—"জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাব মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক।"—অর্থাৎ সকলের বিশ্বাস হোক যে সীতা শুদ্ধস্বভাবা, সকলের সম্মতিক্রমেই আমি সীতাকে প্রীতির সহিত গ্রহন করতে চাই।" বাল্মীকির রামের মধ্যে সমাজ-আনুগত্য প্রবল বলেই যেমন লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি সকলের সম্মতি নিয়েই তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

এই সামাজিক-সত্তার প্রাধান্যের অন্যতম ফল রাম চরিত্রের দৃঢ়তা এবং

গাম্ভীর্য। সীতা ত্যাগের চেয়ে বড় আঘাত—মর্মান্তিক দুঃখ রামের জীবনে আর কিছুই কল্পনা করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু যেহেতু রাম শুধু পত্নী-সর্বস্ব পুরুষ মাত্র নন, রাম সামাজিক সম্পর্কে বহুজনের সঙ্গে বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত—রামের ব্যক্তিত্বে রাজা-রামের অভিমান এবং বংশভিমান, এক কথায় সামাজিক সত্তার প্রাধান্য প্রবল, রাম পত্নী ত্যাগের শোকে শোকার্ত হওয়া সত্ত্বেও গাম্ভীর্য হারান নি। মনের স্বাভাবিক বিক্রিয়া তিনি নিরোধ করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সঙ্কল্পে অর্থাৎ সীতা নির্বাসনে তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন ব'লে শোকের সঙ্গে গাম্ভীর্যের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল তাতে রাম চরিত্রের দৃঢ়তা অদ্ভুতরূপে প্রকটিত হ'য়েছিল। দু'তিনটি অনুভাবের সাহায্যে বাল্মীকি রামের শোকার্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি এমনভাবে অঙ্কিত করেছেন যার তুলনা খুব কমই মেলে। বয়স্যদের মুখে পৌরাপবাদের কথা শুনে রাম বুদ্ধি স্থির ক'রে লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে—দেখলেন—"

······মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।

সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতং

বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে·········

হতশোভং যথা পদ্মং········· ।

তাঁদের দেখে রাম "অশ্রুন্যবর্তয়ৎ" এবং ধীর গাম্ভীর্যে সীতানির্বাসনের সঙ্কল্প জানালেন। এই ধীরোদাত্ত চরিত্র বাল্মীকিযুগেরই উপযোগী চরিত্র এবং বাল্মীকি-মানসেরই উপযুক্ত সৃষ্টি।

কোথায় রামায়ণের যুগ আর কোথায় 'উত্তররামচরিতে'র যুগ। দুই যুগের মধ্যে বিরাট কালের ব্যবধান—তেমনি বিরাট এক সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস—জাতির রাজনৈতিক আর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস। সমাজ যত শিল্পকেন্দ্রিকতার দিকে এগিয়েছে, তত ব্যক্তির শ্রেণী-চেতনা এবং অধিকারবোধ তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সামাজিক-সত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিগত-সত্তা সম্পর্কে ব্যক্তি অধিকতর সচেতন

হয়েছে। সমগ্র সমাজের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে, জীবনের সার্থকতা খোঁজার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত ব্যক্তিস্বার্থের এবং ভোগসম্ভোগের প্রাধান্য ঘটেছে এবং ব্যক্তিসত্তার লাভ ক্ষতি নিয়ে আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় দেখা দিয়েছে। সামাজিক সত্তার অভিমান যত দুর্বল হয়েছে, ব্যক্তি-সত্তার ক্ষয়ক্ষতির কান্না তত প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। ভবভূতির রাম এই কারণেই অত বেশী কেঁদেছেন। তাঁর কান্না সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা' উল্লেখযোগ্য।—

"ইহা আর্য্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া আধুনিক কোন বাঙালীবাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই, তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকুরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।" অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ভবভূতির রামচরিত্রের এই দুর্বলতা এবং অধীরতা এবং প্রেমোন্মত্ততায় ভবভূতির নিজের মানসিক প্রকৃতিই অভিব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমের সমসাময়িক 'আধুনিক লেখক' যে 'আরও কিছু বাড়াবাড়ি' করেছেন তা'তেও তদানীন্তন বাঙালী চরিত্রেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। রামায়ণের কাল থেকে ভবভূতির যুগের দূরত্ব, বাল্মীকির এবং ভবভূতির কবি-মানসকে যেমন পৃথক করে দিয়েছে, তেমনি ভবভূতির যুগ থেকে বাঙালী 'আধুনিক লেখকে'র কালের দূরত্বও—উভয় কবির মানস-প্রকৃতিতে পার্থক্য এনে দিয়েছে। তারই ফলে ঐ "আজো কিছু বাড়াবাড়ি" ঘটেছে। তবে ভবভূতি বা ঐ 'আধুনিক লেখক' আর যাই করুন, কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড় বলে ঘোষণা করেন নি। কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হয়ে তাঁদের রাম অনুচিত কান্না কেঁদেছেন বটে, কিন্তু কখনও প্রেমকে নিরপেক্ষ মর্যাদা দিয়ে কর্তব্যের

ওপরে প্রেমের স্থান নির্দেশ করতে সাহস করেননি। করেন নি এই কারণেই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনার মাত্রা তখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে যে মাত্রায় পৌঁছেছিল সে পর্য্যয়ে পৌঁছতে পারেনি। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সমাজনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেওয়ার সাধারণ মনোবৃত্তি, স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিশেষ একটি পর্যায়েই সম্ভব। এই বিশেষ অবস্থাটি, শিল্পযুগের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থারই তথা সমাজ ব্যবস্থারই স্বাভাবিক পরিণতি। এই সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির সমাজ-সত্তা স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কুচিত হয়। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সত্তার গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তি আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে আসে ; কারণ শিল্পকেন্দ্রের বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় ক'রে জীবিকা অর্জন করার মধ্যেই এবং পরিবারের ভরণপোষণ করার মধ্যেই তাকে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, এই কারণে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিকে বৃদ্ধি পায় আত্মস্বার্থবোধ, অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। আত্মমর্যাদাবোধ শুধু যে পুরুষশ্রেণীর মধ্যেই বৃদ্ধি পায় তা' নয়, নারীদেরও সামাজিক মর্যাদা বাড়তে থাকে। ভোগ-সম্ভোগে এবং আত্মবিকাশের অধিকারে, নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমান-অধিকারী এ কথা মেনে নেওয়া হয়। জীবনকে সর্বতোভাবে ভোগ করবার অধিকার—পুরুষার্থসিদ্ধির সুযোগ সুবন্দোবস্ত—প্রত্যেক ব্যক্তিরই ন্যায্য পাওনা। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনারই স্বাভাবিক পরিণতি—ব্যক্তিজীবনের সুখসম্ভোগকেই জীবনের পরম চরিতার্থতা বলে মনে করা—সামাজিক বিধিবিধাননিরপেক্ষ ব্যক্তি-সত্তা বা ব্যক্তি-অধিকারের কল্পনা করা।

'সীতা' নাটকখানি এই যুগেরই সৃষ্টি।

এই যুগের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কবি-মানসের সংস্কারের সংস্পর্শে উত্তরকাণ্ডের রামায়ণ কাহিনী যুগোপযোগী মূর্তি ধারণ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটকের দেহখানি পৌরাণিক বটে, কিন্তু অন্তরাত্মা আধুনিক। বাল্মীকির রামে যেখানে সমাজসত্তা প্রবল—প্রেমের চেয়েও কর্তব্য বড়, দ্বিজেন্দ্রলালের রামে সেখানে ব্যক্তি-সত্তা প্রবল; তাঁর কাছে—কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়। বাল্মীকির 'Theme' বা "premise" যেখানে 'ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমাজধর্ম বড়', দ্বিজেন্দ্রলালের "Premise" সেখানে কর্তব্যের চেয়ে অর্থাৎ সমাজধর্মের চেয়ে 'প্রেম' অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগ, ব্যক্তি-বাসনার পরিপূরণ বড়। সীতা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রাম-সীতার ট্র্যাজেডি-পরিণতির ভিতর দিয়ে ঐ মূল ভাবটিই (root-idea) প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। এই মূল ভাবের অনুবর্তী এবং পরিপোষক করেই নাট্যকার রামায়ণ-বর্ণিত কাহিনীকে নতুনভাবে সংযোজনা করেছেন—নতুন যুগের প্রবৃত্তি দিয়ে চরিত্র এবং ঘটনার কল্পনা করেছেন। কোথায় এবং কি ভাবে নাট্যকার এই অন্যথাকল্পনার স্বাধীনতা নিয়েছেন, নাটকের ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্র যোজনা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে।

(ক) **বাল্মীকি রামায়ণে সীতা নির্বাসনের ঘটনাটি** এইভাবে বর্ণিত আছে :—(রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ থেকে সংগৃহীত)। রাজ্যলাভের পর রাম ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। রাম পূর্বাহ্নে ধর্মকার্য করে দিবসের শেষভাগ অন্তঃপুরে যাপন কারতেন। সীতাও প্রাতঃকালে দেবসেবাদি করে অপক্ষপাতে শ্বশ্রূগণের সেবা করতেন, তারপর বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত হয়ে রামের কাছে যেতেন।

কিছুকাল পরে রাম সীতাকে বললেন—বৈদেহী, তোমার অপত্যলাভ হবে তার লক্ষণ দেখছি এখন তুমি কি ইচ্ছা কর বল। সীতা স্মিতমুখে বললেন, রাঘব, আমি পুণ্য তপোবন সকল দেখতে ইচ্ছা করি; গঙ্গাতীরে যে ঋষিগণ আছেন তাঁদের তপোবনে অন্তত একরাত্রি বাস করতে চাই। রাম উত্তর দিলেন, বৈদেহী নিশ্চিন্ত হও, কালই তুমি সেখানে যাবে। এই বলে তিনি সুহৃদগণের সঙ্গে প্রাসাদের মধ্যকক্ষায় গেলেন।

এই মধ্যকক্ষাতেই রাম, বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচক্ষণ বয়স্যদের মুখে সীতার অপবাদের কথা শুনলেন। প্রসঙ্গক্রমে রাম জিজ্ঞাসা করলেন—ভদ্র, নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা আমার সম্বন্ধে কি কথা বলে? সীতা, আমার ভ্রাতৃগণ বা মাতা কৈকেয়ীকে উদ্দেশ ক'রে কোনও জল্পনা হয় কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভদ্র অনেক প্রশংসা করার পরে—লোকাপবাদ টুকু শোনালেন—"সীতার সম্ভোগজনিত সুখ রামের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল! পূর্বে রাবণ যাঁকে সবলে ক্রোড়েতুলে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে অশোকবনে রেখেছিল, যিনি রাক্ষসের বশে ছিলেন সেই সীতাকে রাম কেন ঘৃণা করেন না? যদি আমাদের পত্নীদের এই দশা হয় তবে আমাদেরও সয়ে থাকতে হবে, কারণ রাজা যা' করেন প্রজা তারই অনুকরণ করে।" সকল বয়স্যই যখন ভদ্রের কথা সমর্থন করল তখন রাম কথা না ব'লেই তাদের বিদায় দিলেন এবং অনেক ভেবে সঙ্কল্প স্থির করলেন এবং লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠিয়ে সঙ্কল্প জানালেন। লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন—তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রের রথে সীতাকে অন্য দেশে বিসর্জন দিয়ে এস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রম আছে, সেখানে কোন নির্জন স্থানে সীতাকে রেখে এস। তুমি প্রতিবাদ ক'রো না, এ বিষয়ে বিচার করবার কিছু নেই। আমার আজ্ঞা পালন কর। যদি বাধা দাও তবে আমি অত্যন্ত অপ্রীত হব।... যারা আমাকে নিবৃত্ত করার জন্য অনুরোধ করবে তারা আমার শত্রু। সীতা পূর্বেই আমাকে বলেছেন তিনি গঙ্গাতীরের আশ্রম দেখতে চান, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর।' রজনী প্রভাত হ'লে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে তপোবন অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রামের আদেশ নিবেদন করলেন। লক্ষ্মণের দারুণ বাক্য শুনে সীতা শোকাভিভূত হয়ে ভূপতিত হ'লেন এবং অনেক বিলাপ করলেন। মুনিকুমারদের মুখে সংবাদ পেয়ে বাল্মীকি এসে সীতাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

রামায়ণের এই বনবাসকাহিনী আমাদের নাট্যকার অনুসরণ করেন নি।

না করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ ভূমিকায় জানিয়েছেন—"মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয়, যে রামচন্দ্র **শুদ্ধ বংশমর্যাদারক্ষায় জন্য সীতার বনবাস** দিয়েছিলেন। তার উপরে, লক্ষ্মণের প্রতি, তপোবন দর্শন ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায় একটা **নিষ্ঠুর ছলনাও** লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এ দু'টির একটি স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস-আখ্যান ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায়, আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।" নাট্যকার শুদ্ধ বংশমর্যাদারক্ষার জন্য সীতার 'বনবাস' এবং সীতার সঙ্গে রামের "নিষ্ঠুর ছলনা" পছন্দ করেননি বলেই ভবভূতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ অন্যথাকল্পনার স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রথমতঃ সীতার প্রতি পূর্ণপ্রেম থাকা সত্ত্বেও এবং অপাপা জেনেও শুধু প্রজা-রঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসর্জন দেওয়ায় রামের চরিত্র হীন হয়েছে কি না—এ যেমন এক বিচার্য বিষয়, তেমনি সীতার স্বেচ্ছা-নির্বাসন রামচরিত্রকে মহৎ করে কি না—রামের রাজ-সত্তা তাতে অকলঙ্কিত থাকে কি না, অন্যতম বিচার্য বিষয় বটে। তারপর, সীতার তপোবন দর্শন-আকাঙ্ক্ষার সুযোগ আপাত 'নিষ্ঠুর ছলনা' ব'লে মনে হ'লেও, এই ছলনায় সীতার প্রতি রামের প্রেমের ঐকান্তিকতাই ব্যক্ত হয় কি না সে কথাও বিচার ক'রে দেখা দরকার। সীতার বনবাস রামের কাছে কতখানি অসহ্য রামের কাছে সীতা কতখানি—এই 'নিষ্ঠুর ছলনা'র মধ্যেই তা' ব্যক্ত হয়নি কি?—এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। যাই হোক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল—সীতা বনবাসের দায় থেকে রামকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে রাম লোকাপবাদের কথা বয়স্যদের মুখ থেকে শোনেননি, শুনেছেন দূতের মুখ থেকে এবং শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্মুখকে "পথের কুকুর" ব'লে ভর্ৎসনা করেছেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন—"যাহা বলে প্রজা অযোধ্যার সীতা চির গৃহলক্ষ্মী রহিবে

আমার"। উন্মত্তের মতোই শেষ সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন—

"...রাজ্য মিলাইয়া যাক স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্বর্যের মত ; চূর্ণ হোক পদতলে
এ প্রাসাদ ; ভেসে যাক, সরযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্য্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হয়ে যাক।..............
...............তবু হৃদয়ে আসীন
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন ॥
এই বক্ষে ভস্মীভূত বিশ্বচরাচরে
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে ॥"

এই উক্তি ব্যক্তিগত অর্থাৎ জৈবিক আবেগের ঐকান্তিক প্রকাশের পরাকাষ্ঠা। এ হেন রোমাণ্টিক প্রেমেরই আবেগের কাছে—'সমাজ-সংসার মিছে সব' বলে মনে হয়। রামের বাসনা এখানে সমাজ-কোটি থেকে একেবারেই সরে এসে ব্যক্তিকোটির কেন্দ্র-বিন্দুতে দাঁড়িয়েছে।

রামের এই প্রতিক্রিয়া প্রেমসর্বস্ব জীবনের, সর্বত্যাগী প্রেমপরায়ণতার অভিব্যক্তির নিদর্শন হিসাবে অপূর্ব এবং অতুলনীয় বটে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই প্রতিক্রিয়ায় প্রেমের এমন এক সমাজ-নিরপেক্ষ অতিব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে—যা' সামাজিক ব্যক্তির জীবনে অবাধভাবে আচরিত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথা সত্য, জীবন থেকে স্নেহ-প্রেম-করুণা অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তি শুকিয়ে গেলে—স্বাভাবিক বাসনা-কামনা অবদমিত বা নিরুদ্ধ হলে, শত কর্তব্য পালন ক'রে সুকীর্তি অর্জন করা সত্ত্বেও, জীবনে ভারসাম্য থাকে না, জীবন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে। তেমনি সত্য এ কথাটিও যে জীবনের আবেগ শুধু প্রজনন বা প্রেমের বৃত্তের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় না, বা একটি ক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করলেই, বহু-সত্তাসম্পন্ন সামাজিক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারে না। মানুষের পক্ষে সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তি

হওয়া সম্ভব নয় বলেই—ব্যক্তি-সত্তা এবং সমাজ-সত্তা এই দুই সত্তার সামঞ্জস্য না ঘটা পর্য্যন্ত সামাজিক ব্যক্তির জীবনে সামঞ্জস্য আসতে পারে না। এই সামঞ্জস্য যেখানেই বিঘ্নিত হয় সেখানেই জীবনে সঙ্কট দেখা দেয়। একদিকে কাজ করে তার সহজ হৃদয়বৃত্তির প্রেরণা, অন্যদিকে কাজ ক.র তার সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ বিবেক-বিচার। এই দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক সমাধান যেখানে না হয়, সেখানেই জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘটে। শুধু ব্যক্তি-সত্তা বা শুধু সমাজ-সত্তা—কোন একটিকে আঁকড়ে ধ'রে মানুষ নিষ্কৃতি পায় না।

বাল্মীকির রাম যুগপ্রবৃত্তির প্রেরণায় সমাজ-সত্তাকেই বড় মনে ক'রে আঁকড়ে ধরেছিলেন—সমাজের মুখ চেয়ে নিজের সুখ-সন্তোগকে ত্যাগ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রাম যুগপ্রবৃত্তির প্রেরণাতেই—প্রথমে ব্যক্তি-সত্তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন। পরে বশিষ্ঠের নির্দেশের চাপে—কিছু সময়ের জন্য সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়েছেন এবং কিছু পরেই—কৌশল্যার আবেদনে অর্থাৎ আবার ব্যক্তি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে, রাজ-সত্তাকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন।—রাম সত্যভঙ্গ করেছেন। এখানে সমাজ-সত্তার উপরে ব্যক্তি-সত্তাকে স্থান দিয়ে রাম 'পাষাণ' বা 'পিশাচ' হননি বটে, কিন্তু পুণ্যরশ্মিকে মলিন করতে তথা প্রজার চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এগিয়ে গিয়েছেন। সেই মুহূর্তেই সীতা পতিসত্য রক্ষার জন্য, রামের পুণ্যরশ্মি অমলিন রাখার জন্য, নিজেই অযোধ্যা-পুরী ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং রামকে সীতা নির্বাসনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই কার্যে রাম একদিকে মুক্ত হয়েছেন বটে কিন্তু অন্যদিকে বদ্ধ এবং দেশের চোখে হীন হয়েছেন। বাল্মীকির রাম যেখানে প্রেমে এবং কর্তব্যে সর্বতোভাবে বলিষ্ঠ, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রামকে বড় প্রেমিক করতে গিয়ে ছোট সামাজিক মানুষে পরিণত করেছেন। তাতে মনে হয়, সীতার মহত্ত্বই বেড়েছে—রামেয় মহত্ত্ব কমেছে ছাড়া বাড়েনি। সীতা-নির্বাসনে বাল্মীকির রামের অন্তরে বাহিরে যে মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের রাম সে মহত্ত্ব অক্ষুন্ন রাখতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের রাম

জাত দিয়েছেন কিন্তু পেট ভরাতে পারেননি—অর্থাৎ সীতা নির্বাসন ঠেকাতে পারেননি।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সীতার বনবাস ব্যাপারটিকে রামের সহজ সমাজানুগত্যের পরিণতি হিসাবে উপস্থাপিত করতে চাননি ব'লে, একদিকে সমাজ-বিধানের প্রতীক স্বরূপ বশিষ্ট চরিত্রের পরিকল্পনা ক'রে, রামের উপরে পুরোহিততন্ত্র শাসিত সমাজের চাপ দেখাতে চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে ভরত, শান্তা এবং কৌশল্যাকে মুখপাত্র করে—প্রেমের সম্মান, নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তির অধিকার—শুধু তো পুরুষেরই অধিকার নয়,—নারীরও অধিকার। ব্যক্তি যেখানে সুবিচার পায় না—সেখানে অরাজকতা অবিচারেরই আধিপত্য। ভরত রামকে নিবৃত্ত করতে এসে বলেছেন—"যদি ভূপতি তোমার

সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার
কে করিবে আর নারীর সম্মান ?
দুর্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ
হবে তা' হলে পুরুষের ক্রীড়া,
বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া
হইবে পতির উপহাস দ্রব্য ;
শিথিল হইবে পতির কর্তব্য
অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশ দেশ জুড়ি ভারত ভিতরে।"

শান্তা এসে তীব্র অনুযোগ উত্থাপন করেছেন—

যদি পায় পদে উৎসর্গিয়া প্রাণে
বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে
নির্বাসন, দয়া প্রতিদানে পৃষ্ঠে
ছুরিকা আঘাত তাহার অদৃষ্টে

সারল্যের বিনিময়ে কপটতা
বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা,
.... তবে
এই দণ্ডে নারীজাতি এ জগতে
লুপ্ত হয়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে ॥"

কৌশল্যাও সীতার রামগত প্রাণের কথা বলে—উন্মত্ত এবং আত্মঘাতী কাজ করতে নিষেধ করেছেন, গুরুর আজ্ঞার উপরে মায়ের আজ্ঞাকে স্থান দিতে রামের কাছে ব্যাকুল অনুরোধ জানিয়েছেন। ভরত, শান্তা কৌশল্যা সকলেই সমাজ-নিরপেক্ষভাবেই ন্যায়-অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কেউই রামের সমাজ-সত্তার অর্থাৎ রাজ-সত্তার সমস্যাটি ভেবে দেখতে চেষ্টা করেন নি। শেষ পর্যন্ত কৌশল্যার আবেদনে রাম সত্যভঙ্গ করেছেন এবং সীতা এসে স্বেচ্ছানির্বাসন দ্বারা রামকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন। এই অন্যথাকল্পনা সম্ভাব্যের মাত্রা লঙ্ঘন না করলেও, অরামায়ণোচিত যে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, ব্যক্তি অধিকারের তথা নারী অধিকারের আধুনিক চেতনা বা সংস্কার কাহিনী-পরিকল্পনার এবং চরিত্র কল্পনার মধ্যে বিশেষভাবেই কাজ করেছে। রোমাণ্টিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপাসক ব'লেই বশিষ্ঠের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলোপকারী অতিসমাজকেন্দ্রিক নীতি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। বশিষ্ঠের কাছে—"কেহ নহে আপনার,

সমাজ রক্ষিত সম্পত্তি সে, সমাজের অধিকার।
ব্যক্তির সর্ব্বৈব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্বসুখ
বলি দিতে হবে সমাজের পদে।.........
স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য নহে সৃষ্ট বিধাতার,
....
....
সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহা সব, তাহাই

পাপ, রঘুবর। পাপ পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি,
আর তুমি অধিষ্ঠিত সেই সমাজের প্রতিনিধি
সমাজের ভৃত্যমাত্র।"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এইভাবে অস্বীকার করার—ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ-সাৎ ক'রে দেখার যে নীতি, নাট্যকার সে নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ন'ন। পাপ-পুণ্যের অতিলৌকিক বিধানের ভিত্তি নেই, সমাজের মঙ্গলকর কার্যই পুণ্য এবং অমঙ্গলকর কার্যই পাপ,—জীবনকে এতখানি সমাজ সাপেক্ষ ক'রে, সমাজবিধানের অধীন ক'রে, দেখতে বা দেখাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকামী নাট্যকার খুবই অনিচ্ছুক এবং অনিচ্ছুক ব'লেই শেষ পর্যন্ত বাল্মীকির যুক্তির কাছে—বশিষ্ঠকে হার মানিয়েছেন।

সীতার বনবাসের পরে—সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত, রামের জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা (ক) লবণাসুরকে বধ করার জন্য শত্রুঘ্নকে প্রেরণ—শত্রুঘ্নকে-মধুপুরী (মথুরা) রাজ্যে স্থাপন। (খ) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শিরশ্ছেদ এবং (গ) তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত বাল্মীকির আদেশে লব-কুশের রামায়ণ গান—লব কুশকে সীতার পুত্র ব'লে রামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—বাল্মীকির কাছে রামের দূত প্রেরণ এবং যজ্ঞপরিষদে সকলের সামনে সীতা শপথ গ্রহণ করবেন—সেই বিষয়ে বাল্মীকির এবং সীতার মনোগত ইচ্ছা কি তা' জানবার ইচ্ছা। রামের প্রস্তাবে বাল্মীকির সম্মতি এবং সীতার যজ্ঞপরিষদে শপথ গ্রহণ। সেই সময়েই ভূতল থেকে এক আশ্চর্য অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসনের আবির্ভাব এবং ধরণী দেবীর সীতাকে নিয়ে রসাতলে অন্তর্ধান।

সীতা নির্বাসনের পরে, বাল্মীকির রাম শোকাভিভূত হ'য়ে, চারদিন রাজকার্য থেকে বিরত ছিলেন এবং লক্ষ্মণের প্রবোধবচনে প্রকৃতিস্থ হয়ে রাজকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। চারদিন রাজকার্য না করায় রাম অনুতপ্ত ছিলেন; কারণ রাম জানতেন—"যে রাজা দৈনিক পৌরকার্য করেন

না। তিনি সংবৃত নরকে পতিত হন। বীরের শোকের মতোই, রামের দুঃখ তাঁর কর্তব্যের পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য রাম কখনও নিজেকে ধিক্কার দেননি বা রাজ-কর্তব্যের উপর কোন কটাক্ষপাত করেননি। কারণ স্পষ্ট; কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড় ব'লে মনে না করা পর্যন্ত আত্মধিক্কারের কোন সম্ভাবনা নেই।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের রাম অনুতাপে নিত্য দগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হননি—আত্মধিক্কারে অনুক্ষণ মৃত্যু কামনা করেছেন। এত তীব্র মনস্তাপের কারণ রাম নিজেই ব্যক্ত করেছেন :—

'বুঝি নাই—নির্বাসন ক্ষণে মাতা, সে সতীর
প্রতি সে কি নৃশংসতা; বুঝি নাই--কি গভীর
প্রেমের সে অপমান।"

ব্যক্তি-সম্পর্ককের মূল্যকে, সমাজবিধানাতিরিক্ত কোন সার্বজনীন নিরপেক্ষ মান দিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সহজহৃদয়াবেগের—অন্তঃকরণের—সহজ প্রমাণ দিয়ে বিচার করবার প্রবৃত্তি থেকেই, রামের মধ্যে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ধর্মচেতনার এ এক নতুন পর্য্যায়। বর্ণাশ্রমিক ধর্মবোধ নিয়ে এ রাম সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি এবং পারেননি ব'লেই—সীতা নির্বাসনের তীব্র মনস্তাপে অবিরাম দগ্ধ হয়েছেন।

শম্বুকের শিরশ্ছেদ ব্যাপারেও, আমরা এই আধুনিক রামকে দেখতে পাই। বাল্মীকির রাম "ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ শুনে দুঃখার্ত হয়ে বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ভ্রাতৃগণকে ডেকে আনলেন। মার্কেণ্ডেয়, কাশ্যপ, গৌতম, নারদ প্রভৃতিও এলেন। রাম বালকের অকাল মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন—সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই তপস্যা করতেন। তখন, অকাল মৃত্যু ছিল না। ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়রাও তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন,.........। তারপর...দ্বাপর যুগ এল, বৈশ্যরাও তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু শূদ্রের তখন সে অধিকার হ'ল না।.........দ্বাপরে তাদের পক্ষে তপস্যা পরম অধর্ম। মহারাজ তোমার

রাজ্যে কোনও দুর্বুদ্ধি শূদ্র তপস্যা করছে, সেই পাপেই এই বালক মরেছে।” নারদ অকাল মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন, বাল্মীকির রাম তা'র বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। দ্বাপরে শূদ্রের তপশ্চর্যাকে পাপ হিসাবেই গণ্য করেছেন এবং শূদ্র তপস্বীকে বধ্য ব'লেই মনে করেছেন। এই কারণেই রাম শম্বুকের শিরশ্ছেদ করতে এবং করে কোনরূপ অনুতাপ প্রকাশ করেননি—এবং হৃদয়হীনতার জন্য নিজেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন ভাবেই ধিক্কৃত করেননি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রাম শম্বুককে বধ করেছেন—যন্ত্রের মতো—শুধুমাত্র বশিষ্ঠের আদেশ পালন করবার জন্যই। কোন সমাজ-ধর্মবাধের প্রেরণায় তিনি কার্যে অগ্রসর হননি। সমাজে বর্ণনির্বিচারে সকলের সমান অধিকার—দ্বিজেন্দ্রলালের রাম এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। শম্বুক যে 'নব বিধান' এর কথা রামকে শুনিয়েছেন সে কথা রামেরই অন্তরাত্মার কথা। এই রাম বার বার অন্তরাত্মার বিরোধী কাজ তথা আত্মপীড়ন করেছেন। রাম যেন, নিরুপায়! অন্যায় সমাজধর্ম রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে, তিনি মহত্তর অর্থাৎ সার্বজনীন মানব ধর্মকে হনন ক'রে চলেছেন। শম্বুকের আচরণ—তপশ্চর্যার অধিকার, রামের কাছে অধর্ম বা পাপ ব'লে মনে হয়নি ব'লেই শম্বুকের শিরশ্ছেদ করতে গিয়ে রাম আত্মধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন—

> সত্য আমি অতি নির্মম কঠিন,
> আমার হৃদয় নাই। রাজার বিচার মায়াহীন।
> অনুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার—
> নীরস কর্তব্য সার। স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।”

শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে বাল্মীকির রামের চেতনা এতখানি প্রসারিত এবং স্পর্শকাতর ছিল না ব'লেই—বাল্মীকির রাম নিজেকে এতখানি হৃদয়হীন এবং অপরাধী ভাবতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের রামে ব্যক্তি-অধিকার চেতনা বেশী ব'লেই এমন মনোভাব সম্ভব হ'য়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রামে রোমাণ্টিক আত্মার অনন্ত জিজ্ঞাসার অতৃপ্তি; তাই প্রশ্ন জেগেছে—'ক্ষমা

চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর? শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়? শূদ্রকের শিরশ্ছেদের পরে তীব্র মনস্তাপ—'ধর্মের পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার?'

শূদ্রতপস্বীর শিরশ্ছেদের পর, উল্লেখযোগ্য ঘটনা—রামের অশ্বমেধযজ্ঞ—যজ্ঞপরিষদে সীতার দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ ও পরীক্ষা—সীতার পাতালপ্রবেশ।

বাল্মীকি রামায়ণে এই ঘটনাগুলি নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হয়েছে।—

শম্বুককে বধ করার পরে রাম ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করেন এবং একরাত্রি সেখানে বাস করেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে—ভরত ও লক্ষ্মণের কাছে রাজসূয় যজ্ঞ করার বাসনা ব্যক্ত করেন। ভরত রাজসূয় যজ্ঞ করতে নিষেধ করেন। তাঁর যুক্তি—সকল মহীপালই আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করেন। আপনার এমন যজ্ঞ করা উচিত নয় যাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের নাশ হতে পারে। পরাক্রান্ত সকল রাজাই আপনার বশে আছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করলে তাঁরা ক্রোধের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন। ভরতের কথায় রাম প্রীত হন এবং সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তখন লক্ষ্মণ—সর্বপাপনাশক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং রাম লক্ষ্মণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপ এই চারজন অশ্বমেধজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মতি নিয়ে রাম লক্ষ্মণের উপর বন্দোবস্ত করার ভার অর্পণ করেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হিতকামী নৃপতিগণ, বিদেশস্থ ধার্মিক দ্বিজগণ, সস্ত্রীক ঋষিগণ—সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে রাম আদেশ দেন। আরও আদেশ করেন—"নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে বৃহৎ যজ্ঞশালা নির্মাণ করাও। প্রচুর তণ্ডুলতিল, মুদ্গ, চনক, কুলিত্থ, মাষ ও লবণ নিয়ে শত সহস্র ভারবাহী পশু অগ্রেই সেখানে যাক। উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত তৈলাদি এবং গন্ধদ্রব্য পাঠানো হ'ক। বহুকোটি সুবর্ণ ও রজত নিয়ে ভরত সাবধানে সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে আপণিক, নট, নর্তক, পাচক ও যৌবনবতী নারীরাও যাক। সৈন্যদল অগ্রভাগে যাত্রা করুক। ভৃত্য ও কোষাধ্যক্ষগণ, আমার মাতৃগণ, কুমারগণ এবং অন্তঃপুরের

সকলেই যান।......দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনী প্রতিমা এবং কর্ম্মজ্ঞ বিপ্রগণকে পুরোবর্ত্তী ক'রে মহাযশা ভরত অগ্রে গমন করুন।" (বাল্মীকি-রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, শ্রীরাজশেখর বসু-কর্তৃক সারানুবাদ)

মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সঙ্গে এই যজ্ঞে এসেছিলেন। লব-কুশকেও সঙ্গে এনেছিলেন। লব-কুশকে বাল্মীকি বললেন—'তোমরা ঋষিদের আবাসে, ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামের ভবনদ্বারে, যজ্ঞস্থানে এবং ঋত্বিগ্‌গণের নিকটে রামায়ণ গান করে বেড়াও।...... ....
প্রতিদিন বিংশতি সর্গ গান করো।......যদি রাম প্রশ্ন করেন তোমরা কার পুত্র, তবে বলবে আমরা বাল্মীকির শিষ্য।* যজ্ঞে আগত মুনিগণ এবং অতিথিগণের সঙ্গে রাম বহুদিন রামায়ণ গান শুনলেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল লব-কুশ সীতারই পুত্র। তখন তিনি বাল্মীকির কাছে দূত মুখে নিবেদন জানালেন—'সীতা যদি শুদ্ধচারিণী পাপহীনা হন, তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন'। বাল্মীকি উত্তরে জানালেন—রামের যা ইচ্ছা সীতা তাই করবেন।

রজনী প্রভাত হ'লে রাম যজ্ঞশালায় গিয়ে, বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র দুর্বাসা পুলস্ত্য মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, নারদ, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদের আহ্বান করলেন। নানাদেশ হ'তে আগত বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য সমবেত হলেন। সীতা অধোবদনে কৃতাঞ্জলি হয়ে বাষ্পাকুল নয়নে রামকে ধ্যান করতে করতে মহর্ষির পশ্চাতে এলেন। সভায় মহান সাধুবাদ উত্থিত হল। বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে শোকে ব্যাকুলিত হয়ে কোলাহল ক'রে উঠলেন। সভায় প্রবেশ করে বাল্মীকি বললেন—"এই সেই পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা যাঁকে অপবাদের ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট পরিত্যাগ করা হয়েছিল। রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা কর সীতা তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। জানকীর এই দুই যমজ পুত্র তোমারই। আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলেছি এমন স্মরণ হয় না। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছি, মৈথিলী যদি

দোষযুক্তা হন, তবে সেই তপস্যার ফল যেন আমি ভোগ না করি। আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধচারিণী পতিব্রতা ভেবেই বন প্রদেশে তাঁকে গ্রহণ করেছিলাম। লোকাপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়েছিল, তাই তোমার প্রিয়তমাকে শুদ্ধা জেনেও তুমি ত্যাগ করেছ।" রাম বাল্মীকির কথা স্বীকার করলেন। এবং বললেন—'জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক।

তখন সমবেত জনগণের সমক্ষে সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে অধোবদনে বললেন—'আমি যদি রাঘব ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি আমি সত্য ব'লে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।"

বৈদেহী শপথ করছেন এমন সময় ভূতল থেকে এক আশ্চর্য অত্যুতম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হ'ল।.........ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে মৈথিলীকে অভিনন্দিত করলেন এবং তাকে দুই বাহু দারা ধারণ ক'রে—রসাতলে প্রবেশ করলেন।

বাল্মীকির এই কাহিনীকে ভবভূতি এবং পরবর্তী কবিরা অন্যভাবে কল্পনা করেছেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে অন্যথাকল্পনা করেছেন তা অনেক পরিমাণে ভবভূতির অনুসরণ হলেও হুবহু অনুকরণ নয়। আগেই বলা হয়েছে—দ্বিজেন্দ্রলাল বশিষ্ঠকে সমাজবিধানের প্রতিনিধি হিসাবে রূপ দিয়েছেন। বশিষ্ঠ থেকেই যেমন সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার চাপ এসেছে, তেমনি সীতার স্থানে অন্য পত্নী গ্রহণের চাপও বশিষ্ঠের কাছ থেকে এসেছে। আমরা দেখি, বশিষ্ঠের সঙ্গে রামের বাচনিক সংঘর্ষে, রামের সীতা-প্রেমের রুদ্ধ আবেগে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত—সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতিকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়ে যজ্ঞের আয়োজনে বশিষ্ঠ সম্মতি দিয়েছেন।

কিন্তু নাটকে, বাল্মীকি যজ্ঞে যোগদান করতে, লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে যাননি ; একাই গেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলে—লব-কুশের সঙ্গে শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও পরাজয়—লবকুশের পিতৃ পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া—সীতার করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, তপোবনে এসে সীতার কাছে রামের মার্জনা ভিক্ষা এবং পাতাল প্রবেশের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনা করার সুযোগ পাওয়া কঠিন হ'ত ব'লেই, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যথাকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এই পরিকল্পনার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সীতাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়নি এবং (খ) সীতার পাতাল প্রবেশ ব্যাপারটিকে অতি-প্রাকৃত ঘটনা হিসাবে উপস্থাপিত না ক'রে প্রাকৃতিক ঘটনা—অর্থাৎ 'ভূমিকম্প'—জনিত দুর্ঘটনা হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই দু'টি পরিকল্পনায় আধুনিকমনা দ্বিজেন্দ্রলালই আত্মপ্রকাশ করে'ছেন। প্রথম পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—নাট্যকার, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকির বিতর্কের এবং বশিষ্ঠের পরাজয়বরণের সাহায্যে, সীতাগ্রহণ সমস্যাটির সহজ সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। বিতর্কের একদিকে দাঁড় করিয়েছেন সমাজ-সত্তার প্রতিনিধি—কর্তব্যসর্বস্ব বশিষ্ঠকে—যাঁর কাছে প্রেমের চেয়ে কর্তব্য বড়, অন্যদিকে ব্যাক্তি সত্তার প্রতিনিধি বাল্মীকিকে, যাঁর কাছে কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়—প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর। যাঁর ধারণা—

> প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি ;
> প্রেম দেয় বিধি ; নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।
> ... ...
> প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে
> যেথা ধর্ম, সেথা প্রেম, সেথা পাপ প্রেম নাহি রহে
> প্রেম প্রভু, কর্তব্য তাহার ভৃত্য······

আমরা দেখি, বাল্মীকির আবেগপূর্ণ বক্তৃতা শুনেই, বশিষ্ঠ পরাজয় স্বীকার করেছেন এবং জানকীকে গ্রহণ করবার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু একটা

বড় প্রশ্ন এখানে উঠবেই এবং সে প্রশ্নটি এই—সীতানির্বাসনের মুখ্যকারণ কি বশিষ্ঠ? না লোকাপবাদ? বশিষ্ঠ হলে, অবশ্যই তিনি সকলের আগে অর্থাৎ অভিষেকের সময়েই প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন। যেহেতু তা তিনি করেননি—সেইহেতু স্বীকার করতেই হবে—লোকাপবাদই সীতা নির্বাসনের মুখ্য কারণ। তাই যদি সত্য হয়, তবে বশিষ্ঠের ভাষায় বলা যেতে পারে—"যে কারণে সীতা নির্বাসিত সেইহেতু বিদ্যমান অদ্যাপি।" এমত অবস্থায়, বাল্মীকির জয় নয়, সীতার পরীক্ষাই এবং লোকের সাধুবাদই নির্বাসিত সীতাকে পুনর্বাসিত করতে সক্ষম। প্রজার মন থেকে অপবাদ-স্পৃহার মূলোৎপাটন না করতে পারলে, রামের পক্ষে, বিশেষতঃ রাজা-রামের পক্ষে, অন্য সঙ্কটের সম্মুখীন না হ'য়ে সীতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

গ্রহণের আগে বাল্মীকি, সেই কারণে, সীতা-পরীক্ষার—অবতারণা করেছেন। অন্যপক্ষে, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্যাটিকে ব্যক্তি-রুচিনির্ভর ক'রে তুলেছেন, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী আধুনিক মনের প্রেরণার বশেই তা' করেছেন। এই পরিকল্পনায় মূল দ্বন্দ্বের সুসঙ্গত সমাধান কতটা হয়েছে তা' অবশ্যই বিচার্য বিষয়। যদি বশিষ্ঠের অভিমতেই সমগ্র প্রজাসাধারণের অভিমত অভিব্যক্ত হয়—তবেই বশিষ্ঠের আদেশে সীতাগ্রহণ, মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই দিক দিয়ে হিসাব করলে, বলতেই হবে—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্যাটির সঙ্গত সমাধান করতে পারেননি।

রামের জীবনে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রকৃত তাৎপর্য নাট্যকার যদি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন, তা'হ'লে অবশ্যই দেখতে পেতেন যে রামের ব্যক্তি-সত্তা এবং সমাজ-সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যের একান্ত অভাবেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। রাবণকর্তৃক সীতাহরণই রামের জীবনে এমন একটি উৎকট সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। সীতাকে বর্জন করলে রামের ব্যক্তি-সত্তার ক্ষোভ-ক্ষতি যেমন অনিবার্য, তেমনি লোকাপবাদ সত্ত্বেও সীতাকে রাজপুরীতে স্থান দিলে, রামের সমাজ-সত্তার সঙ্কোচন এবং অশান্তি অনিবার্য। সীতাহারা রাম যেমন প্রেম-

বঞ্চিত ও রিক্ত, লোকাপবাদ-উদাসীন অপ্রজানুরঞ্জক আত্মসুখ-পরায়ণ এবং সুনীতিবিমুখ রামও তেমনি লোকপ্রীতিবঞ্চিত এবং খ্যাতিবঞ্চিত—একক এবং রিক্ত। দুই সত্তার নির্বিরোধ সামঞ্জস্য না ঘটলে, রামের জীবনে কিছুতেই শান্তি আসতে পারে না। সুতরাং, একমাত্র লোকাপবাদ-বিমুক্ত সীতাই অর্থাৎ প্রেম ও প্রতিষ্ঠার সমন্বয়ই, রামের জীবনের উভয়-সঙ্কট দূর করতে পারে এবং তা' পারে বলেই—লোকসমক্ষে সীতার শপথ গ্রহণ একান্তই অপেক্ষিত।

বাল্মীকি মহাকবির উদার ধ্যানে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—প্রজাদের মনে প্রত্যয় না আনা পর্যন্ত সীতাগ্রহণ অসম্ভব এবং তেমনি অসম্ভব সীতাগ্রহণ ব্যাপারকে শান্ত-সহজ ঘটনায় পরিণত করা। প্রথানুসারে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হ'লে সীতাকে দিয়ে নিশ্চয়ই অসাধারণ শপথ গ্রহণ করাতে হবে ; কিন্তু সতীসাধ্বী সীতা নিশ্চয়ই কলঙ্ক-মোচনের পরীক্ষাকে—বার বার লাঞ্ছনাকে—আত্মবিসর্জনের সুযোগে পরিণত না ক'রে, অন্যরূপ কিছু করবেন না। মহাকবি গ্রহণ ও বিসর্জন ব্যাপার একটিমাত্র উপায়ে সম্পন্ন করেছেন—সেই উপায় সীতার পরীক্ষা। তা'ই সেখানে, সীতার সতীত্বনিদর্শন বাকসিদ্ধির পরিণতি রূপেই 'পাতাল-প্রবেশ রূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

নাট্যকার ভবভূতি এবং আমাদের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, সীতা-গ্রহণ ব্যাপারটি উপস্থাপনা করতে, অনেকখানি কল্পনার অবসর নিয়েছেন। ভবভূতি একদিকে বাল্মীকির আশ্রমে অভিনব নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ক'রে বশিষ্ঠ জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি রামের আত্মীয়দের সমবেত ক'রেছেন, অন্যদিকে—অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব হরণ করায় লবের সঙ্গে অশ্বরক্ষক চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন এবং রামের উপস্থিতি দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন এবং রামকেও লব-কুশাদিসহ নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন। ভবভূতি রামচরিতের নাট্যরূপ দেখিয়েই রাম-সীতার পুনর্মিলন সংঘটিত করেছেন। এই কারণে ভবভূতির নাটকের পরিসমাপ্তি মিলনান্ত, হয়েছে। কারণ পাতাল-প্রবেশ—ভবভূতির পরিকল্পনায়, অসঙ্গত ঘটনা হ'তে বাধ্য।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, লবকুশের সঙ্গে শত্রুঘ্নের এবং রাঘবসৈন্যের যুদ্ধের অবতারণা করে, লব-কুশের ক্ষত্রিয় অভিমান এবং লব-কুশের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সেই অবসরে সীতার মাতৃহৃদয়কে গভীর দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করেছেন। 'নাটকের ভিতর নাটকের' পরিকল্পনা না করে, শুধু বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধের সাহায্যে, সীতা-গ্রহণের বাধা দূর করেছেন এবং রামকে বাল্মীকির তপোবনে এনে সীতার কাছে মার্জনাভিক্ষা করিয়ে মিলনের সব বাধা অপসারিত করেছেন। কিন্তু অনিবার্য সুখ-মিলনের সম্ভবনাকে আকস্মিক এক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার অবতারণা ক'রে নষ্ট করেছেন এবং প্রত্যাশিত মিলনান্ত পরিণতির স্থলে বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি সৃষ্টি করেছেন। পাতাল-প্রবেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে ভূমিকম্পের কল্পনা, আধুনিক যুগ-প্রবৃত্তির নিদর্শন বটে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য—ভূমিকম্পের ফলে একমাত্র সীতার পাতাল-প্রবেশ, ঔচিত্য-বোধে কম আঘাত করে না। এক্ষেত্রে, বাল্মীকির ঘটনা-বিন্যাস যদি অলৌকিক বা অপ্রাকৃত হয়ে থাকে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঘটনা আকস্মিক এবং বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক হ'য়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার পাতাল-প্রবেশ আত্মশুদ্ধি ব্যাপারেরই স্বাভাবিক পরিণতিরূপে দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ রাম-সীতার চরিত্রের এবং মিলন সমস্যাসমাধানের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই পাতাল-প্রবেশ ঘটনাটি ঘটেছে। পরীক্ষা ও পাতাল-প্রবেশ যেন একই ঘটনার এপিঠ ওপিঠ। সতীত্বের প্রমাণ দিতে সীতা যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন, পাতাল-প্রবেশ তারই অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পাতাল-প্রবেশ নাটকীয় ঘটনার অনিবার্য বা সম্ভাব্য পরিণতি হ'তে পারেনি।

সীতা-নাটকের গঠন-বিশ্লেষণ

সমগ্র নাটকের বিশ্লেষণ, গঠন-বিশ্লেষণ অপেক্ষা ব্যাপকতর ব্যাপার বটে, কিন্তু, অঙ্গীর স্বরূপ না জানা পর্যন্ত যেমন অঙ্গের তাৎপর্য জানা যায় না, তেমনি কোন নাটকের গঠন বিন্যাসের সম্যক বিশ্লেষণ করতে গে'লে, নাটকের অন্যান্য উপাদানের আলোচনাও একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। Lajos Egri-তাঁর The Art of Dramatic writing-গ্রন্থে নাটক বিশ্লেষণের যে নমুনা দিয়েছেন, তা'তে দেখা যায় তিনি নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ ব্যাপারটিকে ভাগ ক'রে নিয়েছেন ঃ—

(ক) **প্রতিপাদ্য** (Premise)

এগ্রি যাকে 'প্রেমিজ' বলেছেন, তাকেই ক্রুণেতিয়ে নাম দিয়েছেন—'Goal'—হাউয়ার্ড লসন বলেছের—"root-idea", ব্র্যাণ্ডার ম্যাথুস বলেছেন—'Theme' অধ্যাপক পিয়ার্স বলেছেন—'গন্তব্যস্থল' (where you are going)। দৃষ্টান্ত—রোমিও জুলিয়েটের প্রতিপাদ্য—"বড় প্রেম মৃত্যুভয় করে করে না", কীং লিয়রের প্রতিপাদ্য—অন্ধ বিশ্বাস মৃত্যুর কারণ, ম্যাকবেথের—দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজেই নিজের পতন আনে' ইত্যাদি।

(খ) **কেন্দ্রীয় চরিত্র** (Pivotal character)

(গ) **অন্যান্য চরিত্র** (Characters)

(ঘ) **সুসঙ্গতি** (Orchestration)

"Orchestration damands well-defined and uncompromising characters in opposition, moving from one pole towards another through conflict"

(ঙ) **বিপরীত ধর্মীর সংযোগ** (Unity of opposites)

"The Real unity of opposites is one in which compromise is impossible".

(চ) **বস্তুস্থাপনা** (Point of attack) বা (Exposition)

[(ক) আসন্ন দ্বন্দ্বের অব্যবহিত পূর্বে নাটকের আরম্ভ করা যেতে পারে

(খ) নাটকের কোন চরিত্রের জীবনে যখন মোড় ঘুরছে—ঠিক তখন আরম্ভ করা যেতে পারে।

(গ) এমন কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে যার ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য

(ঘ) তাকেই ভাল আরম্ভ বলা যায় যেখানে নাটকের প্রারম্ভেই—"something vital is at stake"]

(ছ) **দ্বন্দ্ব** (Conflict)

[(ক) Static Conflict. (খ) Jumping Conflict

(গ) Slowly rising (ঘ) Foreshadowing Conflict]

(জ) **ক্রমপরিণতি** (Transition)

[Transition is the element which keeps the play moving without any breaks, jumps or gaps. Transition connects seemingly unconnected elements...]

(ঝ) **চরিত্রের বিবর্তন** (Growth)

(ঞ) **সঙ্কট** (Crisis)

"A state of things in which a decisive change one way or the other is impending"—"Turning point"

(ট) **চূড়ান্ত পরিণাম** (Climax)

"Culminating point"

(ঠ) **উপসংহার বা সমাধান** (Resolution)

(ড) **সংলাপ** (Dialogue)

নাটকের গঠনগত সমস্যার আলোচনা বাস্তবিকই বিরাট ব্যাপার। তবে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সমস্যাটিকে গণ্ডীবদ্ধ করে আলোচনা করতে হলে—বৃত্তের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করতে হবে। বলা বাহুল্য, বৃত্ত

হ'চ্ছে তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনাপরম্পরা অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার সমবায়ে একক একটি বৃহত্তর বহুপর্বিক এবং রসময় ঘটনার পরিকল্পনা; নানা অংশের বা অঙ্গের সংযোগে তৈরী একটা সমন্বিত অংশী বা অঙ্গী (whole)। অঙ্গীর স্বরূপ না জানতে পারলে যেমন অঙ্গের উপযোগিতা বা তাৎপর্য বিচার করা যায় না, তেমনি নাটকের বৃত্তাংশের উপযোগিতা সমগ্র বৃত্তের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ লক্ষ্য না জানা পর্যন্ত বিচার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বৃত্ত তো স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু নয়। বৃত্তকে আমরা 'ভাব'-রূপ আত্মার দেহ বলে মনে করতে পারি। আত্মা বা দেহীর মধ্যেই যেমন দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তেমনি "মূল ভাব"-এর (root idea) মধ্যেই বৃত্তের ব্যাপ্তির ও জটিলতার সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় **লসন** মহাশয় যা' বলেছেন তা' উল্লেখ করা যেতে পারে ; তিনি বলেছেন —"The dramatic system of events may attain any degree of extension or complexity provided the result (root-action) is clearly defined" অর্থাৎ নাটকের বৃত্তের অর্থাৎ ঘটনা-বিন্যাসের বিস্তার বা জটিলতা, কাম্য ফল লাভের জন্য যতখানি থাকা আবশ্যক ততখানিই থাকতে পারে। আসল কথা—বৃত্ত-পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়—root idea এবং "root action" এর দ্বারা। কারণ, যে—'unity' লসনের ভাষায়—the unifying principle which gives the play its wholeness, binding a series of actions into an action which is organic and indivisible"—তা' আসলে—"Just be a synthesis of theme and action"। সমালোচক লসন বলতে চেয়েছেন—Climax is the point of reference by which the validity of every element of the structure can be determined" ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতির আনুকূল্য করে কি করে না—এই বিচার করে করেই গঠনের প্রত্যেকটি উপাদানের সার্থকতা যাচাই করতে হবে। ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতিকেই বলা চলে—"Root-action" ; climax-ই নাটকের

'most fundamental action of the play'—এই action এর ভেতর দিয়েই 'root idea' ব্যক্ত হয়। উইলিয়ম আর্চারের ভাষায় বললে বলা যায়—"Ultimate climax"-ই হ'চ্ছে নাটকের "Core of the action"। লক্ষ্য করবার বিষয় Climax সম্পর্কে লসন যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা আমাদের প্রচলিত ধারণা থেকে পৃথক। তাঁর মতে প্রত্যেক কার্যের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়,—যথা, (ক) সঙ্কল্প (Decision) (খ) বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম (Grappling with difficulties) (গ) শক্তির প্রয়োগ ও পরীক্ষা (test of strength) (ঘ) চূড়ান্ত চেষ্টা ও তার পরিণতি (Climax)। অর্থাৎ Climax-কেই তিনি শেষ পর্যায় বলে মনে করেছেন। কিন্তু সুবিখ্যাত ফ্রেতাগ যে **পিরামিড** কল্পনা করেছেন, তাতে Climaxএর স্থান মাঝখানে। তাঁর মতে—প্রথম পর্যায় "Introduction," দ্বিতীয় পর্যায়—'Rise' তৃতীয় পর্যায় Climax, চতুর্থ পর্যায় Return or fall, পঞ্চম পর্যায় "Catastrophe'। আমাদের সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সন্ধি বিভাগের কথাও স্মরণীয়। ফ্রেতাগের বিভাগটি—আমাদের সন্ধি-বিভাগেরই অনুরূপ। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ উপসংহৃতি—এই পাঁচ সন্ধিতে কার্যকে ভাগ করা হয়েছে এবং ভাগ করার পিছনে যে যুক্তি আছে তা'ও বলা হয়েছে। স্পষ্টই 'দেখা যাচ্ছে—আমাদের সন্ধি বিভাগে গর্ভ-সন্ধিকে এবং ফ্রেতাগের পিরামিডে—"Climax"কে, "Culminating point' বা Turning point হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং তা হ'য়েছে ব'লেই Climaxএর পরে আরো দু'টি পর্যায় কল্পিত হয়েছে। Lajos Egri'ও Climax এর পরে Tesolution-কে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু লসন এ বিষয়ে আপোষহীন। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা—To divide the climax and the denouement is to give the play dual roots and destroy the unity of the design লসন মনে করেন—চূড়ান্ত পরিণতি এবং উপসংহার কার্যের পৃথক পৃথক পর্যায় নয়। পৃথক পর্যায় হ'লে বৃত্তের **ঐক্য**—সংস্কৃত পরিভাষায় **একার্থ** বা **একান্বয়** ব্যাহত হ'তে বাধ্য।

নাটকের ঘটনা বিন্যাস, দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতির (Climax) অভিমুখী করে অথবা উপসংহারের (Resolution) অভিমুখী করে করতে হবে—এ নিয়ে যত বাদবিসংবাদই থাক, নাটকের রস-পরিণাম যে উপসংহারের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপিত হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে উপযুক্ত রস পরিণামের মধ্যেই, 'মূল ভাব'কে (root idea) সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। Egri যা'কে 'premise' বলেছেন তার মধ্যে রস-পরিণামেরও ইঙ্গিত বেশখানিকটা পাওয়া যায়। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এমন কথা বলা চলে না। আসল কথা—প্রত্যেক রচনারই বিশেষ একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রত্যেক বৃত্তের দায়িত্ব সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তোলায় সম্পূর্ণ হয়। যে বৃত্ত উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তুলতে যত কুশলতা দেখাতে পারে সেই বৃত্ত তত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। এই কুশলতা নির্ভর করে—ঘটনা বিন্যাস ব্যাপারে, আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত অত্যাবশক এবং অপরিহার্য "বস্তু" নির্বাচন করার উপরে, ঘটনার মধ্যে ক্রম, অন্বয় এবং গতিশীলতা রক্ষা করার উপরে এবং সমগ্র কার্যের প্রত্যেকটি পর্ব এবং পর্বাঙ্গকে রসনীয় করার দক্ষতার উপরে। গঠনের সমস্যা এই হিসাবে, প্রধানতঃ কার্যবিভাগ বা সন্ধিবিভাগ ঘটনা-নির্বাচন (The process of selection) বস্তুস্থাপনা (Exposition বা point of attack) ক্রমবিন্যাস (Continuity), গতিশীলতা (Progression), চূড়ান্ত পরিস্থিতির (Climax) নির্ধারণ এবং তদনুযায়ী একান্বয় (Unity) গঠন, চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সুবিন্যাস (Orchestration) এবং পরিণতি (Growth),—প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে কায়িক-মানসিক বাচনিক কার্যের দীপ্ততা দ্বন্দ্বগর্ভতা তথা চিত্তাকর্ষকতা সৃষ্টির সমস্যা।

সীতা নাটকের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে, প্রথমেই এই নাটক-রচনার প্রক্রিয়া এবং প্রেরণা সম্পর্কে দু'একটা কথা ব'লে নেওয়া আবশ্যক।

এ কথা ঠিক বটে যে প্রত্যেক রচনাই কোন একটি মূল ভাব (root-idea) বা উপপাদ্য (premise)—কে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠে থাকে, কিন্তু তাই ব'লে

এ কথা ঠিক নয় যে সব ক্ষেত্রেই নাট্যকারের মনে প্রথমেই একটি 'ভাব' (idea) আসে, এবং পরে তিনি 'root-action-এ ভাবটিকে রূপান্তরিত ক'রে ক্রমান্বয়ে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করেন। এ সম্বন্ধে Egri-র ভাষায় বলা চলে—Playwrights usually get an idea, or are struck by an unusual situation and decide to write a play around it" কিন্তু No idea and no situation, was ever strong enough to carry you through to its logical conclusion without a clear-cut premise' বাস্তবিকই, ঘটনা, চরিত্র, ভাব প্রভৃতির যে-কোন একটি, রচনার প্রাথমিক নিমিত্ত কারণ হ'তে পারে। কিন্তু রসরূপে পরিণত করতে হ'লে, ভাবকে বিশিষ্ট রূপের এবং রূপকে বিশিষ্ট ভাবাদর্শের বন্ধনে বাঁধতেই হবে। শিল্পীরা জ্ঞাতসারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই করুন—এ কাজ করতে বাধ্য। এমন কি যে সব ক্ষেত্রে শিল্পীরা বর্তমান এবং প্রাচীন পরিবেশ থেকে বিখ্যাত ঘটনা বা চরিত্র নির্বাচন করেন, সেখানেও শিল্পীর মনের বিশিষ্ট ভাবাদর্শের ছাঁচে পড়ে ঘটনা বা চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। পুরাতন কাহিনীকে শিল্পী নতুন উপপাদ্যের প্রমাণ হিসাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কাঠামো এক থাকলেও, নতুন শিল্পীর হাতে প্রতিমার দেহ ও প্রাণ ভিন্ন হ'য়ে যায়। সীতা-নাটক-রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন—সীতার চরিত্র এবং সীতার জীবনের শোচনীয় দুঃখদুর্ভোগ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছিল। নাটকের ভূমিকায় গ্রন্থকারের শেষ নিবেদন—"রামায়ণ পড়িতে পড়িতে সীতাদেবীর প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি ও কারুণ্য জাগিয়াছিল, তাহার এক কণামাত্র যদি এই কাব্যে আমি দেখাইয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল বিবেচনা করিব।" এই নিবেদন থেকে পাওয়া যাচ্ছে—সতী-সাধ্বী সীতার পবিত্র চরিত্র এবং দুঃখের উপর দুঃখের আঘাতে এবং লাঞ্ছনার মর্ম্মদাহে জর্জরিত সীতার শোচনীর পরিণতি উপস্থাপিত করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সীতা, দুর্লভ চরিত্রমাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও, রাজার দুহিতা, রাজপুত্রবধূ রাজমহিষী

হওয়া সত্ত্বেও এবং দেহেমনে সম্পূর্ণ নির্দোষ হ'য়েও, জীবনে চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ-ভোগ করেছেন—সেই সীতার জীবনের নীরব মর্মদাহের ট্র্যাজেডি দেখানোকেই নাট্যকার মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে সীতার ট্র্যাজেডির সঙ্গে রামের ট্র্যাজেডি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব'লেই, অগত্যা রামকেও ট্র্যাজেডি-বৃত্তের একটি অর্ধ অধিকার করতে দিয়েছেন। ফলে সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। রাম এবং সীতা দু'জনেই ট্র্যাজেডি-রসের যুগ্ম আলম্বন-বিভাব হয়ে দাঁড়িছেন। সীতা এবং রামের মধ্যে কে অধিকতর কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন—এ আলোচনায় পরে প্রবেশ করা যাবে। এখানকার আলোচ্য—ভাবাদর্শের পার্থক্যে কাহিনীর রূপান্তরের প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে—ব্যক্তির সমাজ-সত্তা এবং ব্যক্তি-সত্তার দ্বন্দ্বের ব্যাপারে যিনি যে ভাবাদর্শের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, তার রচনার পরিকল্পনা (design), সেই ভাবাদর্শ বা প্রতিপাদ্যের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাল্মীকির রামে সমাজ-সত্তা প্রবল। তাই সীতার পাতাল-প্রবেশ অনিবার্য হয়েছে। ভবভূতির রামে ব্যক্তি-সত্তা সমাজ-সত্তা অপেক্ষা প্রবল ব'লে উত্তরচরিত নাটকের পরিণতি মিলনান্ত হয়েছে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড় ব'লে—নাটকের প্রতিপাদ্যও ভিন্ন হ'য়েছে। নাট্যকার ভবভূতির রাম অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের রাম অধিকতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকামী এবং ব্যক্তি-অধিকার সচেতন ব'লেই, প্রচলিত কাহিনীর চাপে সমাজ-বিধানের বিরোধিতা করতে না পারলেও, যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। প্রাচীন কাহিনীর কাঠামোতে নতুন প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে নাট্যকার পরিণতির অনিবার্যতা রক্ষা করতে পারেননি। রামকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ক'রে তিনি যা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা'তে নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি অপেক্ষা মিলনান্ত পরিণতিই স্বাভাবিক। বর্তমান "সীতা"-নাটকের 'Premise' তৈরী করতে হলে বলতে হবে—অন্ধ কর্তব্যনিষ্ঠায় বা সমাজ-বিধানের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য বশে মানুষ যখন প্রেমের অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার দাবী উপেক্ষা করে, তখন সে অজ্ঞাতসারে আত্মহত্যারই পথ

প্রশস্ত করে ; প্রেমের দাবী স্বীকার না করা পর্যন্ত তার পক্ষে প্রকৃতিস্থ হওয়া সম্ভব নয়। নাটকের এই প্রতিপাদ্যকেই নাট্যকার রাম-চরিত্রের সাহায্যে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন এবং বাল্মীকির আশ্রমে সপুত্র সীতার সঙ্গে রামের মিলন ঘটিয়ে তা' প্রমাণ করেছেন। সেখানেই নাটকের সব দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটেছে। এই প্রতিপাদ্যে পাতাল-প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই এবং সীতার পাতাল-প্রবেশ রাম-সীতা সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতিও নয়। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিপাদ্য-বহির্ভূত পরিণতি ঘটাতে গিয়ে—আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছেন।

পরিকল্পনার আর একটি ত্রুটি এই :—আমরা জানি নাটকের বিঘোষিত মুখ্য উদ্দেশ্য—সীতার করুণ জীবনের রূপ ও শোচনীয় পরিণতি দেখানো। এই উদ্দেশ্য-অনুসারে বৃত্ত রচনা করতে হ'লে, সীতাকেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়ে—Premise গঠন করা উচিত ছিল। সীতার চরিত্র-মাহাত্ম্যকে এবং শোচনীয় দুঃখ দুর্ভোগের রূপকে মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করলে—সীতার শোচনীয় জীবন থেকে যে প্রতিপাদ্য গঠন করা সম্ভব, তা'কে কেন্দ্র করেই কাহিনী গঠন করা উচিত ছিল। বনবাসের ক্লেশ স্বীকার, লঙ্কায় বন্দিনী জীবনের মর্মান্তিক যাতনা, লঙ্কায় সভার মধ্যে সতীত্বের শপথ নেওয়া,—লোকাপবাদের ফলে পতির কাছ থেকেই নির্বাসন দণ্ড লাভ—বাল্মীকির আশ্রমে বিরহখিন্ন মৃতপ্রায় জীবনের ভারবহন—যজ্ঞ পরিষদে সমস্ত মুনি-ঋষি-রাজন্যবর্গ জন-সাধারণের সমক্ষে দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণের চরম লাঞ্ছনা—শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে শান্তির সন্ধান করা—সীতার দুঃখদুর্ভোগের বিভিন্ন পর্যায়। এই দুঃখ দুর্ভোগের জীবন থেকে নাট্যকার একাধিক নতুন মূলভাব বা প্রতিপাদ্য তৈরি করতে পারতেন। বিশেষ করে দেখাতে পারতেন—নারী প্রেমময়ী এবং নির্দোষ হওয়া সত্বেও, যুগে যুগে সমাজের কাছে অতিনিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে—পুরুষের কাছে ন্যায্য সুবিচার সে পায়নি—অকালে তার জীবন শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেছে। এই 'Premise' কে সীতার জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হ'লে, যজ্ঞ

পরিষদে সীতা-গ্রহণের ঘটনাকে অবশ্যই দৃশ্য করে তুলতে হবে। মোটকথা Premise খুব স্পষ্টাকারে প্রতিভাত না হওয়ায়, অথবা প্রতিপাদ্যের দিকে ঠিক দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকায়—নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে পরিপাটি একার্থকতা বা একান্বয় (Unity of design) ফুটে উঠেনি। এ কথা বলতেই হবে—রামই নাটকের 'Pivotal character' হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত—রামের ট্র্যাজেডির উপরেই অধিকতর আলোকপাত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে—রামের দুঃখের মাত্রা তখনই পূর্ণ হয়েছে যখন—"নিয়তি কঠিন, ছলভরে, পূর্ণ সুধাপাত্র ধরিয়া অধরে, পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে, সহসা ছুড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে"। সীতার অকস্মাৎ ভূতলে-প্রবেশেই রামের জীবনে এই ট্র্যাজিডি ঘটেছে। অবশ্য সীতার মুখেও রামের উল্লিখিত আক্ষেপ প্রত্যাশা করা চলে। তবে, বলা বাহুল্য, সীতার ভূতলে প্রবেশ এবং রামের ঐ ট্র্যাজেডি নাটকীয় ঘটনার অনিবার্য পরিণতি রূপে দেখা দেয়নি। নিতান্তই একটি বাহ্য ঘটনার অর্থাৎ প্রকৃতির আকস্মিক উৎপাতের সাহায্যে, নাট্যকার—রাম-সীতার পূর্ণ সুধাপাত্র কঠিন ভূতলে নিক্ষেপ করেছেন।

প্রতিপাদ্য ও পরিণতির মধ্যে অন্ধাঙ্গিযোগের অভাব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য এই কথাটি যে সীতা নাটকের "কার্যে" (Action), 'Strict unity' বলতে যা বুঝায়, তা' নেই। নিখুঁত ঘটনা-ঐক্য রক্ষা করতে হলে—'কার্য' হিসাবে সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রবেশ—এই দুই ঘটনার যে-কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে। এ নাটকে তা' করা হয়নি। সীতার বনবাস থেকে আরম্ভ ক'রে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত রাম-সীতার কথা এখানে সংপ্রযোজিত হ'য়েছে। এ কথাও এখানে জোর করে বলা চলে না যে, সীতার পাতাল-প্রবেশ নামক ঘটনাটিকে লক্ষ্য করেই এখানে ঘটনাবিন্যাস করা হয়েছে। তা যে করা হয়নি, আগেই প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে—সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রবেশ এই দুটি প্রধান ঘটনার সংযোগে একটা যৌগিক ঐক্যের বৃত্ত

রচনা করা হয়েছে। অবশ্য, আপাততঃ দু'টি ঘটনাকে যত পৃথকই মনে হোক, এক হিসাবে দু'টি ঘটনার মধ্যে বেশ ঐক্য আছে ; সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রবেশ যেন একই সমস্যার দু'টো মেরু। রাম-সীতার দাম্পত্য জীবনে উত্তরকাণ্ডে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল—সীতার বনবাসে তার আরম্ভ এবং সীতার পাতাল প্রবেশে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। অর্থাৎ সীতার বর্জন ও গ্রহণ ব্যাপার (পাতাল প্রবেশ সহ) একই সমস্যা-বৃত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই বর্জন ও গ্রহণের মধ্যে যেমন একটা কালগত ক্রম আছে, তেমনি আছে একটা অবস্থা-গত ক্রম পরিণাম—বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে সমস্যাটির সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সমস্যার আরম্ভ থেকে সমাধানের উপসংহার পর্যন্ত কার্যের যে ক্রমবিকাশ (Progerssion বা Transition) রয়েছে, তাকে আশ্রয় ক'রেই নাট্যকার একার্থক বা একান্বয়সম্পন্ন বৃত্ত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এবার, আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত, যে ঘটনা-পরম্পরার মাঝ দিয়ে নাট্যকার তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন, তার আবশ্যকতা ও পারিপাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

সমগ্র কার্যকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে বা পর্বে—ইংরেজি পরিভাষায় পাঁচটি 'এ্যাকট' বা 'Cycle'-এ—ভাগ করে নিয়েছেন এবং প্রত্যেক ভাগের উপস্থাপ্য কার্যাংশকে একাধিক দৃশ্যের সাহায্যে সম্পাদন করেছেন। এই বিভাগের সার্থকতা বিচার করার আগে, প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার—নাটকের প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগ (Cycle)—"Small replica of the Construction of a play involving exposition, rising action, clash and climax (Lawson) অঙ্ক-গঠন সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লসন মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—"The activity must be compressed and heightened ; the speed of the development and the point of explosion must be determined in referecne to the climax of the Cycle and the Climax of the whole play"

লসনের এই নির্দেশটি সামনে রাখলে প্রতি পর্বের ঘটনা বিন্যাসের অর্থাৎ দৃশ্য-কল্পনার বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজ সাধ্য হবে বলে মনে হয়। দেখা যাক আমাদের নাট্যকার এখানে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন—তাঁর দৃশ্য কল্পনা গঠন-পারিপাট্যে, ভাবে ও রসে কতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রথম অঙ্কের মুখ্য কার্য—রামের আদর্শ রাজা হওয়ার সঙ্কল্প; প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানার জন্য ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগ এবং গুপ্তচরের মুখে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে লোকাপবাদ শ্রবণ করা তথা সঙ্কটের সম্মুখে এসে উপস্থিত হওয়া। গৌণ কার্য—রাম-সীতার প্রগাঢ় প্রেমের সম্পর্কটি, বিশেষতঃ সীতার চরিত্রের মানসিক অবস্থাটি, দর্শকের সামনে ব্যক্ত করা। এই কার্যাংশ সম্পন্ন করার জন্য নাট্যকার পাঁচটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছেন।

প্রথম দৃশ্য—সভা। প্রথমাংশে রাম রাজকার্যসাধনে অর্থাৎ প্রজাদের কল্যাণ করবার জন্য ভ্রাতাদের কাছে আন্তরিক সাহায্য চেয়েছেন, অষ্টাবক্র মুনির উপদেশ—রাজা শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য, রাজকার্য প্রজাসেবা; প্রজার সুখের জন্য নিত্য বিসর্জ্জিতে হবে সর্বসুখ আপনার—যদি হয় প্রয়োজন—ত্যাজ্য বন্ধু ভ্রাতা মাতা পত্নীও নিশ্চয়"—রাম শিরোধার্য করেছেন। রাম সঙ্কল্প জানিয়েছেন—"আমারও তাই জীবনের সাধনা ও ধ্যান—নিত্য কায়মনোবাক্যে প্রজাদের সাধিব কল্যাণ।" এই সঙ্কল্প থেকেই প্রজাদের অভাব অভিযোগ জানার এবং ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগের ভরতকৃত প্রস্তাব রাম 'উত্তম প্রস্তাব' ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং প্রজাদের অভিলাষ ব্যক্ত হওয়ার আগেই তা' পূর্ণ করবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। রাজকার্যে রাম যে অতি তৎপর, অত্যাচারী লবণ দৈত্যের বিরুদ্ধে শত্রুঘ্নের অধীনে সৈন্য প্রেরণ ক'রে তারও প্রমাণ দিয়েছেন। তবে, ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার ভিতরে, রাম সীতার কামনা পূর্ণ করার জন্য যে ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন, তা'তে রামের সীতাপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের দুর্বলতাও ব্যক্ত হয়েছে।

এই দৃশ্য কল্পনা সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথাটা মনে হয় সে এই যে,—ভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দৃশ্যকে "সভা" হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে কি না। "মন্ত্রণা সভা" বলে শোধন করে নেওয়ার পথেও বাধা আছে। মন্ত্রনার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি চাই—সমস্যা চাই। তেমন কোন সমস্যা এখানে আলোচিত হয়নি। সঙ্কটের প্রস্তুতি হিসাবেই, দৃশ্যটিকে বিচার করতে হবে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে—"Exposition" নিছক 'In formation' দেওয়াই নয়—"It is necessarily a very exciting point in the development of the story" দৃশ্যের উদ্দেশ্য—পাত্র-পাত্রীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়াই হোক অথবা তাদের বর্তমান ও অতীত সম্পর্ক এবং সম্পর্কের পরিবর্তনের সূচনা দেখানোই হো'ক—"The information' must be dramatized"। দৃশ্যটিতে জীবন সম্পর্কের বাস্তবকল্প রূপের অভাব আছে এবং আছে বলেই দৃশ্যটিতে জীবন্ত চরিত্রের ক্রিয়া—শারীরিক, মানসিকও বাচনিক উদ্যমের বাস্তবিকতার মাত্রা তথা দীপ্তি (Energy) কম। Root-idea, Root action বা premise এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযোগ না থাকলে কোন পরিকল্পনাকেই সার্থক পরিকল্পনা বলা চলে না, এই নাটকের যে মূলভাব বা প্রতিপাদ্য—(কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়)—তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বস্তু স্থাপনা করতে হলে—রামচরিত্রে কর্তব্যের ও প্রেমের নিষ্ঠাকেই প্রথমে ব্যক্ত করা দরকার। সীতা নাটকের প্রত্যাশিত "Exposition" বা Point of attack—"রাজা-রাম" এবং 'প্রেমিক-রাম' এর প্রত্যক্ষ পরিচয় দেওয়া।

এই দৃশ্যে রামের প্রজানুরঞ্জনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করা হ'য়েছে বটে, কিন্তু, যে পরিমাণ ভাব-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে দেখালে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং রামচরিত্রের আদর্শবাদিতা স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হ'ত এবং নাটকীয় দীপ্তি লাভ করত, কবি ততখানি—ততখানি কেন তার শতাংশের একাংশও—ভাবদ্বন্দ্ব দেখাতে পারেননি।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজ-অন্তঃপুর। এই দৃশ্যটিও—Exposition বা মুখসন্ধির

অন্তর্গত। সীতার মানসিক অবস্থার রূপটি দেখানোই এই দৃশ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানকার উদ্দেশ্য, সীতার নিজের উক্তিতে—(এ প্রাণ সদাই তাই হু হু করে। সদা ছুটে যেতে চাই আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, মোর নাথ সনে—সেই গোদাবরী তীরে) এবং শান্তার বিশ্লেষণে—(এমনি—সদা চিন্তাকুল সীতা, সদা অন্যমনা, চাহে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঙ্গনয়না, সপ্রশ্ন বিস্ময়ে, সদা আতঙ্ক বিহ্বল; মুহূর্তে পাণ্ডুরা, চক্ষু দু'টি ছল ছল ভ'রে আসে জলে; হাসি মিলাইয়া যায় গভীর বিষাদে")—ব্যক্ত হ'য়েছে। সীতার এই মানসিক বৈশিষ্ট্যে দু'টি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। একটি—বন-প্রদেশের বা মুক্ত প্রকৃতির জন্য সীতার গোপন কামনা, অন্যটি—বিচ্ছেদের আতঙ্ক। এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নাটকীয় প্রযোজন আছে কি না তা' আলোচনা করার আগেই, একটা প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রশ্ন জাগতে পারে—সীতার মনে, বন-প্রদেশে ফিরে যাওয়ার কামনা এবং আতঙ্কবিহ্বলতা, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে স্বাভাবিক কি না। যাঁর মনে সদাতঙ্ক—'দুর্দিন লঙ্কার হারাইয়া তার শিকার খুঁজিয়া অযোধ্যার দ্বারে আসি' ধেয়ে, যেন বাধা পেয়ে, ঘুরিছে ঘেরিয়া চারিধার এ পুরীর, চায় শুদ্ধ সুবিধায়, সদাই আমাকে তোমার ও হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে (১ম অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য), তাঁর পক্ষে, আবার সেই গোদাবরী তীরে যাওয়ার বাসনা কি স্বাভাবিক? একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভাবী বনবাসের এবং বিচ্ছেদের ছায়া হিসাবে সীতার এই মানসিক অবস্থার একটা মূল্য আছে। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু মূল্যসৃষ্টির জন্যই যদি নাট্যকার এই দৃশ্যটি যোজনা ক'রে থাকেন, তা'হলে একে গঠনগত ত্রুটি হিসাবেই ধরতে হবে। সীতা-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য, পরবর্তী ঘটনায় বা তাঁর চরিত্রের ক্রম-পরিণতিতে যদি প্রভাব বিস্তার করে থাকে তবেই তার সার্থকতা। আমরা দেখতে পাই—সীতার প্রকৃতিপ্রীতি এবং অপ্রকৃতিস্থ আতঙ্ক পরবর্তী ঘটনায় কোন কাজেই আসেনি। বাল্মীকি সীতার তপোবন দর্শনের আকাঙ্ক্ষাকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, আমাদের নাট্যকার তা' করতে পারেননি। তারপর, সীতার সদাতঙ্ক ভাবটি ৪র্থ দৃশ্যের পরেই সীতার চরিত্র

থেকে একেবারে উবে গেছে। রামের তীব্র মনস্তাপের মুহূর্তে সীতার এই আতঙ্কের উল্লেখ থাকলেও, অন্ততঃ একটি ব্যাপারে, আতঙ্কের উপযোগিতা পাওয়া যেত। এই হিসাবে, দৃশ্যটিতে কবিত্ব যতই থাক, অপরিহার্যত্ব নেই। আর তা যদি না থাকে, নাটকে নিরপেক্ষ কবিত্বের কোন মূল্যই নেই। তারপর এ কথাও এখানে বলে রাখা যাক—অনেকেরই মুখে—বিশেষতঃ শান্তার মুখে অনুচিত (out-of-character) কবিত্ব ব্যক্ত হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না—নাটক কাব্য বটে, কিন্তু কল্পনা-শক্তির স্বাধীন অনুশীলনের ক্ষেত্র নয়।

তৃতীয় দৃশ্যে—লক্ষ্মণ-উর্ম্মিলার নিরর্থক আলাপে এই কবিত্ব গীতি-কাব্যের পূর্ণ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এই আলাপ-প্রলাপ নাটককে কোনভাবেই সাহায্য করেনি। প্রণয়-সুধা না পেলে প্রাণের ক্ষুধা মেটে না—এই কথাটা শোনানোর জন্য একটা গোটা দৃশ্যের যোজনা চূড়ান্ত অমিতব্যয়িতা। দৃশ্যটি সর্বতোভাবে অবান্তর। চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার অগ্রগতি কোনটাই এ ব্যক্ত করে না।

চতুর্থ দৃশ্য—প্রাসোদ প্রান্তস্থ উপবন। রাম ও সীতার বিশ্রম্ভালাপ। এ দৃশ্যও মুখসন্ধির (exposition) অন্তর্গত। এই দৃশ্যে—একদিকে রাম-সীতার পারস্পরিক ঐকান্তিক অনুরাগ, অন্যদিকে—সীতার আতঙ্ক-অপ্রকৃতিস্থ বিকৃত-প্রায় মনের রূপটি দেখানো হয়েছে এবং আসন্ন বিচ্ছেদের সংকেত দিয়ে একটা থমথমে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হ'য়েছে। এই দৃশ্যে রাম-সীতার ঐকান্তিক প্রেম-নিষ্ঠার চেয়ে সীতার আতঙ্ক-অপ্রকৃতিস্থতাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ এত প্রধান একটি উপস্থাপ্য বিষয়, এখানেই তার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে লয় পেয়ে গেছে ; সীতা-চরিত্রের ক্রমবিকাশে এই আতঙ্ক ও অপ্রকৃতিস্থ ভাব কোন অংশই গ্রহণ করেনি।

পঞ্চম দৃশ্য—প্রাসাদকক্ষ। এই দৃশ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগের ফল ফলেছে। দুর্ম্মুখ এসে সীতার সম্বন্ধে লোকাপবাদের কথা রামের কাছে নিবেদন

করলে—রাম নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন—মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়ে—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—

রাজ্য মিলাইয়া যাক স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্বর্য্যের মত ; চূর্ণ হোক্ পদতলে
এ প্রাসাদ ; ভেসে যাক্, সরযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্য্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হ'য়ে যাক।—আজ আমার এ পাপে
সৃষ্টি নাশ হোক। তবু হৃদয়ে আসীন,
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন।
এই বক্ষে ভস্মীভূত বিশ্বচরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে।

এই পঞ্চম দৃশ্যেই প্রধান চরিত্র মূল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'য়েছে। সেই হিসাবে এখানেই exposition-এর cycle শেষ হ'য়েছে। অবশ্য নাটকখানি আরম্ভ হয়েছে—"with a decision which will precpitate conflict" এবং নাটকের প্রকৃত দ্বন্দ্বের আরম্ভ হ'য়েছে—পঞ্চম দৃশ্যে—যেখানে প্রধান চরিত্রকে এমন এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে—যা'তে সঙ্কট অনিবার্য হ'য়ে উঠে। পঞ্চম দৃশ্যে 'রামের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখানো হ'য়েছে—তা'তে প্রেমিক-রামের রূপটি বিশেষভাবে ব্যক্ত হ'লেও, রামের গাম্ভীর্য একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লেই মনে হয়। অধিকন্তু—বশিষ্ঠের উপর রামের যে আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে, তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ পাওয়া যায় না ব'লেই তা' অপ্রস্তুত। দুর্মুখ সংবাদ নিয়ে আসার আগেই, প্রজারঞ্জনে ত্যাজ্য সীতা, এ আদেশ বশিষ্ঠ দিয়েছেন কি ? না দিলে, 'বশিষ্ঠ নিষ্ঠুর……ইত্যাদি সংলাপ অনাবশ্যক।

দ্বিতীয় অঙ্কের মুখ্য কার্য—সীতা-নির্বাসন—(এক্ষেত্রে সীতার স্বেচ্ছাকৃত-নির্বাসন)। বাল্মীকির রামায়ণে রাম বয়স্যদের মুখে লোকাপবাদ শুনে নিজেই

সব দিক বিচার ক'রে দেখেছেন এবং সীতাত্যাগের সঙ্কল্প করেছেন। এই নাটকে রাম সমস্যার সমাধানকল্পে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হ'য়েছেন। বশিষ্ঠের আদেশে সীতাকে ত্যাগ করতে স্বীকৃত হ'য়েছেন, ভরত ও শান্তার অনুনয়-আবেদন সত্ত্বেও সঙ্কল্পে অটল র'য়েছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত মায়ের কাতর প্রার্থনায় সত্যভঙ্গ করতে প্রস্তুত হ'য়েছেন। তবে, সীতা স্বামীকে ছোট হ'তে দেননি—পতিসত্য-রক্ষার জন্য নিজেই বনবাসে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছেন। এই কার্যটুকু নাট্যকার চারটি দৃশ্যে সম্পন্ন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে—অন্তঃপুরের দরদালানে—কৌশল্যার স্বগতোক্তি দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ এবং অশ্রুমতী সীতা এবং কৌশল্যার সংলাপের ও অনুভাবের সাহায্যে, রামের চম্পকারণ্যে বশিষ্ঠের কাছে যাওয়ার সংবাদটুকু এবং অত্যাসন্ন অমঙ্গলের সূচনা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—বশিষ্ঠাশ্রমে—রাম ও বশিষ্ঠের মধ্যে সীতা-ত্যাগ সম্বন্ধে বিতর্ক হয়েছে। রামের যুক্তির বিরুদ্ধে কর্তব্যপালনের পক্ষে বশিষ্ঠের অধিকতর আবেগময় বক্তৃতা এবং বশিষ্ঠের কাছে রামের আত্মসমর্পণ উপস্থাপনা করা হ'য়েছে। রামের কাছে সীতাত্যাগ—'একান্ত অসাধ্য' কার্য—অতি তিক্ত পানীয় পান; বিশেষতঃ নিরপরাধিনী সীতাকে ত্যাগ পাপ। বশিষ্ঠ রামের এই সব যুক্তি খণ্ডন করতে তথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—কর্তব্যপালন অনেকক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য এবং তিক্তপানীয় পান; কর্তব্যপালন ও আত্মহত্যা এক পদার্থ নয়, অপরাধ বা পাপ-পুণ্য বিচার শুধু সমাজবিধানেরই সঙ্গে মিলিয়ে করা সম্ভব এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক ব্যক্তি—সমাজের বাইরে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি নেই।

অতএব ব্যক্তির সর্ব্বেব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্ব্বসুখ বলি দিতে হবে সমাজের পদে;.........

এবং—সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহা সব, তাহাই পাপ......পাপপুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি এবং রাজা "সমাজের প্রতিনিধি"—"সমাজের ভৃত্যমাত্র"।

রাম বশিষ্ঠের এই সিদ্ধান্তকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। তবে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে—যতখানি ঐকান্তিক আবেগে সীতাকে রাখার জন্য সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন, ততখানি দৃঢ়তার সঙ্গে বশিষ্ঠের কাছে ব্যক্তি-অধিকারের দাবী উত্থাপন করতে পারেননি। 'ব্যক্তির জন্য সমাজ' না 'সমাজের জন্য ব্যক্তি'—এই সমস্যার আলোচনায় বশিষ্ঠ তাঁর বক্তব্য যত জোরে এবং বিস্তারে বলেছেন, রাম তত জোরে এবং বিস্তারে নিজের বক্তব্য বলতে পারেননি। তাই দেখা যায়—রাম নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন—"গুরুদেব! বুঝি না এ বাণী! তুমি আজ্ঞা কর আমি কার্য করি। এই মাত্র জানি।" এখানে রামের কাছে যতখানি দ্বন্দ্ব প্রত্যাশিত ছিল, ততখানি দ্বন্দ্ব পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠের ইচ্ছার সঙ্গে রামের ইচ্ছার তীব্র দ্বন্দ্ব এবং সমাধান সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে পারলে, দৃশ্যটি আরো রস-ভাবোজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারত। এখানে—রাম হ'য়েছেন তেমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রচলিত সমাজ-বিধানকে মানতে রাজি ন'ন বটে কিন্তু, প্রচলিত সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতেও সাহসী ন'ন। ফলে বিবেকের বিরুদ্ধেই তাঁকে সমাজবিধি মানতে হয়েছে—এবং সারাজীবন পাপবোধের তুষানলে দগ্ধ হ'তে হ'য়েছে। ভরত যে বিশ্লেষণ করে ব'লেছেন—"প্রধান ভ্রম যে অভ্রান্ত বশিষ্ঠ। দ্বিতীয় ভ্রমটি—কর্তব্যনিষ্ঠ মূঢ় নিশ্চিন্ত...।"—সে কথা সর্বাংশে ঠিক নয়।

বশিষ্ঠের বক্তৃতার উত্তরে রামের উক্তি—"গুরুদেব, বুঝি না এ বাণী। তুমি আজ্ঞা কর, আমি কার্য করি। এইমাত্র জানি।"—আপাততঃ আনুগত্য-জ্ঞাপক হ'লেও, "বুঝি না এ বাণী"র সুরে 'বশিষ্ঠ অভ্রান্ত'—এ স্বীকৃতি ফুটে উঠে না। যাই হোক এই দৃশ্যে, রাম অগত্যা কর্তব্যপালনের জন্য সীতা-নির্বাসনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্যে—(উর্মিলার কক্ষে) লক্ষ্মণ-উর্মিলার কথোপকথন থেকে জানা যায়—লক্ষ্মণের উপর সীতা-নির্বাসনের আদেশ হ'য়েছে—বাল্মীকির

আশ্রমে সীতাকে রেখে আসতে হবে এবং উর্মিলাকেই সীতার কাছে নির্বাসন-সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে।

চতুর্থ দৃশ্য—*রাজসভা। পরিস্থিতি—রাম একাকী সিংহাসনে ব'সে আছেন।* রাজত্ব অর্থাৎ রাজকর্তব্য তাঁর চোখে লৌহ-শৃঙ্খল; কালকূটভরা-স্বর্ণপাত্র, অন্তঃসারশূন্য গৌরব—পুণ্য-ছদ্মবেশধারী পাপ—কদর্য-বিলাস। অতীব দরিদ্র নীচাদপি নীচ প্রজার জীবনও রাজার জীবনের চেয়ে সুখী, কারণ তার স্বাধীনতায় কেউ বাধা দিতে যায় না [সত্যিই কি তাই? নীচাদপি নীচ প্রজাও সামাজিক জীব—সমাজের বিধান তাকেও মানতে হয়। ঐ জাতীয় অবাধ স্বাধীনতা কোন সামাজিক মানুষের জীবনে সম্ভব নয়] রামের এই মনোভাব সত্য হ'লে নিশ্চয়ই এ কথা বলা চলবে না যে রামের মধ্যে 'কর্তব্যনিষ্ঠ মূঢ় নিশ্চিন্ততা' রয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠা ট'লে না গেলে—এই সব কথা কিছুতেই বের হ'তে পারে না। কর্তব্যপালন রামের কাছে আত্মহত্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে; রাম কর্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে বাঁচতে চান—চান—

"কোন দূর বনে গিয়া, শান্তিময়
পবিত্র, অতুল, অনন্ত, অক্ষয়
বিশ্রাম বিভবে কাটাইতে দিন"

(কি কর্তব্যের ক্ষেত্রে কি ব্যক্তি বাসনার ক্ষেত্রে—সর্বত্রই রাম যেন ভীরু সৈনিক।)

এখানেই এবং সীতা নির্বাসন নিয়েই, ভরত রামের আচরণের সমালোচন করেছেন। "সীতা ত্যাগ আজি চাহে সব অযোধ্যার সব প্রজা"—রামের এ যুক্তি মানতে তিনি রাজি নন। প্রজা অন্যায় দাবী করলেও রাজাকে তা' মানতে হবে—এমন কোন কথা নেই। সে নীতি রাজনীতির নামে অরাজকতারই নামান্তর। তেমনি কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ মাত্রকেই শিরোধার্য করতে ভরত সম্মত নন।—বশিষ্ঠ অভ্রান্ত নন; তিনি চিন্তাকূপে অন্ধ—শুষ্কপ্রেম-স্নেহ। ভরতের তৃতীয় যুক্তি—রাজা নিজেই যদি নারীর সম্মান না রাখেন

তাহলে প্রজার কাছে রমণীর প্রাণ পুরুষের ক্রীড়ায় পরিণত হবে—পত্নীর প্রতি পতির কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যাবে। কিন্তু তবু রাম অটল। অগত্যা ভরত অভিমানে রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ব্যক্ত করে প্রস্থান করেছেন।

প্রবেশ করেছেন—ভগিনী শান্তা। বিনীত দৃঢ়তা নিয়ে শান্তা সীতার সতীত্ব এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে আবেগময়ী বক্তৃতা করেছেন। তা'তেও কোন ফল হয়নি। সেইক্ষণেই প্রবেশ করেছেন মাতা কৌশল্যা। রামকে তিনি "পাপ উন্মত্ত আত্মঘাতী কাজ' করতে কিছুতেই দেবেন না। আর মাতৃ-আজ্ঞার চেয়ে গুরু-আজ্ঞা বড় হ'তে পারে না ; সুতরাং গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে মাতৃ-আজ্ঞা রাখতেই হবে—রামের কাছে কৌশল্যার এ ভিক্ষা।

শেষ পর্যন্ত—মায়ের মিনতিতে রাম সত্যভঙ্গ করতে সম্মত হয়েছেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তাঁর মধ্যে অনুশোচনা এবং দ্বন্দ্বও বেশ দেখা দিয়েছে। সূর্যবংশের সন্তানের পক্ষে এই অঙ্গীকারভঙ্গ কম সঙ্কট নয়। সীতা এসে রামকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন—সুসংযত আবেগে তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন—"আমিও রাখিব পতিসত্য।............ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর"। সীতার সঙ্কল্প শুনে রাম নিজেকে 'পাষাণ' 'পিশাচ' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, চোখে অন্ধকার দেখেছেন এবং বুকে সমুদ্রের আলোড়ন অনুভব করেছেন বটে, কিন্তু আবেগ প্রকাশের বেশী আর কিছুই করেননি। সীতার স্বেচ্ছা নির্বাসনের সঙ্কল্পের পরে, রামের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় আবেগে শেষ হবে-এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত নয়। নাট্যকার প্রত্যাশা পূর্ণ করেননি এবং না করে রামচরিত্রকে বাস্তবতার দিক দিয়ে অপূর্ণ করে রেখেছেন। রাম যেটুকু আচরণ করেছেন বা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন কোন জীবন্ত চরিত্রে তা' যথেষ্ট এবং স্বাভাবিক ব'লে মনে করা চলে না। বাল্মীকির রামের মতো এই রামের ব্যক্তিত্বের জোর এবং ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা থাকলে, রামের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো তীব্র মাত্রায় দেখা দিত। রাম-সীতার ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্ব এবং উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক অথচ অনিবার্য সমাধান দেখাতে পারলে তবেই সব দিক রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল।

তৃতীয় অঙ্কের কার্য—লবকুশের জন্মের কিছুকাল পরবর্তী সময় থেকে—শূদ্রকবধ পর্যন্ত সীতার এবং রামের বাহ্য ও আন্তর জীবনের রূপ ব্যক্ত করা। তৃতীয় অঙ্কের **প্রথম দৃশ্য**—বাল্মীকির তপোবন। সীতা ও বাসন্তীর সংলাপের ভিতর দিয়ে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন—(ক) আশ্রম-জীবনের সঙ্গে রামময় সীতা বুঝাপড়া করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি আর তাঁকে আগের মতো মুগ্ধ করতে পারে না। সীতার অবস্থা—সীতার নিজেরই ভাষায়—"যে দিকে নিরখি, নিরখি সে একই দৃশ্য রাঘবের মুখ; মনে জাগে শুধু সখি সে অতীত সুখ, তাঁর চিন্তা তাঁর ছবি বহে চক্ষে ভাসি।" সব সাধ শুষ্ক তপস্যায় শৃঙ্খলিত করে রাখলেও—"তবু ভেঙ্গে যায় বাঁধ অসতর্ক মুহূর্তে কখন জেগে ওঠে ঘুমন্ত সে প্রেম।" (খ) লব-কুশের জন্মের পরে কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। কারণ কুশ-লব নিজেরাই তখন এখানে ওখানে যেতে পারে। বাসন্তীর—'দেখি কোথা কুশী লব'-ই তার প্রমাণ।

এই দৃশ্য যোজনা সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, নির্বাসনের পরে সীতার অবস্থা কি হ'য়েছিল তা দৃশ্য ক'রে পাঠকের কৌতূহল মেটাতে হলে যে ধরণের দৃশ্য যোজনা করা বাঞ্ছনীয় ছিল—তা' করা হয়নি। প্রেম ও তপস্যার দ্বন্দ্ব শুধু মাত্র বিবৃত না করে, দৃশ্য করতে পারলে, সীতার অভিযোজন-প্রচেষ্টার জীবন্ত রূপ সুন্দর ফুটে উঠত। সীতার জীবন যেখানে মুখ্য উপস্থাপ্য, সেখানে এই সব দৃশ্য অবশ্যই প্রত্যাশিত। দ্বিতীয়তঃ 'Continuity'-র সমস্যা সম্বন্ধেও নাট্যকার তেমন সচেতন হ'তে পারেননি। সীতা যে গর্ভিনী—এ কথা এর আগে ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি; সুতরাং কুশী-লবের জন্ম ও পরিচয় পাঠকের কাছে অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়, এবং সেই কারণে বাসন্তীর "দেখি কোথা কুশীলব"—অপ্রস্তুত বার্তায় পরিণত হয়েছে। সীতার করুণ জীবনকে দৃশ্য করা যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে, সীতার আশ্রম জীবনের কারুণ্যকে আরো বিস্তারে এবং প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা কর্তব্য। নাট্যকারের দৃষ্টি রামচরিত্রে অধিকতর নিবদ্ধ ব'লে সীতার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা

আশানুরূপ হতে পারেনি। সীতাকে একটি দৃশ্যে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপিত করেই নাট্যকার—**দ্বিতীয় দৃশ্যে**, অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন এবং শূদ্রক-বধের আয়োজন করেছেন। **তৃতীয়-দৃশ্যে**—ভরতের মাতুলালয়ে ভরত মাণ্ডবীর কথোপকথনের তির্যক দৃষ্টিতে রাম-সীতার গভীর প্রেম ও চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন; **চতুর্থ দৃশ্যে**, পঞ্চবটী বনে রামের স্মৃতি রোমন্থনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে রামের অন্তর্বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং **পঞ্চম দৃশ্যে**—শৈবল রাজের আশ্রমে, শূদ্রক-বধ সম্পন্ন করেছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমে নাট্যকার অতিসংক্ষেপে কয়েকটি সংবাদ জানিয়েই, কতিপয় ঋষি সহ বশিষ্ঠের 'প্রবেশ' ঘটিয়েছেন এবং প্রথম ঋষির মুখ দিয়ে অকাল মৃত্যুর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। 'বশিষ্ঠ অকাল মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন, তা'র সম্বন্ধে লক্ষ্মণ প্রশ্ন তুললেও রাম কোন মন্তব্য করেননি। রামের এক কথা—"যথা আজ্ঞা তাহাই করিব মহাভাগ।"

রামচরিত্রের ক্রমপরিণতির (Growth) হিসাবে রামের এই মনোভাব অবশ্য লক্ষণীয়। রাম যেন সীতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিবেক বিচার স্বাধীন সত্তা ত্যাগ করেছেন। তার নিজের কোন সঙ্কল্প নেই। অসাড়ভাবে বশিষ্ঠের আদেশ পালন করে রাম যেন নিজেকেই নিজে শাস্তি দিচ্ছেন।—নির্দয় কর্তব্য নীরবে পালন করার মধ্যে যে আত্মপীড়ন ও আত্মক্ষয় রয়েছে, তাতেই যেন রামের সুখ। রাম অনুভবের অর্থাৎ হৃদয়ের টুটি চেপে ধরে, হৃদয়হীন কর্তব্যনিষ্ঠার আত্মক্ষয়কারী পরিণামকেই প্রমাণ করতে চান। ভিতরকার কর্তব্যবোধের প্রেরণা থেকে রাম কাজ করতে অগ্রসর হননি বলেই—শূদ্রকের নববিধানের বাণী শুনে বলেছেন—সত্যহোক, মিথ্যা হোক, কি একান্ত ভ্রম হোক, ভাঙ্গিয়াছ তুমি পালনীয় রাজার নিয়ম, দণ্ডযোগ্য তুমি।" রাজার নিয়মের বিরুদ্ধে রামের মনে প্রতিবাদ না জমলে এমন কথা কিছুতেই বের হতে পারে না। যেমন পারে না—"আমার হৃদয় নাই........ অনুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার—নীরস কর্তব্য সার স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।"

(৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য)। রামের এই চারিত্রিক পরিণতি দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম ব্যক্ত হয়েছে এবং পঞ্চম দৃশ্যে পরিস্ফুট আকারে দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে—নাট্যকার একদিকে ভরতের মাধ্যমে "রামের মহত্ত্ব, রামের করুণা, রামের যন্ত্রনা'র এবং রামের ভ্রান্তির উপর, অন্যদিকে মাণ্ডবীর মাধ্যমে সীতার 'অসীম গভীর প্রেমের সমুদ্র'-এর উপর এবং নারীজাতির লাঞ্ছনার উপর, পরোক্ষভাবে অলোকপাত করেছেন।

দৃশ্যটির গঠন গত উপযোগিতা এইটুকু যে, রামের দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার সঙ্কল্প এবং দাক্ষিণাত্যে পঞ্চবটী বনে উপস্থিতির মধ্যে যে কালক্রম প্রত্যাশিত তা' এর দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে। ভরত রামের ভ্রান্তি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণটুকু করেছেন—শূদ্রকবধের পূর্বে তা' অত্যাবশ্যক এ কথা যদি বলা না যায়, তা' হলে দৃশ্যটিকে অপরিহার্য বলেও মনে করা চলে না।

চতুর্থ দৃশ্যে—পঞ্চবটী বনের স্মৃতি সম্ভোগের সাহায্যে, পরোক্ষভাবে রামের বিচ্ছেদবেদনাতুর হৃদয়ের এবং রিক্ত জীবনের রূপটি দেখানো হয়েছে। দৃশ্যটিতে নাট্যকার কবিত্বোচ্ছ্বাসকে যত চরিত্রের মানসিক অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপে পরিণত করেছেন ততই তা নাটকীয় হয়েছে। এই দৃশ্যটি দর্শকের কাছে প্রত্যাশিত বটে কিন্তু নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে তার যোগ কত কি আছে বা নেই সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েই যেন নাট্যকার দৃশ্যটি যোজনা করেছেন। দৃশ্যটিকে পরবর্তী অনুভাবাদিতে প্রয়োগ করতে পারলে কোন কথাই উঠত না অর্থাৎ পঞ্চবটীর স্মৃতি রামের পরবর্তী মানসিক অবস্থায় সংলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করলে, দৃশ্যটি অত্যাবশ্যক বলেই বিবেচিত হত।

পঞ্চম দৃশ্যে—শূদ্রক-বধ ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এই দৃশ্যটিকে নাট্যকার একদিকে রামের হৃদয়হীন ও নির্বিচার নিয়মনিষ্ঠার নিদর্শন তথা চরিত্রের পরিণাম হিসাবে যেমন গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে শূদ্রকের তপস্যাকে কেন্দ্র করে, শূদ্রের অধিকার—সমানাধিকারতত্ত্ব—নব বিধানের বাণী প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন—সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন

উদারতার পটভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতার নিষ্ঠুর রূপটি আঁকবার চেষ্টা করেছেন।

শূদ্রকবধ ব্যাপারের সঙ্গে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যোগ এইখানেই যে এই আচরণেও রাম নিয়মকে (কর্তব্যকে) অনুভবের (প্রেমের) উপরে স্থান দিয়েছেন এবং শুষ্ক নিয়মের অনুরোধে মানবতাবিরোধী কাজ করেছেন। এতে রাম চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবনতি যেমন সূচিত হয়েছে, তেমনি সূচিত হয়েছে, নাটকীয় ঘটনার দিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রশ্ন জাগে—নীরস ও নির্দয় কর্তব্য ক'রে রাম আর কত অন্তরাত্মার অবমাননা করবেন? চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই পরিবর্তন আরম্ভ হ'য়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের কার্য—প্রেমের অবমাননায় রামের অন্তর্দাহ—সীতাকে ফিরে পাওয়ার জন্য রামের ব্যাকুলতা, দেখানো এবং রাম-সীতার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করা। প্রথম দৃশ্যে—অন্তঃপুরে এবং মধ্যরাত্রিতে রামের তীব্র মনস্তাপ প্রদর্শন করা হ'য়েছে—কর্তব্যের উপরে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। কৌশল্যার প্রবোধবচনের প্রতিবচনে রাম তাঁর অনুতাপ ও অন্তর্বেদনাকে সমুৎসারিত ক'রে দিয়েছেন—প্রশ্ন তুলেছেন—

ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর ?
শান্তি চেয়ে চিন্তা বড় ? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড় ?

শূদ্রক-নিধন কার্যের জন্যও গভীর অনুতাপ প্রকাশ করেছেন ; অপরাধীর শোচনা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন—"ধর্মের পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার ?" তাঁর কাছে ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় সব-কিছু সন্দেহের পদাঘাতে চূর্ণ। দৃশ্যটিতে প্রতি-ক্রিয়ার মাঝ দিয়ে প্রতিবিধানের সম্ভাবনা ব্যক্ত হ'য়েছে। তবে কৌশলাকে নিমিত্ত ক'রে রামের অন্তরের কথা ব্যক্ত করার চেষ্টা উচিত হ'য়েছে কি না—প্রশ্ন জাগতে পারে। তারপর রামের অত উত্তেজনার পরে হঠাৎ "নিদ্রাবস্থাপন্ন" হওয়া নাটুকে নিদ্রা ব'লে মনে হ'তে পারে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—রামের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের পর্যায়ে গিয়ে পৌচেছে।

রাম বশিষ্ঠের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের আদেশ স্পষ্টভাষায় অবহেলা করেছেন—জানিয়ে দিয়েছেন—"শত ঋষি বাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুণ্যস্মৃতি জানকীর।" সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিকে সহধর্মিণীর স্থানে বসিয়ে রামের অশ্বমেধযজ্ঞ করার সঙ্কল্প—বশিষ্ঠবিধি-লঙ্ঘনের প্রথম এবং সংজ্ঞান প্রচেষ্টা। কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়"—এই root-idea-র প্রতিষ্ঠার আয়োজন এখানে আরো একধাপ এগিয়েছে, সঙ্কল্পহীন রামের মধ্যে আবার সঙ্কল্প জেগেছে—ব্যক্তি-সত্তাকে উপেক্ষা করতে রাম যে প্রস্তুত ন'ন তার ইঙ্গিত দেওয়া হ'য়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে—বাসন্তীকে দিয়ে সীতার মনকে পতিসোহাগ-গর্বে পূর্ণ করা হ'য়েছে—তথা মিলনের বাধা অপসারণের চেষ্টা করা হ'য়েছে। কিন্তু সীতার জীবনের আর একটি গুরুতর সঙ্কটের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'য়েছে। কুশীলব কোথায় রাজপ্রাসাদে অতুল বিভবে থাকবে, রাজপরিচ্ছদে ভূষিত থাকবে, আর কোথায় তারা নির্জন কুটীরে দীন জীবন যাপন করছে—বল্কল পরিধান ক'রে রয়েছে। রাজপুত্রদের এই অবস্থা দেখে কোন্ মায়ের প্রাণ স্থির থাকতে পারে? এ দৃশ্য করুণ বটে, কিন্তু সীতার পক্ষে আরো করুণ—কুশলবের আত্মপরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল। কুশীলবের প্রশ্ন জননী-সীতার পক্ষে এক মহাসঙ্কট।

এখানে, নাট্যকার সীতাকে সেই সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটের সম্মুখীন ক'রেছেন। ঘটনাকে অর্থাৎ প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আয়োজনকে, আগেই একটু এগিয়ে নেওয়া হয়েছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্মিণী কে হবে সেই কথা শোনার জন্য এবং কুশীলব যাতে রাজস্বত্ব লাভ করতে পারে সেই দাবী জানাতে—বাল্মীকি বিনা নিমন্ত্রণেই অযোধ্যায় গিয়েছেন। অবশ্য কুশীলবকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। (কুশীলবকে সঙ্গে নিয়ে গেলে নাট্যকারের কাহিনী পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।) এই দৃশ্যের প্রথমে, নাট্যকার, সীতাকে পতিসোহাগ-গর্বে পূর্ণ করে এবং দৃশ্যের শেষদিকে অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদ দিয়ে, সর্বতোভাবে অভাগিনী ক'রে তুলে, চমৎকার কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। বাল্মীকির আচরণে আশানুরূপ

গাম্ভীর্য থাকলে এবং সীতার অনুভাবাদি আরো স্বাভাবিক হ'লে দৃশ্যটি নিখুঁত হ'তে পারত।

চতুর্থ দৃশ্যের কার্য—অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে নিমিত্ত ক'রে রামসৈন্যের সঙ্গে, বিশেষতঃ শত্রুঘ্নের সঙ্গে, লবকুশের যুদ্ধের সঙ্কল্প। পঞ্চম দৃশ্যের কার্য শত্রুঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ—শত্রুঘ্নের পতন। বলা বাহুল্য, মহাকবি বাল্মীকির লবকুশকে রামসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আত্মপরিচয় দিতে হয়নি। উত্তরচরিতে যুদ্ধের অবতারণা করা হয়েছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ হয়েছে বালকে বালকে এবং সীতার অজ্ঞাতসারে। এখানে যুদ্ধ হয়েছে—শত্রুঘ্নের সঙ্গে এবং প্রায় সীতার জ্ঞাতসারেই। সীতার জ্ঞাতসারে যুদ্ধ যদি অসম্ভব, হয়, তবে অজ্ঞাতসারে যুদ্ধ নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। বিরাট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লবকুশ যুদ্ধ করবে অথচ সীতা জানবেন না কার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, এ কথা কল্পনা করা যায় না। নাট্যকার তাঁর কাহিনী পরিকল্পনার খাতিরে এমনটি করছেন—এ কথা বললে নিশ্চয়ই পরিকল্পনার অবাস্তবিকতা বা দুর্বলতা ঢাকা পড়ে না।

ষষ্ঠ দৃশ্যে—প্রাসাদশিখরে, মধ্যরাত্রিতে, বিরহোন্মত্ত রামের 'জাগ্রত তন্দ্রায়' সীতার আবির্ভাব এবং সীতার কাছে রামের জানু পেতে ক্ষমা ভিক্ষা—তথা সীতাকে গ্রহণের জন্য রামের আন্তরিক ব্যাকুলতা—দেখানো হ'য়েছে। জাগ্রত-তন্দ্রায় সীতাদর্শন রামচরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়। এই মানসিক অবস্থা সীতার সঙ্গে মিলনের ব্যগ্র উৎকণ্ঠাই ব্যক্ত করেছে অর্থাৎ নাটকের লক্ষ্যের দিকেই চরিত্রকে এগিয়ে দিয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কের মুখ্য কার্য—বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধে, 'কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়'—এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা, রামের কাছে লব-কুশের পরিচয় দেওয়া—সীতাকে গ্রহণ করার জন্য রামকে বাল্মীকির আশ্রমে এনে রামসীতার মিলন ঘটানো এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধানের পরে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে রাম ও সীতার পূর্ণ সুখের পানপাত্রকে ওষ্ঠাগ্র থেকে ভূতলে নিক্ষেপ করা।

প্রথম দৃশ্য—দণ্ডকাশ্রম। এই দৃশ্যে নাট্যকার শত্রুঘ্নের পতনে সীতার

প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে, লবকুশের কাছে তাদের পিতৃপরিচয় ব্যক্ত করেছেন এবং লবকুশের মধ্যে ঘৃণার প্রতিক্রিয়া দিয়ে, সীতার বক্ষে দারুণ আঘাত হেনে দুঃখের শেষ অবধি দেখিয়েছেন। সীতার দুঃখের শেষমাত্রা পূর্ণ করবার জন্যই নাট্যকার সীতাকে রামসৈন্যের পরিচয় আগে জানতে দেননি। কিন্তু সে যে কতখানি একচক্ষু হরিণের কাজ, আগেই তা' বলেছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজসভা। নাটকের মূলভাবটি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। একদিকে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে—রামের কাছে লবকুশের পরিচয় তুলে ধরা হ'য়েছে, অন্যদিকে বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধে—কর্তব্যের উপরে প্রেমের আসন প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে—বশিষ্ঠকে বাল্মীকির কাছে—কর্তব্যকে প্রেমের কাছে—পরাজিত করা হ'য়েছে অর্থাৎ সীতা-গ্রহণের প্রধান বাধা, বশিষ্ঠের বাধা অপসারিত করা হ'য়েছে। এই দৃশ্যে নাট্যকার বশিষ্ঠ-বাল্মীকির মধ্যে—যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন, তা'তে বশিষ্ঠ অপেক্ষা বাল্মীকির দিকেই তিনি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। বশিষ্ঠের প্রধান যুক্তি বাল্মীকি এড়িয়ে গেছেন। বাস্তবিকই—"যে কারণে সীতা নির্বাসিত সেই হেতু বিদ্যমান অদ্যাপি মহর্ষি"—এই যুক্তির সন্তোষজনক উত্তর বাল্মীকি দিতে পারেননি। আমরা জানি সীতানির্বাসনের মূল কারণ বশিষ্ঠ ন'ন, মূল কারণ—লোকাপবাদ। সীতা নির্বাসনের দাবী বশিষ্ঠের কাছ থেকে প্রথম আসেনি—এসেছিল, অবশ্য পরোক্ষভাবে, অযোধ্যার প্রজার কাছ থেকেই। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নাটকে করা হয়নি। বাল্মীকি সীতার পক্ষ হ'য়ে যে 'শুদ্ধ সুবিচারে'র দাবী তুলেছেন সেই দাবী পূরণ করতে গেলে অবশ্যই সীতার সতীত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা দরকার। সে বিচারে রামের বিশ্বাস বা বাল্মীকির বিশ্বাস বড় প্রমাণ হ'তে পারে না। এমন কি বিভীষণাদি রাক্ষসদের সাক্ষ্যেও কোন কাজ হবে না। 'শুদ্ধ সুবিচারের' জন্য যে নিঃসংশয় প্রমাণ আবশ্যক তা' একমাত্র সীতাই দিতে পারেন—যেমন তিনি লঙ্কায় দিয়ে এসেছেন—অগ্নি-পরীক্ষা দিয়ে। যাই হো'ক এ সমস্যারও, সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি। তারপর—"প্রেম না কর্তব্য বড় ?"—এ প্রশ্নের

বিচারেও, যুক্তির চেয়ে, আবেগোচ্ছ্বাস বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। বশিষ্ঠের মুখে আরো যে যে যুক্তি দেওয়া উচিত ছিল, তা' দিলে বিতর্কটি আরো নাটকীয় এবং সম্পূর্ণ হ'ত।

তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার, সান্ত্বনার অতীত ব্যথায় এবং আরোগ্যের অতীত ব্যাধির আক্রমণে ম্রিয়মাণা সীতাকে উপস্থাপিত ক'রেছেন। সীতার রোগ—"যে রোগ পতির নিষ্করুণ কঠিন তাচ্ছিল্য, শতগুণ কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা"। এ রোগের উপশম—একমাত্র মৃত্যু ; সীতা মৃত্যুই কামনা করেন। মৃত্যুর আগে লবকুশকে বাসন্তীর হাতে সঁপে দিচ্ছেন—রামের হাতে লবকুশকে সমর্পণ ক'রে তাঁর অন্তিম নিবেদন রামকে জানাতে অনুরোধ করছেন। এই দৃশ্যের শেষাংশেই, প্রতীক্ষমানা সীতার ঐকান্তিক রামদর্শনকামনায় প্রতিফলিত ক'রে রামের আগমন সূচিত করা হ'য়েছে। বাল্মীকির জয়লাভের ফলে রাম-সীতার মিলনের সমস্ত বাধা অপসারিত হওয়ার পরে, মিলন অবধি নাটকীয় কৌতূহল উদ্দীপিত রাখতে হ'লে মিলনের পথে নতুন বাধার সৃষ্টি করা একান্তই প্রয়োজনীয়। নাট্যকার সীতার মৃত্যু-মুহূর্তকে উপস্থাপিত করে, এবং তার হৃদয়ে গভীর করুণ আবেগের সঞ্চার ক'রে, নাটকীয় কৌতূহল অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছেন।

চতুর্থ দৃশ্যে—দণ্ডকারণ্যের প্রান্তভাগে—অভিমানক্ষুব্ধ লবকুশের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎকার এবং অতি-অভিমানী লবের কাছে রামের ক্ষমা-প্রার্থনা, দেখানো হয়েছে। লবকুশের অভিমান-ক্ষোভের অভিব্যক্তিতে দৃশ্যটি পর্যাপ্ত আবেগময়।

পঞ্চম দৃশ্যে—সীতার সঙ্গে রামের মিলন এবং ভূমিকম্পের ফলে সীতার পাতাল-প্রবেশ প্রদর্শিত হ'য়েছে। মূল ভাব-বৃত্তটি এখানেই সম্পূর্ণ হ'য়েছে। রাম 'সীতার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন' ক'রে—তাঁর মহারাজ-সত্তা মুছে ফেলতে চেয়েছেন—সমস্ত সংসার-নিয়মের ঊর্ধ্বে সুন্দর প্রেমের রাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছেন—যেখানে ব্যক্তিসম্পর্ক শুধু ব্যক্তির হৃদয় আশ্রয় করেই বেঁচে

থাকে—সমাজ-নিয়মের ধার ধারে না, যেখানে রাম শুধুই রাম, রাজা ন'ন, সীতা শুধুই সীতা, রাজ-দুহিতা বা রাজবধূ ন'ন। সীতাও 'সর্ব দুঃখ সর্ব ব্যথা' ভুলে—ঘোষণা করেছেন—'আজি পূর্ণ সুখ, শোক, তাপ, ক্ষোভ, দুঃখ নাহি এতটুকু।' রাম সীতার সর্বদুঃখ অসীম সৌভাগ্যে লীন হয়ে গেছে। এখানেই বাল্মীকির কাজ এবং আসল নাটকও সমাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু বিধির নির্বন্ধ এবং নাট্যকারের ইচ্ছা অন্যরূপ। যার জন্য কেউই প্রস্তুত নয় এমন একটি আকস্মিক উৎপাত (ভূমিকম্প) ঘটিয়ে—বিধাতা বা বিধাতারূপী নাট্যকার রাম সীতার পূর্ণ সুখের মুহূর্তে চিরবিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দিয়েছেন। আগেই বলেছি—এই ঘটনা অতি-আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং অতি নাটকীয়। কারণ নাটকের মূল বৃত্তের সঙ্গে এর কোন কার্য-কারণ-যোগ নেই অর্থাৎ নাটকের কোন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে বা কোন কার্যের পরিণাম রূপে এ ঘটনা ঘটেনি।

কেউ হয়ত বলতে পারেন—ভূমিকম্প আকস্মিক ঘটনা হলেও অসম্ভব বা অসম্ভাব্য কোনকিছু নয় এবং এই নাটকে নিয়তিই ভূমিকম্পের রূপ ধরে এসে—রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে—এই কথা প্রমাণ করেছেন যে, ভাগ্যে সুখ না থাকলে, কারো সাধ্য নেই—সুখভোগ করবে ; নিয়তি কেন বাধ্যতে ?

রামের উক্তি— "আমার দুঃখের এই পূর্ণমাত্রা তবে।
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে
পূর্ণ সুধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে
পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে
সহসা ছুড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে"—

—এই পক্ষের যুক্তি হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথা কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না যে এই নাটকের—Root idea বা Premise—হচ্ছে "নিয়তি কেন বাধ্যতে"। যদি বলা যায়—রামের জীবনে কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত ট্র্যাজেডি দেখানোই নাটকের উদ্দেশ্য—তা হ'লেও,

এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী নয়। সীতার ভূতল-প্রবেশের আগেই সে দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ সমাধান ঘটে গেছে। সুতরাং ভূতল প্রবেশ দ্বন্দ্বের অনিবার্য কোন পরিণাম নয়। রাম-সীতার এই বিচ্ছেদ বা ট্র্যাজিক-পরিণতি দৈবকৃত। কোন ব্যক্তি বা সামাজিক বিধান এর নিমিত্ত কারণ নয়। এক্ষেত্রে দৈবের হস্তক্ষেপ ছাড়া ট্র্যাজেডি-পরিণাম ঘটানোর কোনও উপায় নেই। যেখানে দু'পক্ষেরই মনের আকাশ সম্পূর্ণ নির্মল, সেখানে বিনামেঘে ছাড়া বজ্রপাত ঘটানোর আর কি উপায়? এই কারণেই, নাটকখানি কমেডি হ'তে হ'তে হঠাৎ এবং শেষ মুহূর্তে ট্র্যাজেডির দিকে মোড় ফিরেছে। তবে এইটুকুই রক্ষা যে ভূমিকম্প আকস্মিক এবং আয়ত্ত বহির্ভূত হলেও প্রাকৃতিক ঘটনা; সুতরাং ভূমিকম্পকে আমরা একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে; তাই এক্ষেত্রে যে পরিমাণে ভূমিকম্পকে সম্ভব ব'লে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করি, সেই পরিমাণেই রাম-সীতার ট্র্যাজেডিকেও স্বীকার করতে বাধ্য হই।

যাই হোক, এই কথা বলতেই হবে যে নাটকখানি নির্দিষ্ট Premiseকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। প্রধানতঃ—কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়"—এই Premise-কে লক্ষ্য ক'রে নাটক গড়ে উঠলেও শেষ দৃশ্যের শেষাংশে—ভিন্ন লক্ষ্যের অভিমুখে নাটকীয় কার্য এগিয়ে গেছে। এই দু'টো লক্ষ্যকে বৃহত্তর বৃত্তের অধীন করার চেষ্টা করলে, বলতে হবে—কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে রামের জীবনে এবং সীতার জীবনে যে শোচনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়েছিল এবং দ্বন্দ্বের সুখাবহ সমাধানের মুহূর্তে, প্রাকৃতিক বিপত্তির ফলে—নিয়তি নির্বন্ধে—যে চির বিচ্ছেদের শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল সেই দুঃখ দুর্দ্দশা ও শোচনীয় পরিণতি উপস্থাপনা করাই—এই নাটকের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে—নাটকের মূল উদ্দেশ্য কি এই ছিল? উত্তরে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে—নাটকের নামকরণে এবং ভূমিকায় এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়নি। নামকরণ থেকে এবং ভূমিকা থেকে এই প্রমাণই সংগ্রহ করা যায় যে—নাটকের উদ্দেশ্য সীতার চরিত্রমাহাত্ম্য এবং

নিপীড়িত শোচনীয় জীবনের কারুণ্য উপস্থাপনা করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে সীতাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়ে যে ভাবে বৃত্ত-রচনা ঘটনাবিন্যাস করা উচিত ছিল, সেভাবে এখানে বৃত্ত-রচনা করা হয়নি। সীতার কেন্দ্রীয়ত্বের অধিকার রাম অনেকখানি কেড়ে নিয়েছেন। অবশ্যই, এই গঠন-গত ত্রুটিকে মৌলিক ত্রুটি ব'লেই গণ্য করতে হবে।

এই ত্রুটির ফলেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে—'সীতা' নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না। অবশ্য, যা'র কেন্দ্রীয়ত্ব বাঞ্ছনীয়, সে যদি কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে থাকে, তবে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে, নামকরণের সার্থকতা বিচার করার আগে কয়েকটা কথা ভেবে দেখা দরকার। প্রথম কথা এই সীতার কেন্দ্রীয়ত্ব ব্যাহত হ'লেও নাট্যকার সীতার চরিত্র মাহাত্ম্য এবং কারুণ্য উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন; দ্বিতীয় কথা এই—এই নাটকে নাট্যকার নারীর অধিকার এবং প্রেমের দাবী, নিয়ে যে সংগ্রাম করেছেন, সীতাই সেই সংগ্রামের নিমিত্ত কারণ; অর্থাৎ সীতাকে আশ্রয় করেই নাটকের মূল সমস্যা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে—সীতা সর্বতোভাবে কেন্দ্রচ্যুত হননি—ঘটনা-বিন্যাসের দোষে যে পরিমাণে চোখের বাইরে গেছেন, সে পরিমাণে মনের বাইরে সরে যাননি।

অঙ্গীরস ও আলম্বন বিভাব

সীতা-নাটকে, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসম্পন্ন সামাজিক মানুষের সমস্যা-সঙ্কটের, দুঃখদুর্ভোগের এবং শোচনীয় পরিণামের দৃশ্য উপস্থাপিত হ'য়েছে—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে নাটকখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক। তখনই প্রশ্ন হবে—ট্র্যাজিডি-রসাত্মক হ'লে, কার ট্র্যাজেডি? কাকে আলম্বন ক'রে রস নিষ্পন্ন হয়েছে? নাটকের ভূমিকা থেকে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাতেই নাট্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে—একথা সত্য বলে মনে করলে, এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় সীতার করুণ জীবন—এক কথায়, সীতার ট্র্যাজেডি। এই হিসাবে সীতাই এই নাটকের অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাব—সীতাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু নাটকের গঠন-বিশ্লেষণ পরিচ্ছেদে দেখাতে চেষ্টা করেছি—'Root idea'-নির্ধারণে বা Premise গঠনে গণ্ডগোল করায়, রামের ট্র্যাজেডির দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি অধিকমাত্রায় নিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ সীতার স্থলে রামই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদালাভ করেছেন। প্রশ্ন উঠবে—তবে কি রামের এই প্রাধান্য অঙ্গী-রস-নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়নি? মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটারই তো কথা। কিন্তু বিশেষ কারণে ব্যাঘাত মারাত্মক হয়ে উঠেনি। রামের ও সীতার সম্পর্ক যদি এমন হত যে একের ট্র্যাজেডি হলে অন্যের ট্র্যাজেডি হ'তেই পারে না, তাহ'লে premise-এর গণ্ডগোলের গুরুত্ব সহজেই ধরা যেত—শিব গড়তে বাঁদর গড়া যাকে বলে তাই হত। কিন্তু রাম-সীতার সম্পর্কটি এমন যে সীতার ট্র্যাজেডির মধ্যেই রামের ট্র্যাজেডি এবং রামের ট্র্যাজেডির মধ্যেই সীতার ট্র্যাজেডি নিহিত। রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডির মধ্যে বলা চলে অন্বয়-ব্যতিরেক সম্পর্ক। রামের ট্র্যাজেডিতে সীতার ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডিতে রামের ট্র্যাজেডি। শুধু এই কারণেই এক্ষেত্রে Premise বিভ্রাট

তেমন মারাত্মক ক্ষতি করতে পারেনি। রামের প্রাধান্য ঘটলেও এবং রামকে কেন্দ্র করে নাটকের বৃত্ত গড়ে উঠলেও, সীতার জীবনের নিরুপায় দুঃখদুর্গতি এবং শোচনীয় পরিণামের 'দৃশ্য দর্শক-পাঠকের মনে যথেষ্টই রেখাপাত করে। রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। একই শক্তির চাপে উভয়ের জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে। যে লোকাপবাদের কারণে সীতার নির্বাসন বা ট্র্যাজেডির আরম্ভ, সেই কারণেই অর্থাৎ সীতা নির্বাসনের কারণেই রামের জীবনে ট্র্যাজেডি। রাম-সীতার ট্র্যাজেডি যেন একই কারণের ভিন্নাশ্রয়ী কার্যরূপ। বশিষ্ঠ শুধু সীতার ট্র্যাজেডির জন্যই দায়ী নয় রামের ট্র্যাজেডির জন্যও সমান দায়ী। একই প্রতিকূল পরিস্থিতি উভয়ের জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছে—জীবনকে দুঃখ দুর্গতিতে পূর্ণ করে তুলেছে। আপাতদৃষ্টিতে রামকে সীতার বিপরীত পক্ষের লোক বলে মনে হলেও, রাম ও সীতা একই পক্ষের লোক। এতখানি ঐক্য আছে বলেই লক্ষ্য এদিক ওদিক সরে গেলেও রচনা একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারেনি।

সীতার ও রামের ট্র্যাজেডি ততপ্রোতভাবে যুক্ত বলেই, নাটকে যে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হয়েছে, রাম এবং সীতা উভয়কেই তার আলম্বন-বিভাব বলা যায়। রামের এবং সীতার ট্র্যাজেডি, যুগপৎ আমাদের মনে জাগে ব'লে অর্থাৎ দু'টি জীবনের দুঃখদুর্ভোগ ও শোচনীয় পরিণাম হাত ধরাধরি করে এসে আমাদের মনের কাছে আবেদন জানায় বলে, নাটকখানিকে আমরা "যুগল-নায়ক" (Twin hero) নাটক বলতে পারি। অবশ্য, অধ্যাপক নিকল, তাঁর 'থিওরি অফ ড্রামা' গ্রন্থের—'ট্র্যাজেডির নায়ক' পরিচ্ছেদে—"Twin hero" আলোচনার প্রসঙ্গে, ইয়াগো এবং ওথেলোকে যে অর্থে 'Twin hero' বলতে চেয়েছেন ঠিক সে অর্থে আমি রাম সীতাকে 'যুগল নায়ক' বলছিনে। অধ্যাপক নিকল 'নায়ক' নির্ধারণে, ঘটনানিয়ন্ত্রণকারী বিপক্ষ শক্তিকে অস্বীকার করতে চাননি বলেই নায়কত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমি অঙ্গীরসের

মুখ্য আলম্বন বিভাবকেই 'নায়ক' নির্ধারণে প্রধান বিচার্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং সেই হিসাবেই রাম-সীতাকে 'যুগল নায়ক'এর মর্যাদা দিতে চেয়েছি। নিকলের মত স্বীকার করলে অর্থাৎ প্রতিনায়ককেও 'নায়ক' বললে, শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নাটককেই 'twin hero' শ্রেণীতে ফেলতে হবে। তবে, যেখানে প্রতিনায়ক এবং নায়ক উভয়েরই জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটে—এবং নাট্যকার উভয়েরই ট্র্যাজেডি রূপ দিতে ইচ্ছুক হন, সেখানে নায়ককে এবং প্রতিনায়ককে 'যুগল নায়ক' বললেও বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে প্রতিনায়কের জীবন প্রধান রসের আলম্বন নয়, সেখানে নিশ্চয়ই সে কথা বলা চলে না। আগেই বলেছি—সীতা নাটকের পক্ষ বিচার করতে গেলে যদিও আপাততঃ তিনটি পক্ষ—[(বশিষ্ঠ+রাম)+(সীতা)] দেখা যায়, বস্তুতঃ পক্ষ এখানে দু'টি। এক পক্ষে সমাজবিধানের প্রতিনিধি বশিষ্ঠ, অন্যপক্ষে রাম সীতা। প্রথম পক্ষের হৃদয়হীন নিয়ম নিষ্ঠার অত্যাচারে, দ্বিতীয় পক্ষ নিরুপায় অবস্থায় দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করেছে। সুতরাং রাম-সীতার যুগল-নায়কত্ব সমর্থনের পক্ষে বেশ জোরালো যুক্তি রয়েছে।

এবার রামের এবং সীতার ট্র্যাজেডির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, রামের এবং সীতার জীবনে দুঃখ দুর্দ্দশা ও শোচনীয় পরিণাম ঘটলেও, দুজনের ট্র্যাজেডির রূপ সর্বাংশে এক নয় এবং এক হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ—Egri-র ভাষায় বলা যাক, প্রত্যেক চরিত্রের "Bone structure" ভিন্ন হতে বাধ্য। কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করে বললে, বুঝতে সুবিধা হবে। Egri বলতে চেয়েছেন বস্তুর যেমন (গভীরতা উচ্চতা প্রস্থ) তিনটি মান (dimension) আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের আরো তিনটি 'মান' রয়েছে—(ক) শারীরতত্ত্ব (খ) সমাজতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব। ব্যক্তিকে এই তিন তত্ত্বভূমিতে দাঁড় করিয়ে না দেখলে, কিছুতেই তাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। এই তিন মানের বিশেষ পরিচয় দিতে গিয়ে, শ্রদ্ধেয় এগ্রি প্রত্যেক মানের বিশেষ বিশেষ 'জিজ্ঞাসা' বিষয়ে একটি তালিকা দিয়েছেন—

শারীরতত্ত্বের জিজ্ঞাসা—(ক) স্ত্রী অথবা পুরুষ,
(খ) বয়স
(গ) উচ্চতা ও ওজন
(ঘ) চুলের, চোখের ও চামড়াব রং
(ঙ) অঙ্গভঙ্গিমা (Posture)
(চ) আকৃতি বা রূপ
(ছ) বিকৃতি
(জ) বংশগত বৈশিষ্ট্য

সমাজতত্ত্বের জিজ্ঞাসা—(ক) শ্রেণী—(শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শাসক প্রভৃতির কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত)
(খ) বৃত্তি
(গ) শিক্ষা
(ঘ) পারিবারিক জীবন
(ঙ) ধর্ম
(চ) জাতি
(ছ) সামাজিক মর্যাদা
(জ) রাজনৈতিক মতবাদ
(ঝ) আমোদ-প্রমোদ, বিলাস ব্যসন

মনস্তত্ত্বের জিজ্ঞাসা—(ক) যৌন জীবন, নৈতিক মান
(খ) ব্যক্তিগত ইচ্ছা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা
(গ) আশাভঙ্গ, বড় আঘাত
(ঘ) মেজাজ
(ঙ) জীবন সম্বন্ধে মনোভঙ্গী
(চ) কোন গ্রন্থি বা বাতিক
(ছ) বহির্মুখী, অন্তর্মুখী বা উভয়মুখী

(জ) দক্ষতা (শিল্পে সাহিত্য)
(ঝ) মস্তিষ্কের গুণ (কল্পনা, বিচার, বিশ্লেষণ)
(ঞ) বুদ্ধি-মাত্রা (I. Q.)

আসল কথা, প্রত্যেক চরিত্রের "bone structure" পৃথক এবং পৃথক ব'লেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারা সাড়া দিতে বাধ্য। এই কারণে, পরিস্থিতি এক হলেও দু'টি ব্যক্তি কখনই পুরোপুরি একভাবে আচরণ বা বুঝাপড়া করে না। রাম-সীতার সম্পর্কেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

রামের ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে রামের সামাজিক মর্যাদা অর্থাৎ রাম যে সমাজের লোক সেই সমাজের শ্রেণী বিন্যাসে রামের স্থান, তাঁর বংশাভিমান এবং তাঁর নৈতিক মান, রামের ট্র্যাজেডির জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। প্রথমতঃ রাম ক্ষত্রিয় এবং রাজা, এক কথায় সমাজের রক্ষাকর্তা বা অধিনায়ক। সাধারণ লোকের চেয়ে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশী। সাধারণ লোক যেখানে শুধু নিজ পরিবারের, রাজা রাম সেখানে সকল প্রজার দায়িত্ব বহন করেন। সুতরাং সকল প্রজার আস্থা তাঁর চাইই চাই। রাজার চরিত্রে প্রজার আস্থা যেখানে শিথিল, সেখানে রাজার শাসন করার অধিকারই পরোক্ষভাবে অস্বীকৃত হয়। এই কারণেই, রাজাকে রাজা থাকতে হলে, সর্বস্বপণে প্রজানুরঞ্জন করতে হবে এবং সাধারণ লোক যে পরিমাণে ব্যক্তি স্বার্থের গণ্ডী আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারে, রাজা তা' পারেন না অর্থাৎ রাজার 'সামাজিক—সত্তা' অধিকতর প্রবল ও প্রধান না হয়ে পারে না।

তার সঙ্গে যদি বংশাভিমান এসে যুক্ত হয়, তা' হলে তো সোনায় সোহাগা। সত্যরক্ষার জন্য—'বহুজন হিতায়' আত্মত্যাগ করা যে বংশের চিরাচরিত ধর্ম, সেই বংশের সন্তানের পক্ষে দশের দাবী উপেক্ষা ক'রে সুখী হওয়া স্বাভাবিক নয়।

এ সব সত্ত্বেও সুখী হ'তে পারে সেই লোক—যার কোন নীতির বালাই নেই, স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি হৃদয় বৃত্তির মূল্য যাঁর কাছে সামান্যই—ভোগ-সম্ভোগের

বস্তু সম্বন্ধে কোন বাদ বিচার বা রুচি কিছুই নেই—কোন উপায়ে তৃষ্ণা মেটানোই যার কাছে বড় কথা। কিন্তু যাঁর নৈতিক মান অত্যন্ত উচ্চ, যে আদর্শবাদী —যে হৃদয়ের বা মস্তিকের কোনও ব্যভিচার সহ্য করতে পারে না, স্নেহ-প্রেম সত্য প্রভৃতির মূল্য ক্ষুণ্ণ হ'লে যে ব্যথা পায়, তার পক্ষে জীবনের সামঞ্জস্য হারিয়ে সুখী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সব ব্যক্তির জীবনে যখন ব্যক্তি স্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন তা' এক মহাসঙ্কটে পরিণত হয়। সে না পারে 'সামাজিক সত্তা'কে অস্বীকার করতে, না পারে ব্যক্তি সত্তার দাবী উপেক্ষা করতে।

রামের জীবনেও—দুই সত্তার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়ে মহাসঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। রামের সামাজিক-সত্তা চরিতার্থ—প্রজাপালনে রাজ্যরক্ষণে এবং কুল গৌরব বৃদ্ধিতে আর ব্যক্তি-সত্তা চরিতার্থ—দাম্পত্য-প্রেমে স্নেহ ভক্তি মমতায়। রাজ্যাভিষেকের পরেও সত্তা দু'টি নির্বিরোধে নিজ নিজ বাসনা পরিপূরণ করে চলেছিল। কিন্তু একটি অতীত ঘটনা এসে, অদৃষ্টের মতো, রাম-সীতার জীবনকে মহাসঙ্কটের মুখে ঠেলে দিল। অপহৃতা এবং আবদ্ধা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিল। অবশ্যই এ সন্দেহকে একেবারে অহেতুক বলা চলে না। সাধারণের লোকের আর কি দোষ, লঙ্কায় স্বয়ং রামও সীতাকে প্রথমে সন্দেহের চোখেই দেখেছিলেন—বলেছিলেন—"তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছে.........সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি।" রামের মনেই যদি এতখানি সন্দেহ দেখা দিতে পারে তবে অযোধ্যার প্রজাদের দোষ কোথায়? যাই হোক, সীতার চরিত্র সম্বন্ধে এই লোকাপবাদ রাজারামের সামনে এক মহাসমস্যা রূপে উপস্থিত হ'ল। একদিকে, প্রয়োজন হলে প্রজানুরঞ্জনের জন্য—মাতা-ভ্রাতা পত্নী ত্যাগের সঙ্কল্প, অন্যদিকে অগ্নিপরীক্ষিত অপাপা এবং প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী সীতা। একদিকে কর্তব্যের আহ্বান—সামাজিক সত্তার দাবী, অন্যদিকে প্রেমের আহ্বান ব্যক্তি সত্তার দাবী। রামের জীবনে চরম সঙ্কট—মহা অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত।

সীতাত্যাগ রামের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার—আত্মহত্যারই নামান্তর; অন্যদিকে লোকাপবাদ অগ্রাহ্য করা, প্রজানুরঞ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করা—রাজ-সত্তা ত্যাগ করার সামিল। রাম অগত্যা কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হলেন। বশিষ্ঠ রাজ-কর্তব্যের জন্য ব্যাক্তিস্বার্থ বলি দেওয়ার মন্ত্রণা দিলেন। সীতাত্যাগ অন্যায় বুঝেও, অগত্যা, রাম সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। বশিষ্ঠের নির্দেশ অমান্য করার মতো সাহস তাঁর ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শুধু বাইরের শক্তির চাপেই, রাম কর্তব্যের নামে বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করতে অগ্রসর হলেন। ভ্রাতা ভগিণীর ব্যাকুল অনুনয়েও তিনি টললেন না। কিন্তু মাতা কৌশল্যা কিছুতেই রামকে অন্যায় করতে—আত্মহত্যা করতে দেবেন না; মা হয়ে নতজানু হয়ে রামের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। রাম অগত্যা সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গের অনিবার্য অনুতাপে রাজা-রাম দগ্ধ হতে লাগলেন—সত্যভঙ্গের আত্মগ্লানিতে রাম নতজানু হয়ে ব্যাকুলভাবে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পতিপ্রাণা সীতার পক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য। সীতার প্রেম তো ছোট প্রেম নয়—'বিলাসের সম্ভাষণ' মাত্র নয়। বহু ক্লেশের বহু ত্যাগের নিকষপাষাণে এ প্রেম পরীক্ষিত। রাম যেমন সীতাকে অপাপা এবং প্রেমময়ী ব'লে জানেন, সীতাও তেমনি রামকে প্রেমময় ব'লেই জানেন। সীতা কিছুতেই রামকে ছোট হ'তে দিতে পারেন না। নিজেই পতিসত্য রক্ষ্যার জন্য অযোধ্যা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প জানালেন। তা'তে রাম নির্বাসনদায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'লেন বটে, কিন্তু নির্বাসনের মহা-সঙ্কট এড়াতে পারলেন না। রাম সীতাময় এবং সীতা রামময়; তবুও তাদের জীবনের মাঝে বিয়োগের দুর্ভেদ্য যবনিকা নেমে এল। দু'টি নিরপরাধ আত্মা অন্তর্দাহের তুষানলে নিক্ষিপ্ত হ'ল।

রামের অন্তর্দাহ—একদিকে প্রেমময়ী পত্নীর বিচ্ছেদে, অন্যদিকে বিনাদোষে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পাপ সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার অবিচারে এবং অন্যায়কে অন্যায় ব'লে বুঝেও, তার প্রতিবিধান ক'রতে না পারার বেদনায়। রামের ট্র্যাজেডি—

রাম যন্ত্রচালিতের মতো বশিষ্ঠের আদেশ পালন করছেন এবং করছেন এমন এমন কাজ যার সঙ্গে তাঁর কর্তব্যবোধের বা হৃদয়ের কোন যোগ নেই। শুধু যোগ নেই তাই নয়, যে কাজ করছেন তাঁকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা না করে পারছেন না। হৃদয়বৃত্তির, এককথায় মানবতার, এই নিরুপায় অবদমনের অবস্থা অবশ্যই শোচনীয়। অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণার যাতনা অপেক্ষা, এই ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করে,—হৃদয়ের সমস্ত স্পর্শকাতরতা ত্যাগ ক'রে—অসাড়ভাবে কর্তব্যপালনের নামে অকর্তব্য করা তথা তিলে তিলে অপমৃত্যু বরণ— কম শোচনীয় নয়। শূদ্রকবধ এই অসাড় কর্তব্যপালনজনিত অপমৃত্যুর চমৎকার নিদর্শন।

কিন্তু আত্মহনন ক'রে কোন্ আত্মা শান্তি পাবে? উগ্র কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে রাম যতই হৃদয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করুন, উপবাসী হৃদয়ের হাহাকার বন্ধ করবেন—এমন শক্তি তিনি কোথায় পাবেন? হৃদয়ের জ্বালায় তাঁর 'উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, দীন শুষ্ক আঁখি, রুক্ষ কেশপাশ, পরিপাণ্ডু মুখ,—শীর্ণ দেহ'। মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন ছাড়া এ জ্বালা নির্বাপিত হবে না—তাই দেহপাত হ'লেই রাম যেন বাঁচেন। রাম আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছেন—অনন্ত প্রেমের কি অবিচার করেছেন—প্রেমের কি অপমান করেছেন, সতীর প্রতি কি নৃশংসতা করেছেন। মনস্তাপের তাঁর শেষ নেই। চোখে ঘুম নেই। তন্দ্রা আসলেই সীতার মূর্তি এসে দাঁড়ায়—"স্থির শুষ্কহাস্যময়ী নীরবভর্ৎসনাসমা পাষাণপ্রতিমা"......প্রাণ হুতাশে হু হু করে উঠে···"মর্মে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে বৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণায়।" রামের মনে আজ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জেগেছে—'ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর? শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়?" কি কর্তব্য কি অকর্তব্য, কি ন্যায় কি অন্যায়, কি সত্য কি মিথ্যা, কি ধর্ম কি অধর্ম—সন্দেহের আবর্তে সব তলিয়ে গেছে। তবু রাম তাঁর রাজসত্তাটিকে আঁকড়ে ধরে জীবন্মৃতের মতো কোনভাবে দিনযাপন করে চলেছেন।

কিন্তু বশিষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞ করার আদেশ দিয়ে নতুন এক সঙ্কটের সৃষ্টি করলেন। রাম সম্মতি জানাতেই বশিষ্ঠ বললেন—"এ যজ্ঞে শাস্ত্রীয় প্রথা—

স-সহধর্মিণী চাই অনুষ্ঠান, নহিলে নিষ্ফল যাগ"। যজ্ঞ স্থগিত করলে দেবগণ রুষ্ট হবেন। রাজ্য হবে শস্যহীন—'প্রজাগণ মরিবে দুর্ভিক্ষে' ; কিন্তু যজ্ঞ করতে গেলেও সহধর্মিণী চাই। আর এক উভয় সঙ্কট।

বশিষ্ঠ রামের কাছে আত্মত্যাগের নতুন দাবী তুললেন—দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে বললেন—রামের কাছ থেকে সীতার স্মৃতিটুকুও নির্বাসিত করতে চাইলেন। রামের ধৈর্য শেষসীমায় এসে পৌচেছিল—স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—'পারিব না আর'। রাম এবার প্রকাশ্যে বশিষ্ঠের আদেশ অবহেলা করতে প্রস্তুত। বশিষ্ঠের মুখের 'পরেই বললেন—

———আর পারিবে না রাম।
ভস্ম কর, রুদ্ধ কর স্বর্গদ্বার—তাই যদি পরিণাম
তাই যদি শাস্তি তাহার—তথাপি জেনো ঋষিবর স্থির
শত ঋষিবাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুণ্যস্মৃতি জানকীর।'

শেষপর্যন্ত "হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি'কে সহধর্মিণীর আসনে বসিয়ে যজ্ঞ করাই স্থিরীকৃত হল।

কিন্তু রামের মধ্যে বশিষ্ঠের আদেশ অবহেলা করার শক্তি আসলেও, নির্বাসিতা সীতাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা রামের মধ্যে দেখা যায়নি। প্রচলিত সংকীর্ণ সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, নিষ্ঠুর বিধির প্রতিকূলতা করবার, সীতার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হ'য়েছে, তার প্রতিবিধান করবার তথা সামাজিক-সত্তা এবং ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবার, উদ্যম তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। তা'ই রামের অন্তর্দাহেরও নিবৃত্তি হয়নি। 'সুখে নিদ্রা যায় পৌরজন, শুধু তার রাজার নয়নে নাহি সুপ্তি।" জাগ্রত তন্দ্রায় সীতার পাষাণ-প্রতিমা নীরব ভৎর্সনাসম বারঃবার উপস্থিত হয়েছে। রামের বক্ষে "অসীমা অসুপ্তি, অশান্তি, চিন্তা, অনন্ত তমসা ভীম হাহাকারপূর্ণ।" রাম 'তন্দ্রায় আবির্ভূত' সীতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তার বেশী কিছু করতে যাওয়ার যা অর্থ অর্থাৎ সীতাকে ফিরিয়ে এনে পূর্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

করার চেষ্টা করা অথবা প্রয়োজন হ'লে রাজত্ব ত্যাগ ক'রে সীতাকে নিয়ে আবার বনে যাওয়া—তা' করতে রাম প্রস্তুত ন'ন। সুতরাং অন্তর্দাহে দগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কি গত্যন্তর আছে? অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে বাল্মীকি যখন কুশীলবের পরিচয় দিয়ে, তাদের ন্যায্য পাওনা রাজ্যস্বত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সীতাকেও সমর্পণ করার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন, তখনও রাম অভিমান এবং আত্মপীড়ন করতে বিরত হলেন না—বললেন—

—"না মহর্ষি! বিশ্ব ভিতরে
সবারই কলত্রপুত্রে আছে স্বত্ব, আছে অধিকার
কেবল রাজার নেই।

দাম্পত্যজীবন যে প্রেমের ও কর্তব্যের সূত্রে আবদ্ধ বাল্মীকি রামকে সে সম্বন্ধে সচেতন করতে চেষ্টা করলেন,—রামকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

মেষ সম পত্নী নহে পতির সম্পত্তিমাত্র, যবে
বাসনা, রাখিবে, যবে বাসনা করিবে পরিহার
যেরূপ সুবিধা, রুচি, ইচ্ছা, কিংবা প্রবৃত্তি তোমার।

সীতা রামের পত্নী না হ'য়ে যদি সামান্য একজন প্রজা হ'তেন তা' হলেও রাজার কাছ থেকে তিনি শুদ্ধ সুবিচার দাবী করতে পারতেন। শুদ্ধ সুবিচার দান করতে রাজা বাধ্য। রাম বাল্মীকির যুক্তি অস্বীকার করলেন না, কিন্তু যুক্তি-অনুসারে কাজ করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। শেষপর্যন্ত বাল্মীকির যুক্তির কাছে বশিষ্ঠ পরাজয় স্বীকার করলে—'কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়' এই সিদ্ধান্ত বশিষ্ঠ স্বীকার ক'রে সীতাগ্রহণে অনুমতি দান করলে—রামের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটল—সীতাগ্রহণের বাধা অপসারিত হল।

বাল্মীকির আশ্রমে রাম-সীতার মধ্যে প্রত্যাশিত মিলন ঘটল। রাম-সীতার সমস্ত অতীত দুঃখকষ্ট অসীম সৌভাগ্যে বিলীন হয়ে গেল।

কিন্তু দেখতে না দেখতে এই সৌভাগ্য অন্তর্হিত হল। রাম-সীতার মিলনে দৈব ই যেন প্রতিকুল। আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতে—ভূমিকম্পে, সীতা

ভূগর্ভের মধ্যে পতিত এবং চিরতরে অন্তর্হিত হলেন। সুখের পূর্ণ সুধাপাত্র রামের অধরাগ্র স্পর্শ করতে না করতেই নিয়তি ছিনিয়ে নিয়ে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন—রামের দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হল—দুঃখের আগুনে পূর্ণাহুতি পড়ল।

এবার রামের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে—এই নাটকে নাট্যকার রামচরিত্রকে আলম্বন ক'রে—সামাজিক মানুষের চরম **উভয় সঙ্কট** এবং দ্বন্দ্বের রূপ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দু'টো সত্তা দেখা যায়—একটা তার সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ 'অহং' এর যে অংশ, সমাজের বিধি-নিষেধ আচার-বিচার মেনে চলাকে কর্তব্য ব'লে স্বীকার করেছে—সমাজের আর দশজনের সঙ্গে যে সব সামাজিক সম্পর্কে ব্যক্তি সম্পর্কিত আছে সেই সম্পর্কগুলিকে জীবনের সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেছে,—অন্যটি ব্যক্তি-সত্তা, অর্থাৎ জীব হিসাবে ব্যক্তির যে মৌলিক বাসনা কামনা আছে, বিশেষ বিষয় আশ্রয় করে সেই সব বসনা চরিতার্থ করার সহজ প্রবৃত্তি। এই দুই সত্তার সামঞ্জস্যেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য। যেখানেই ব্যক্তি দু'এর একটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সেখানেই প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। এই সামঞ্জস্য নানাভাবে নষ্ট হতে পারে। ব্যক্তি-বাসনার সঙ্গে সমাজ বাসনার সংঘর্ষ মোটামুটি দুই অবস্থায় ঘটতে পারে- এক, প্রচলিত সমাজ-বিধানকে ব্যক্তি যখন মনে প্রাণে সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না, সংকীর্ণদৃষ্টি সমাজের হস্তক্ষেপকে অন্যায় ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না, দুই—সমাজ-বিধানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যক্তি যখন সমতালে চলতে পারে না—সমাজের প্রগতিমূলক আচার বিচারকে অত্যাচার বা ব্যভিচার ব'লে মনে করে। এই বিরোধ তখনই সংকটে পরিণত হয়—যখন ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে—নিজের ইচ্ছার অনুকূল করতে, অক্ষম হয়, এবং সমাজের চাপে ব্যক্তিগত বাসনা-কামনাকে তার প্রেয় বস্তুকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রামের জীবনের যে ট্র্যাজেডি—(সীতার সঙ্গে মিলন ঘটা পর্যন্ত

যে ট্র্যাজেডি)—তা'কে আমরা, আপাতদৃষ্টিতে, লসনের ভাষায়, "The agonized struggle of a weak will"—জনিত ট্র্যাজেডি বলতে পারি। সীতাকে লোকাপবাদ থেকে মুক্ত ক'রতে তথা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশকে ব্যক্তি-স্বার্থরক্ষার অনুকূল করতে রাম উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করেন নি। সমাজ-প্রতিভূ বশিষ্ঠের কাছে ইচ্ছা শক্তি (will) সমর্পণ করার পর থেকেই, রাম শুধু অন্তর্দাহেই দগ্ধ হয়েছেন। প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম বলতে যা' বুঝায় তেমন কোন সংগ্রাম তিনি করেননি। সমাজ-বিধানের বা বশিষ্ঠবিধির বিরুদ্ধে অভিমান প্রকাশ—আর মনস্তাপে দগ্ধ হওয়া—এ ছাড়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি।

এখানেই প্রশ্ন উঠবে—তবে কি রামের ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার যোগ্যতা হয়নি? কেউ হয়ত বলতে পারেন—যদিও সমালোচক লসন বলেছেন—"The agonized struggle of a weak will, seeking to adjust itself to an inhospitable environment, may contain elements of poignant drama" তবু তাঁর এ সিদ্ধান্তও স্মরণীয়—"But however weak the will may be it must be sufficiently strong to sustain the conflict. Drama can not deal with people whose wills are atrophied, who are unable to make decisions which have even temporary meaning, who adopt no conscious attitude toward events, who make no effort to control their environment. The precise degree of strength of will required is the strength needed to bring the action to an issue, to create a change of equilibrium between the individual and the environment.

রামের এই "precise degree of strength" আছে কি? রাম সীতা-নির্বাসনের অন্যতম নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাক্রমে যেমন সীতা নির্বাসন ব্যাপারটি ঘটেনি, তেমনি তাঁর ইচ্ছায় সীতাগ্রহণও সম্ভব হয়নি। এক হিরণ্ময়ী

প্রতিকৃতির ব্যাপারে ছাড়া রাম আর কোথাও তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। অবস্থার দীন দাস হয়ে রাম আচরণ করে গেছেন। রাম চরিত্রে ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা কোথায় ? বরং এই কথাই বলা চলে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে রামচরিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তাতে "Inefficient operation of the will"--এর চিত্রই বেশী ফুটেছে। এ কথা স্বীকার করে নিয়ে, বলা যেতে পারে,—নাটক যেহেতু দৃশ্যাকারে জীবনের রসরূপ—রসরূপ ব্যক্ত হ'লে, ক্রিয়াশীল অথবা নিষ্ক্রিয় চরিত্রের সূত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব করা ছেলেমানুষি। "efficient operation of the will"—যেমন জীবনের রূপ, inefficient operation of the will—ও তেমনি জীবনেরই রূপ। রূপ যাহোক, তাকে রসোত্তীর্ণ করে তোলাই বড় কথা। "A play lives by its logic and reality" Gassner-এর এই কথাটি চরিত্র সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। পরিস্থিতি যদি বাস্তব হয়, পাত্র পাত্রীর কায়িক মানসিক বাচানিক আচরণ যদি সমুচিত এবং রসনীয় হয়, তা'হলে—নায়কের সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক করে করে লাভ কি ? রামের সঙ্কট ও দুঃখ দুর্ভোগের রূপ যদি রসনীয় হয়ে থাকে, তা' হ'লে সঙ্গে সঙ্গে রামও ট্র্যাজিক চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে, জন এস্ স্মার্ট মহাশয় 'ট্র্যাজেডি'-প্রবন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা' গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ; তিনি বলেছেন 'ট্র্যাজেডি'—বহু [illegible]মের। তবে তাদের সামান্য ধর্ম—'element of calamity and suffering"। অবশ্য যে দুঃখকে দুঃখ ব'লেই মনে করে না—নির্বিকার চিত্তে স্বীকার ক'রে নেয়, তেমন দুর্বলস্বভাব ব্যক্তির ট্র্যাজেডি হয় না।······Tragedy involves reaction agaimst calamity. The character who has been caught in the fatal snare struggles to escape, seeks to break through the net which is gathering about him, or if efforts unavailing, there is at least a reaction in the mind itself." রাম নিয়তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন—জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করেননি—একথা যত সত্য; মানসিক প্রতিক্রিয়া (reaction in the mind) যথেষ্টমাত্রায় দেখিয়েছেন, এ কথাও তত সত্য। তারপর বহু বৎসরের মর্মান্তিক বিচ্ছেদের পরে পূর্ণ মিলনের মুহূর্তে আবার চিরতরে বিচ্ছেদ—অবশ্যই শোচনীয় ব্যাপার। যাঁর জীবনেই এমন ঘটনা ঘটুক, জীবনটিকে 'ট্র্যাজিক' না বলে উপায় নেই। এখানেই আরো একটি কথা বলার আছে এবং তা' বলা হ'য়েছে—রসনিষ্পত্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার প্রসঙ্গে। কতখানি নিষ্ক্রিয় ও নিরীহ হ'লে নায়ক 'ট্র্যাজিক' হ'তে পারবেনা—এর মীমাংসা না করা পর্যন্ত, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না।

সীতা

রামের ট্র্যাজেডিকে, সংক্ষেপে এবং প্রধানতঃ, আমরা যদি ব্যক্তির সমাজ-সত্তার ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্কট এবং দ্বন্দ্বের ট্র্যাজেডি—সংকীর্ণ ও হৃদয়হীন সমাজ-বিধানের প্রবল চাপের তলে আত্মসমর্পিত ও অবনত, বিক্ষুব্ধ এবং অন্তর্দাহদগ্ধ প্রাণের ট্র্যাজেডি বলতে পারি, সীতার ট্র্যাজেডিকে আমরা বলতে পারি—মহৎ ভাবের (sentiment) বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে, নিরপরাধ জীবনের, স্বেচ্ছায় ভোগ-সুখে বঞ্চিত হওয়ার এবং চরম দুঃখ দুর্দ্দশা বরণ করার ট্র্যাজেডি। সীতার ট্রাজেডিকে আমরা সংক্ষেপে সেণ্টিমেণ্ট-জনিত ট্র্যাজেডি—মহত্ত্বের লাঞ্ছনার ট্র্যাজেডি—বলতে পারি। সীতার জীবনে—তাঁর সতীত্বে সন্দেহ অর্থাৎ লোকাপবাদ, চরম আঘাত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু লোকাপবাদ সীতার জীবনে সঙ্কটের আকার ধারণ করেছে তখনই যখন তাঁর প্রাণসম রাম কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে সত্যভঙ্গ করে মনস্তাপ ভোগ করেছেন। সীতারই জন্য রাম মনস্তাপ ভোগ করবেন—প্রেমময়ী সীতা সহ্য করবেন কি করে ? সীতার প্রেম আত্মত্যাগ বিমুখ 'ছোট প্রেম' নয় ;—তাঁর প্রেম সেই বড় প্রেম যা শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠে: দেয়। যে ভালবাসা আত্মত্যাগের দীক্ষা পায়নি—তা' কাম্ বা আসঙ্গলিপ্সার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি ;—প্রেমের পর্যায়ে পৌছয়নি। সীতার ভালবাসা—'প্রেম'—রামের জন্য আত্মত্যাগে তা' প্রস্তুত।

রাম যেমন সীতার জন্য শেষ পর্যন্ত সত্যভঙ্গ করতে এগিয়ে গেছেন, সীতাও তেমনি রামের জন্য বনবাসে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন।

"পতিসত্য" রক্ষা করার জন্য সীতার আত্মত্যাগ করার এই সঙ্কল্পই, সীতার ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব দুঃখ দুর্ভোগ দেখা দিয়েছিল তাদের মূল নিমিত্ত-কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সীতার বনবাস-জীবনের যে দুঃখ দুর্ভোগ সব চেয়ে

শোচনীয় হয়েছে তা হচ্ছে—প্রথমতঃ বনবাস জীবনের সঙ্গে—তাপসী জীবনের সঙ্গে—খাপখাওয়ানোর ব্যর্থ এবং করুণ সংগ্রাম ; দ্বিতীয়তঃ—সন্তানের কাছে পিতৃপরিচয় এবং আত্মপরিচয় না দিতে পারার মর্মান্তিক যাতনা—সন্তানের মর্মচ্ছেদী সন্দেহের কশাঘাতে মায়ের মর্মজ্বালা। আদর্শ নিষ্ঠার তথা সঙ্কল্পের প্রেরণায় সীতা বনে এসেছেন বটে, কিন্তু সঙ্কল্প করে অতীত স্মৃতিকে তিনি মুছে ফেলবেন কেমন করে ?—হৃদয়ের সহজ আবেগকে নিরুদ্ধ করবেন কেমন করে ? সীতা তো মর্ত্যের মানুষ। এখানে যে সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী বসে শূন্যগৃহে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ! 'অতীত সুখ' এবং 'রাঘবের মুখ' ছাড়া আর কিছুই সীতার মনে জাগে না।

—রাখিয়াছি চাপি এই ক্ষুদ্র
বক্ষে মোর ক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র ;
শৃঙ্খলিত করিয়াছি মোর সব সাধ
শুষ্ক তপস্যায় তবু ভেঙ্গে যায় বাঁধ
অসতর্ক মুহূর্তে কখন, জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সে প্রেম, রুদ্ধ অশ্রুবারি ছোটে,

সীতা উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে নিজমুখে এ কথা না বললেও আমরা বুঝে নিতে পারি। বাসন্তীর সব সান্ত্বনা-বাণী ব্যর্থ করে সীতা বাঁধভাঙ্গা আর্তনাদ করেন :—

কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,
প্রিয়তম ! কোথা তুমি ?— পারিনে যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।

যত গভীর যত আন্তরিক উভয়ের প্রেম, তত তীব্র তত অন্তর্দাহী বিচ্ছেদের যন্ত্রনা। রামের প্রেমে যত একনিষ্ঠতা, সীতার প্রাণের কান্না তত উদ্বেলিত। সীতার মত পতি সোহাগ সৌভাগ্য কার আছে ?

সীতার পতি-সোহাগ-সৌভাগ্য বাস্তবিকই যে কোন নারীর ঈর্ষার বস্তু।

"যেই পতি স্নেহ থাকে নিরবধি, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহে, তুচ্ছ করি বিয়োগ নিরাশা দুঃখ শত—অচল অটল স্থির পর্ব্বতের মত সেই পতিস্নেহ"—সীতার। সীতা এই দিক দিয়ে বড় ভাগ্যবতী। কিন্তু, সীতা কুশী-লবের জননীও বটেন। কুশী-লবের বর্তমান অবস্থা দেখে মায়ের প্রাণ স্থির থাকবে কেমন করে? তাদের ;এই দীন অবস্থার জন্য দায়ী কে?—"অতুল বিভব সম্পদে রহিবে কোথা প্রাসাদে, ভূষিত রাজ-পরিচ্ছদে; কোথা তারা পরিহিত বল্কলে, কুটীরে, দীন নির্জ্জনে এখানে।"—সীতার এই আক্ষেপ অনিবার্য। এই আক্ষেপের চেয়েও মর্মান্তিক—মায়ের কাছে সন্তানের আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসার আঘাত এবং পরিচয় জানার পরে—"পুত্রের অশ্রুহীনা হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা"। এই ঘৃণার আঘাতের চেয়ে—"আর কি হইতে পারে পরে?

আঘাতের উপর আঘাত আসে। যে পতিসোহাগ-সৌভাগ্যে সীতা বড় ভাগ্যবতী ছিলেন, সেই সৌভাগ্যের সম্বলটুকুও অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদ এসে কেড়ে নিয়ে যায়। আজ সর্বতোভাবে সীতা রিক্ত, সত্যই—"কোন্ রাজকন্যা রাজার গৃহিনী বীরমাতা হেন অভাগিনী। "পরিত্যক্ত প্রতাড়িত যেন পথের কুক্কুর। তবু হেন কার পিতা, কার পতি, কার পুত্র?"

একদিকে 'পতির নিষ্করুণ কঠিন তাচ্ছিল্য,' অন্যদিকে শতগুণ কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা—এ মহাব্যাধির উপশম কোথায়? পতিসোহাগ-সৌভাগ্য ফিরে না এলে, এবং রাম কুশীলবকে পুত্র ব'লে গ্রহণ না করলে, এ ব্যাধির কোন প্রতিষেধ নেই।

শেষ পর্যন্ত প্রতিষেধ সম্ভব হ'ল। ব্যাধির উপশম হল—মিলনের সব বাধাই অপসারিত হ'ল। কিন্তু বিধাতা তখনও বাম। যার উপর মানুষের কোন হাত নেই এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ভূমিকম্পের কবলে পড়ে, সীতা ভূগর্ভে প্রাণ হারালেন—দুঃখিনীর জীবনে সুখের আলো জ্বলেই চিরতরে নিভে গেল।

সীতার এই পরিণতিতে এবং নাটকের এই উপসংহারে, বিশেষ এক তাৎপর্য—জীবনসংগ্রামের পটভূমির দিকে একটা উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

জীবনের পটভূমি—প্রকৃতি ও সমাজ। প্রকৃতি এবং সমাজ—এই দুই শক্তি-ক্ষেত্রের বুকে মানুষের জীবন-যাপনের লীলা বা সংগ্রাম চলেছে। জীবনের উপর যেমন সমাজের নানা বিধি-নিষেধের বা সংস্কারের প্রভাব কাজ করছে; তেমনি সেখানে প্রাকৃতিক ঘটনারও বেশ খানিকটা প্রভাব রয়েছে। আমাদের জীবন শুধু সমাজেরই নিষেধে নিয়ন্ত্রিত নয়, প্রাকৃতিক ঘটনারও অধীন। সীতার ট্র্যাজেডিতে, নাট্যকার সমাজের এবং নিয়তিরূপা প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থ এবং নিরুপায় সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

তবে নাট্যকারের এই চেষ্টা কতখানি তাঁর সংজ্ঞান পরিকল্পনার ফল, এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ জাগতে পারে, তেমনি, এই চেষ্টা কতখানি সফল হ'য়েছে, সে-বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। মানুষের জীবনদ্বন্দ্বকে, প্রাকৃতিক শক্তির অনির্দ্দেশ্য রহস্যময়তার পটভূমিতে এবং সামাজিক বাধা-নিষেধের বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের পটভূমিতে রূপ দিতে হ'লে যে পরিমাণে বিশ্বপ্রকৃতি-সচেতন এবং সমাজ-সচেতন ক'রে চরিত্রসৃষ্টি করা দরকার, এখানে তার বিলক্ষণ অভাব র'য়েছে। নিয়তির উল্লেখ দু'একবার করা হ'য়েছে একথা ঠিক বটে, কিন্তু এ কথাও ঠিক, তা'তে বিশ্বরহস্যের পটভূমি স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেনি। তা' উঠেনি ব'লেই, সীতা-নাটক পড়ার সময় অদৃষ্টরহস্য-ঘেরা জীবনের ব্যর্থ সংগ্রামের রূপ স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয় না। ভূমিকম্পের আকস্মিক উৎপাত, শেষ-মুহূর্তে, সামাজিক অস্তিত্বের বাইরে—সমাজ-সত্তারও পিছনে—যে বিশ্বপ্রকৃতি র'য়েছে সেই প্রাকৃতিক সত্তার প্রভাবের দিকে মনটাকে উৎক্ষিপ্ত করে বটে, কিন্তু উৎক্ষেপ ঐ ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক এবং অল্পক্ষণস্থায়ী।

তারপর—উপস্থাপনা-গত উৎকর্ষ-অপকর্ষের কথা। ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র, রস, সংলাপ প্রভৃতি উপাদানকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করবার প্রথা যা'ই থাক, এ কথা মানতেই হবে—কোন উপাদানকেই, নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা

করা যায় না। পরিস্থিতি কল্পনা থেকে চরিত্রকে অথবা চরিত্র থেকে সংলাপকে এবং রসকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সাধারণ সূত্র করলে এমনি একটা সূত্র করা চলে—পরিস্থিতি-কল্পনা যত বাস্তবানুগ হয়, চরিত্রের ভিত্তি অর্থাৎ সামাজিক সংস্থিতি তত দৃঢ় হয় এবং চরিত্রের কায়িক-মানসিক-বাচনিক আচরণ যত বাস্তবকল্প হয়, তত তার আবেদন অবিসংবাদী হয়—রস তত গাঢ় হয়, এককথায় সামগ্রিকভাবে সৃষ্টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গেই শ্রদ্ধেয় গ্যাসনার মহাশয়ের—"A play lives by its logic and reality"—উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তাঁর মন্তব্যে সায় দিয়ে বলা যেতে পারে—ঔচিত্য এবং বাস্তবতার মধ্যেই নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত থাকে এবং এই দুই মৌলিক গুণের সদ্ভাবেই নাটক বড় নাটকে পরিণত হয়। পরিস্থিতির বাস্তবিকতার এবং চরিত্রের আচরণের ঔচিত্যের মাত্রার উপরেই নাটকের গুরুত্বের মাত্রা নির্ভর করে। কারণ ঔচিত্য পরিপোষণ করে বাস্তব-চেতনাকে, বাস্তব-চেতনা নিয়ন্ত্রিত করে লঘু-গুরুবোধ বা মনোভঙ্গীকে এবং মনোভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করে রসের প্রকৃতিকে ও তীব্রতাকে।

এই কারণেই, ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজেডি-জাতীয় গুরু-গম্ভীর রচনার জন্য সার্বভৌমিক ঔচিত্য এবং বাস্তবতা এত বেশী অত্যাবশ্যক।

সীতা-নাটকে এই সার্বভৌমিক ঔচিত্যের তথা বাস্তবতার [illegible] আছে। পরিস্থিতি-কল্পনা এবং চরিত্রের আচরণ—আঙ্গিক, বাচনিক ও সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি, সবক্ষেত্রে আমাদের বাস্তবতা-বোধ ও ঔচিত্যেবোধকে তৃপ্ত করে না। প্রথম দুই অধ্যায়ে আমি ঔচিত্যহানির স্থলগুলি যথাসম্ভব নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি; কৌতূহলী পাঠক অবশ্যই সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর জিজ্ঞাসাকে চরিতার্থ করবেন। এখানে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, সামাজিক ও নৈতিক আবেষ্টনীকে যে পরিমাণে পরিস্ফুট রূপ দিলে পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন জাগে না, এবং পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণকে যে পরিমাণে সহজ ও স্বাভাবিক করলে, ঔচিত্য-বোধ ষোল আনা বজায়

থাকে, তা' এখানে সন্তোষজনক মাত্রায় পাওয়া যায় না। ফলে, নাটকের সামগ্রিক গুরুত্ব—শিল্পগত উৎকর্ষ—রসনিষ্পত্তির উৎকর্ষ বেশ হ্রাস পেয়েছে।

রসনিষ্পত্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিচারের কথা উঠলে কেউ হয়ত বলবেন—রাম-সীতাকে অবলম্বন ক'রে ট্র্যাজেডি-রস যে প্রত্যাশিত মাত্রায় সুনিষ্পন্ন হয়নি, তার কারণ ঔচিত্য ও বাস্তবতার দৈন্য নয়, তার কারণ রাম-সীতার নিরীহ স্বভাব—ইচ্ছাশক্তির বা সঙ্কল্পের অদৃঢ়তা, এককথায়—নিরীহ নিষ্ক্রিয়তা। এই আপত্তির সম্যক উত্তর দিতে হ'লে—নিরীহ (innocent) ও নিষ্ক্রিয় (inactive) নায়কের ট্র্যাজেডি হ'তে পারে কি না, হ'তে পারলে কোন্ অবস্থায় হ'তে পারে—এই সব প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে নাট্যতত্ত্ব-শাস্ত্রে যে আলোচনা আছে তা' থেকে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হ'লেও, অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অবশ্যই উদ্ধার করা যায় এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে—বিশেষ অবস্থায় নিরীহ ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার কোন বাধা নেই। যেখানে ব্যক্তির ভিতরকার সংস্কার ও স্বভাব এবং বাইরের অর্থাৎ সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে শক্তিপরীক্ষা হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পায়—ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে গর্হিত কোন-কিছু করতে বিরত হ'য়ে, নিজের সঙ্গে নিজে বুঝাপড়া করতে করতে ক্ষয় পেতে থাকে—মর্মদাহে তিলে তিলে দগ্ধ হয়, সেখানেও জীবনের ট্র্যাজেডির রূপই ব্যক্ত হয়। আদর্শবাদের বা মানবতার মহিমা যতক্ষণ তাঁকে পরিত্যাগ না করে, বিলীয়মান জীবনের রশ্মি তার অস্তরাগ নিয়ে যতক্ষণ তা'কে বেষ্টন ক'রে থাকে, ততক্ষণ তাঁর ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। একথা ভুলে গেলে ভুলই হবে—নাটক লোকবৃত্তানুকরণম্; লোকবৃত্তে আমরা জীবনের মহাসঙ্কটের, দুঃখদুর্ভোগের ও বিপত্তির যে রূপ দেখি, সেখানে যেমন দেখি সক্রিয় ব্যক্তিকে তেমনি দেখি—

নিষ্ক্রিয়—এমন কি অতিনিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকেও। উদগ্রপ্রবৃত্তিসম্পন্ন দৃঢ়সঙ্কল্প ও

উত্তমী ব্যক্তির অতিচারী বাসনা, বাসনাপূরণের ব্যর্থ সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখে আমদের যেমন ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগে,—সঙ্কটের দ্বারা পরিবেষ্টিত সৎ, আদর্শবাদী সংগ্রামী পুরুষের আদর্শরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম, সংগ্রামের ব্যর্থ পরিণাম, জীবনের শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখে আমাদের মনে যেমন ট্র্যাজেডি-বোধ জাগে. তেমনি, অতিসৎ, আদর্শবাদী নিরীহ এবং নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকেও নিরুপায়ভাবে দুঃখদুর্ভোগ করতে দেখে—অপরাধহীনতার অপরাধে শাস্তিভোগ করতে দেখে; প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অগত্যা আত্মসমর্পণ করতে দেখে, ট্র্যাজেডি-বোধই জাগে। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, প্রতিকূল পরিবেশকে আক্রমণ করার মধ্যে—উত্তমশীল প্রতিরোধের সংগ্রামের মধ্যে ইচ্ছার যে শক্তিরূপ ব্যক্ত হয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রধ্যে—সঙ্কটের কাছে অগত্যা আত্মসমর্পণ করার মধ্যে শক্তির সেই রূপটি প্রকাশ পায় না; কিন্তু তা'ই ব'লে এ কথাও ঠিক নয় যে, নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতামাত্রেই শক্তিহীন এবং হেয়। চপলতায় বা বিক্ষোভে শক্তির যে ক্রিয়াচঞ্চল রূপ তা' হয়ত সেখানে থাকে না, কিন্তু স্থৈর্য-ধৈর্য-সহিষ্ণুতায় শক্তির যে স্থির-সংযত রূপ, তা' অবশ্যই থাকতে পারে। ভোগের উত্তম ও ঐশ্বর্য যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি ত্যাগের অকিঞ্চনতা ও দুঃখভোগ কম মহিমান্বিত, কম চিত্তাকর্ষক নয়।

তারপর—যে কথা আগেই বলেছি—ট্র্যাজেডি বিশেষ একজাতীয় রস—বিশেষ একটি ভাবের আস্বাদন। এই ভাবটি ব্যক্ত হওয়াই, অর্থাৎ বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ট্র্যাজেডি-সংবিদ্‌ জাগাই বড় কথা। পরিস্থিতি, নায়ক, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ "উপায়", "উপেয়" হ'চ্ছে রস। এই রস নিষ্পন্ন হ'য়েছে কি না এইটেই প্রধান বিবেচ্য। সঙ্কটের রূপ, সংঘর্ষ ও সংগ্রামের রূপ, পাত্র-পাত্রীর আচরণের রূপ, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভিন্ন হ'তে বাধ্য—কিন্তু সব ভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যটুকু পাওয়া যায়—তাকে অতি সংক্ষেপে বলা চলে—নিরুপায় ও ব্যর্থ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, নিরুপায় দুঃখভোগ ও শোচনীয় পরিণামের ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর আর্তি ও অস্তিত্ব-রহস্যকে ব্যক্ত করা।

এই জীবনতৃষ্ণার বা আর্তির তীব্রতা এবং শোচনীয় পরিণতির বেদনা-গভীরতা তথা জীবনের অস্তিত্ব-রহস্য যতখানি ব্যক্ত হয় ততখানিই ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব। এত কথা বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, উদ্দেশ্য—শুধু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—নায়কের দ্বন্দ্বপরায়ণতার মাত্রা নিয়ে পাঠক যাতে অযথা বাদ্-বিসংবাদ করতে না যান, সেই বিষয়ে একটু সতর্ক ক'রে দেওয়া। 'পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম'—কথটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে, পদে পদে ভুল করার সম্ভাবনা আছে—এ কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতির জটিলতা অনুসারেই, সংগ্রামের রূপ ও তীব্রতা বেশীকম হয় এবং এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হ'তে পারে যেখানে পাত্র-পাত্রীর সংগ্রাম প্রায় আরম্ভেই শেষ হয়ে যায়; আর তা' হয় পাত্র-পাত্রীর দুর্ব্বলতার বা সংগ্রাম-বিমুখতার জন্য নয়; হয়—পরিস্থিতির জটিলতার ও অনিবার্যতার জন্য—অপ্রস্তুত আবির্ভাবের জন্য এবং যার বিরুদ্ধে দৈহিক বল বা বুদ্ধিকৌশল—শৌর্যবীর্য কোন কাজে লাগে না এমন এক অশরীরী আক্রমণের জন্য। এরূপ পরিস্থিতি নিয়তির মতোই দুর্বার—নিয়তির মতোই অমোঘ। শ্রেষ্ঠ পুরুষ-কারকেও এরূপ পরিস্থিতিতে নিরুপায়ভাবে, যাকে বলে 'প'ড়ে মার খাওয়া' তাই খেতে হয়। হিমালয়ের বাধা, সাতসাগরের বাধা, অস্ত্রবল বা ধনবলের বাধা—শৌর্যবীর্য দিয়ে যে সব বাধা অতিক্রম করা যায়, পুরুষকার তা' অতিক্রম করতে পারে কিন্তু যে বাধা অদৃশ্য অথচ অমোঘ, যে বাধা সামান্য একটা বিশ্বাসের রূপ ধ'রে মনের বাসা বেঁধে থাকে, যে বাধা হৃদয়ের, সে বাধা দূর করবে—লঙ্ঘন করবে, কে এবং কোন্ পুরুষকার দিয়ে?

রামকে এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে—অশরীরীলোকাপ—বাদের'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, নিরুপায়ভাবে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হ'য়েছে। এই অশরীরী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, ব্রহ্মাস্ত্রের-অধিকারী হ'য়েও, রাম কোন অস্ত্রই প্রয়োগ করতে পারেননি। অদৃশ্য অথচ অনুপেক্ষণীয় যে শত্রু, তার হাতে নিরুপায় লাঞ্ছনা ভোগ করতেই হবে—

রামকেও তা' ভোগ করতে হ'য়েছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া রাম আর কিছুই ক'রতে পারেননি। অগত্যা পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেই তাকে তিলেতিলে অন্তর্দাহে দগ্ধ হ'তে হ'য়েছে। এই ধরণের নিরুপায় আত্মসমর্পণ এবং নিষ্ক্রিয় অসাড়তা নিশ্চয়ই কোন্ ব্যক্তির ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার যোগ্যতা নষ্ট করে না। নিষ্ক্রিয়তা যেখানে অনিবার্য এবং স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়—নিষ্ক্রিয়তা যেখানে চরিত্রের নৈতিক সত্তার মহিমার অভিব্যক্তি হ'য়ে প্রকাশ পায়, সেখানে নিষ্ক্রিয়তা নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী নয়। নিষ্ক্রিয়তা যেখানে মহত্ত্বের অপঘাত, মহত্ত্বের অপচয়, মহত্ত্বের লাঞ্ছনা—মানবমহত্ত্বের বিপত্তিও বিনষ্টি অভিব্যঞ্জিত করে, সেখানে তা' উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডিরই উপাদান হ'তে পারে ?

রামের মধ্যে, সীতার ট্র্যাজেডিতেও—নিরুপায় দুঃখদুর্দশা ভোগের মধ্যে, মহত্ত্বের চরম লাঞ্ছনার ট্র্যাজেডিই ব্যক্ত হ'য়েছে। এ কথা আগেই বলে এসেছি—'সীতা'-নাটকের সীতা বাল্মীকির সীতার মতো সম্পূর্ণ "innocent" নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে এবং বনবাসের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত তাঁর নিজেরই। অবশ্য একথা বলার তাৎপর্য এ নয় যে সীতা 'bad'। সীতার ট্র্যাজেডির মূলে তাঁর 'Self-willed passion' অর্থাৎ পতিপ্রেমের আতিশয্য রয়েছে, এ কথা ঠিক বটে কিন্তু এ কথাও ঠিক—পতিপ্রেমের ঐকান্তিকতাকে নিশ্চয়ই যথার্থ 'দোষ' বলা চলে না। গুণের আধিক্যকে যদি দোষ বলা চলে তবেই সীতা দোষী,—'flawless'-ন'ন। কিন্তু নৈতিক গুণপণার দিক দিয়ে সীতা শুধু তো "good"-শ্রেণীর চরিত্রই নয়, সীতা রীতিমত—"too good"-শ্রেণীর চরিত্র।

এতখানি চরিত্রমাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও, পরিস্থিতির চক্রে পড়ে' সীতা শোচনীয় দুঃখদুর্ভোগ ভোগ ক'রেছেন। পরিস্থিতিই যেন সীতার জীবনে **নিয়তি** হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সীতা কি দিয়ে সংগ্রাম করবেন ? অতীতজীবনকে—রাবণকর্তৃক অপহৃতা সীতাকে, লঙ্কায় অবরুদ্ধা

সীতাকে, 'মহিষী-সীতা' জীবন থেকে মুছে ফেলবেন কি ক'রে? দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া লোকাপবাদের কণ্ঠরোধ করবেন তিনি আর কোন্ উপায়ে? লোকাপবাদের সামনে ব্রহ্মাস্ত্রধারী; রাবণবিজয়ী রাম যেমন নিরুপায়, সীতাও তেমনি নিরুপায়। উভয়ের ভাগ্যেই ট্র্যাজেডি অনিবার্য। কারণ রাজা-রামকে স্বমহিমা থেকে ভ্রষ্ট না ক'রে লোকাপবাদ-লাঞ্ছিত সীতার পক্ষে অযোধ্যায় থাকা এবং রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়। স্বেচ্ছায় বনে না গেলেও, জীবনের শোচনীয় পরিণতি তিনি এড়াতে পারতেন না। রামকে ছেড়ে যাওয়ায়, এবং ছেড়ে থাকায় যেমন ট্র্যাজেডি—আবার রামকে আঁকড়ে থাকায়ও তেমনি ট্র্যাজেডি,—অবশ্য ভিন্ন ধরণের ট্র্যাজেডি। এই উভয় সঙ্কটরূপী পরিস্থিতির হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। যত অপরিহার্য, তত দুর্নিবার এই পরিস্থিতি। এই ধরণের সংগ্রাম-ব্যর্থ-ক'রে-দেওয়া পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে যখন কোন বহুগুণাধার মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় ভাবে মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ভোগ করে, দুঃখ-দুর্দ্দশার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে শোচনীয় পরিণতির তলে তলিয়ে যায়, তখন ব্যক্তির সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগে।

অতএব নিষ্ক্রিয়তার যুক্তি তুলে রাম-সীতার ট্র্যাজেডি-নায়কত্ব নাকচ করবার কোন যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্রসম্মত কারণ নেই। ট্র্যাজেডি রস খুব ভাল জমেনি—এ কথা ঠিক বটে, কিন্তু না জমার কারণ—রাম-সীতার নিষ্ক্রিয়তা নয়, না জমার কারণ পরিস্থিতির বাস্তবতার (reality) এবং চরিত্রের আচরণ ঔচিত্যের (logic) ত্রুটি। বলা বাহুল্য, রস খুব ভালভাবে না জমা এবং রসোত্তীর্ণ না হওয়া এক কথা নয়—যেমন, দেহে প্রাণসারের দৈন্য এবং প্রাণহীনতা এক কথা নয়।

———

বুদ্ধদেব চরিত

বুদ্ধজীবনের তাৎপর্য্য ও তথ্য

"অনেকজাতিসংসারং সংধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেষন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্‌ঝগা।"

(বুদ্ধের প্রথম বাণী)

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ চুরমার গৃহভিত্তিচয়
সংস্কার বিগত চিত্ত তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ)

তৃষ্ণা, সংস্কার, জন্ম, মৃত্যু, জন্মান্তর যদি জীবধর্ম হয়, তবে প্রত্যেক জীবের জীবনেই তা আছে এবং বিবেকী জীব মানুষের মধ্যেও আছে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে "জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-ভোগ প্রভৃতি থাকলেও, সে সম্বন্ধে কোনরূপ চেতনা বা জিজ্ঞাসা তাদের মধ্যে নেই। বলা যেতে পারে—পশুদের জীবনযাপন আছে কিন্তু জীবনদর্শন নেই। এখানেই মানুষ পশু থেকে পৃথক; মানুষ—'মানুষ'। পশুর জীবন যেখানে কেবলমাত্র জৈবিক, মানুষের জীবন সেখানে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক। ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের জটিল স্নায়ু-সংস্থার সম্ভাবেই তথা উন্নতচৈতন্য শক্তির সামর্থ্যেই

মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়েছে—তাঁর মধ্যে প্রাণন-ক্রিয়ার সঙ্গে মনন-ক্রিয়ার—প্রাণধর্মের সঙ্গে মনো-ধর্মের প্রেরণা যুক্ত হয়েছে। ফলে, একদিকে রয়েছে তার প্রাণের দায় অন্যদিকে রয়েছে মনের দায়। তাই অন্যান্য প্রাণীর মতো আত্ম-রক্ষার সহজ আবেগে সে শুধু অবোধপূর্বক অভিযোজন করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে একদিকে যেমন গোষ্ঠীবদ্ধ বা সামাজিক জীবন যাপন করেছে, অন্যদিকে তেমনি সে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝাপড়া করতে চেষ্টা করেছে। সে পরিবেশকে জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশকে আত্মরক্ষার উপযোগী করে গড়তে চেষ্টা করেছে। যদিও মনুষ্যেতর প্রাণীরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে এবং সম্পর্ক স্থাপন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে, বাসনা চরিতার্থ হলে আনন্দ এবং ব্যাহত হ'লে বেদনা পেয়েছে এবং আনন্দ-বেদনাদি অনুভব-সমূহ ইঙ্গিতে অথবা অস্ফুটশব্দ-সংকেতে ব্যক্তও করেছে, তবু সেই বুঝাপড়া বা সম্পর্কস্থাপন এবং অনুভবের অস্ফুট প্রকাশ অবোধপূর্ব আচরণের স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য বটে যে পশুদের ইন্দ্রিয়গুলি মানুষের ইন্দ্রিয়ের মতোই বস্তু-প্রতীতি গ্রহণ করে এবং তাদের স্মৃতিতে বস্তু-প্রত্যয়ও বেশী-কম থাকে এবং এই প্রতীতিগুলি তাদের জৈবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিতও করে থাকে; কিন্তু এ-কথাও তেমনি অবশ্য স্বীকার্য যে, এই সমস্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও—পশুদের বিষয়-নির্বাচনের ক্ষমতা থাকলেও, বিষয় নির্বচনের ক্ষমতা তাদের নেই, কারণ নির্বচনমাত্রেই বাক্-সাপেক্ষ এবং সেই বাগ্‌ভাষার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে! মানুষই সেই প্রাণী যে, মস্তিষ্কের জটিল এবং উন্নত স্নায়ুসংস্থার বলে, বিষয়কে শব্দ-সংকেতে চিহ্নিত করতে পেরেছে, সমন্বিত বাক্যের বন্ধনে আপন উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতি-দ্রব্য-ক্রিয়া-গুণ সব কিছুকেই যেমন মানুষ খণ্ড খণ্ড ভাবে সংকেতিত করেছে, তেমনি বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বস্তুর স্বরূপকেও সে বচনাধীন করবার চেষ্টা করেছে। এমনি

করে মানুষ কত কি কল্পনা করেছে, কত কি চিন্তা করেছে। মনের নতুন দায় পরিশোধ করতে, মানুষ বিশ্বামিত্রের মতো নতুন দুই জগৎ—কল্পলোক এবং তত্ত্বলোক গড়ে তুলেছে।

কিন্তু মানুষ নিজের-গড়া এই জগতের মধ্যে নিজেও বাঁধা পড়ে আছে। নানা সিদ্ধান্তের সূত্রজালে মানুষের জীবন অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সাধারণ জীব যেখানে একমাত্র প্রকৃতি-জগতেরই অধিবাসী—একমাত্র প্রকৃতির নিয়মের অধীন, মানুষ সেখানে একাধিক জগতের অধিবাসী, একাধিক নিয়মের অধীন। মানুষের বাসনা-কামনা একদিকে যেমন সামাজিক বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে তেমনি আবার নানা ধ্যান-ধারণা দ্বারা অনুপ্রেরিত। যে অভিযোজন-প্রচেষ্টার পরিণাম স্বরূপে মনন-শক্তির উন্মেষ ঘটেছে, সেই মননশক্তিজাত নানা অনুমান বা সিদ্ধান্তই আবার উলটে অভিযোজন প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করেছে। এই কারণেই অতি আদিম যুগ থেকেই, মানুষের জীবনযাত্রা নানা রকম ধারণা (Idea) দ্বারা অনুশাসিত হয়ে আসছে।

যাকে আমরা বলি 'পুরুষার্থ' তাকেই বলা চলে—সামাজিক আচার-বিচারের মূল্যমান। এই মূল্যমান অনুসারেই সামাজিক মানুষের আবেগ-অভিমানের গতিতারতম্য ঘটে—জীবনাবেগ বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন গতিবেগ নিয়ে প্রবাহিত হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—পশুকে চালনা করে তার জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি, আর মানুষকে চালনা করে তার পুরুষার্থ চিন্তা। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম তিনটির সেবা যে যে-কোন যুগেরই মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, তা নিশ্চয়ই বলে বুঝাতে হবে না। ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের সাধনা, প্রত্যেক সমাজেই থাকতে বাধ্য। কিন্তু চতুর্থ পুরুষার্থ-টির ধারণা মানুষের মধ্যে কি করে এল এবং এসে জীবনে সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হ'ল—অনেকের কাছেই তা' খুব স্পষ্ট নয়। কি করে দেবদেবীর কল্পনা এবং আত্মার স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস জন্মেছে, কি করে পরমাত্মার ধারণা এবং পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পর্কের

ধারণা গড়ে উঠেছে এবং স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, বন্ধ-মুক্তি প্রভৃতি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—কেন আদিম কাল থেকেই, অতিপ্রাকৃত দৈবশক্তিকে সন্তুষ্ট করে অভীষ্টলাভের লোভে, ঐকান্তিক আবেগে মানুষ ভজন-পূজন-আরাধনা করে আসছে—তা খুব কম লোকেই তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন। ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত মানতে গেলে, দেখা যাবে যে দেবতাকল্পনা, আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা ও জন্ম জন্মান্তর কল্পনা আদিম সামাজিক মানুষের অপরিণত বুদ্ধি বা মনের মিথ্যা অনুমানের ফল। Edward. B. Tylor—যিনি 'animism'কে—"groundwork of the philosophy of Religion'—বলেছেন, এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :—

"The theory of the Animism divides into two great dogmas forming parts of one consistent doctrine; first, concerning souls of individual creatures. capable of continued existence after the death or destruction of the body; second, concerning other spirits upward to the rank of powerful deities......Thus Animism in its full development includes the belief in souls and in a future state, in controlling deities and subordinate spirits, these doctrines practically resulting in some kind of active worship"—(Animism.)

বলা বাহুল্য, উন্নত চৈতন্য-শক্তির দায়েই মানুষকে জগতের ও জীবনের ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে হয়েছে—ঘটনার কারণ নিরূপণ করতে হয়েছে। বিশ্বজগৎ-রূপ কার্যের কর্তা কে? জীবন্ত ও মৃত দেহের পার্থক্য কেন হয়?—কিসের অভাবে দেহ মৃত হয় আর কিসের সদ্ভাবে দেহ জীবন্ত থাকে? স্বপ্নে যে-সব মূর্তি দেখা যায়, তারা কারা, কোথায় এবং কি ভাবে থাকে?—

এমনি ধরণের নানা প্রশ্ন মানুষের মনে জেগেছে, এবং অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিসামর্থ্য অনুসারে মানুষ উত্তর দিতেও চেষ্টা করেছে। এই সব প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর যোগাতে গিয়েই মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তি তথা দেবদেবীর কল্পনা করেছে এবং দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মার এবং ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেছে এবং দেব-দেবীদের ও ভূত-প্রেতের সন্তোষবিধানের জন্য নানা প্রক্রিয়াও উদ্ভাবন করেছে। যাঁরা এইসব জটিল ও দুঃসাধ্য প্রশ্নের উত্তর যুগিয়েছেন তাঁরাই সমাজে মুনি-ঋষির অর্থাৎ চিন্তানায়কের মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁদের অনুমানগুলিই সমাজের সকলের কাছে 'সত্য' বলে সমাদৃত হয়েছে এবং তাঁদের ধ্যান-ধারণা নিয়েই সমাজের সংস্কার গঠিত হয়েছে। এইসব ধারণা যত সত্যের মর্যাদা পেয়েছে, তত তা' সমাজের আচার-বিচার-অনুষ্ঠানাদি, এক কথায় শ্রেয়োবোধকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

শুধু যে গর্ভাধান থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া পর্যন্ত সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, অতিপ্রাকৃত দৈবশক্তিতে বিশ্বাস, দেহাতিরিক্ত-স্বতন্ত্র আত্মায় বিশ্বাস দ্বারা অনুশাসিত হয়েছে, তা' নয়, এই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণাতেই ব্যক্তি দৈবশক্তির সঙ্গে যোগস্থাপনা ক'রতে এবং তাঁর কৃপালাভ ক'রে ধন্য হ'তে ব্যাকুল হয়েছে; এমন কি সমাজ-সংসার—জীবনের সব প্রেয় ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে; সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ ক'রে, নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চেষ্টা করেছে। মানবজীবনে চিন্তাধারার প্রভাব যে কত বড় এতেই বেশ বুঝতে পারা যায়। অতি-প্রাকৃত দৈবশক্তিতে বিশ্বাস, দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মায় বিশ্বাস, আদিম-মনের মিথ্যা অনুমানের ফল হলেও, সমাজ-মনের উপর তার প্রভাব কিন্তু সর্বগ্রাসী। কেন ধর্মীয় আবেগ মানব-সমাজে এতখানি আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে, কেন জৈবিক আবেগের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী প্রবৃত্তি হ'য়ে জীবনে সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে আছে, অবশ্যই একটু ভেবে দেখা দরকার। আদিম যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত, ধর্মীয় আবেগের

প্রাধান্য অবিসংবাদিত বটে কিন্তু কেন এই অবিসংবাদিত এবং সর্বাগ্রগণ্য প্রাধান্য সে সম্বন্ধে অবশ্য বিসংবাদ রয়েছে। যাঁরা পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার এই ব্যাকুলতাকে আত্মার স্বধর্ম ব'লে মনে করবেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এঁরা নিশ্চয়ই বলবেন—বলে থাকেনও—আত্মরক্ষার সহজ সংস্কার জীবের অতিমৌলিক সংস্কারের মধ্যে শুধু অন্যতমই নয়, প্রধানতম এবং সেই কারণে সর্বাপেক্ষা বেশী আবেগগর্ভ। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে আত্মরক্ষার সংগ্রাম দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষা এবং উদরপূরণাদি ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ যেহেতু মননশীল, আত্মরক্ষার ধারণা ও ব্যাপার তার কাছে আরো ব্যাপক। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ বুঝেছে—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের পিছনে যে সর্বশক্তিমান শক্তি বা পুরুষ রয়েছেন তাঁর ইচ্ছাক্রমেই জগতের সব ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়; তাঁর ইচ্ছাতেই বিপদ, তাঁর ইচ্ছাতেই বিপন্মুক্তি। তাঁর কৃপাদৃষ্টি থাকলেই জীবন ধন্য। তাঁর প্রসাদেই আত্মার সদ্গতি, তাঁর প্রকোপেই মহতী বিনষ্টি। জীবলোকে এবং প্রেতলোকে তার সমান আধিপত্য। সুতরাং প্রকৃত আত্মরক্ষা শুধু দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষার মধ্যে, দেহকোষ-পোষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহলোক-পরলোকে আত্মার সদ্গতি যাতে হয়, তাতেই প্রকৃত আত্মরক্ষা। এই কারণেই অর্থাৎ আত্মরক্ষার আবেগের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বলেই, মানুষের জীবনে ধর্মীয় আবেগ ও সাধনা এত ব্যাপক, প্রধান এবং প্রবল। আসল কথা, দেবতা নিয়ে, পূজার্চনা নিয়ে, এককথায় ধর্ম (Religion) নিয়ে মানুষের সমাজে যে ঐকান্তিক আবেগ দেখা গিয়েছে এবং এখনও দেখা যায়, তার কারণ এই যে ধর্মকে—মানুষ আত্মরক্ষারই অন্যতম এবং প্রদান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এই গ্রহণ ব্যাপারের সঙ্গে অনেকখানি নির্জ্ঞান মনের আবেগ মিশে আছে।

সমস্ত ধর্মেরই প্রধান উপযোগিতা রয়েছে জীবনের দুঃখদুর্গতি নিবারণের, এক কথায় মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতায়। যে ধর্ম আত্যন্তিক দুঃখহানি ঘটাতে

পারে না। সহজপথে দৈবকৃপালাভে সাহায্য করতে পারে না, সে ধর্মের মাহাত্ম্যকে কে স্বীকার করবে? তাই তো প্রত্যেকে ধর্মেই স্বর্গলাভের মতো, মুক্তিলাভের মতো বড় বড় লাভের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। যে ধর্ম যত প্রতিশ্রুতি দিতে (এবং পূরণ করতে ?) পারে, সেই ধর্মের তত মাহাত্ম্য। ধর্ম মানুষের 'প্রকৃত আত্মরক্ষা'র উপায় ব'লেই ধর্মকেই মানুষ পরম আশ্রয়, পরম-পুরুষার্থ ব'লে গ্রহণ করেছে। এবং তা' করছে বলেই ধর্ম মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা আবেগবান ভাববন্ধে (sentiment) পরিণত হ'য়েছে।

তাই বলে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে যাকে নিয়ে এত আবেগ তা কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। কোন বিষয় বা ধারণা তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে বলেই তাকে 'সত্য' ব'লে স্বীকার করতে হবে— এমন কোন কথা নেই। আবেগের গভীরতায় বা ঐকান্তিকতায় কোন ধ্যান-ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় না; তা'তে যেটুকু প্রমাণিত হয় তা' হচ্ছে এই যে ঐ বিশেষ ধারণা বা ধ্যানকে আশ্রয় ক'রে সামাজিক ব্যক্তির মনে একটা আবেগ-প্রবল ভাববন্ধ গড়ে উঠেছে। এই হিসাবে যে ভক্তি ধৈর্য না মেনে মুহূর্তে নৃত্য-গীত-গানে বিহ্বল হয়, সেই উদ্দাম ভক্তি এবং যে ভক্তি শান্ত ও সুধাস্নিগ্ধ-ভরা—ধ্যান-সমাহিত চিত্তের ব্রহ্মবিহার—দুইই সমান। ভাবোচ্ছ্বাস বা সমাধি কোনটাই সত্যের প্রমাণ নয়। ভাবোচ্ছ্বাসে মনের আবেগ এবং সমাধিতে তন্ময়ীভবনের সামর্থ্য প্রকাশ পায়—এর বেশী কিছু নয়। যেমন সত্যকে নিয়ে আবেগোচ্ছ্বাস বা সমাধি ঘটতে পারে তেমনি মিথ্যাকে নিয়েও পারে। ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা করলে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাবে। দেখা যাবে—ধর্মদর্শনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবেগের বিষয় ও বেগও পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে। এককালে যা' নিয়ে তীব্র আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়েছে, তা'কে নিয়ে নতুন তেমন আর আবেগ জাগে না; এককালে যা'কে সত্য ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে, অন্যকালে তাকেই সকলের চেয়ে মিথ্যা ব'লে মনে হয়েছে। নতুন দর্শন, নতুন ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে

ব্যক্তির জ্ঞানে, অনুভবে এবং ইচ্ছায় আমূল পরিপবর্তন ঘটেছে। জীবনদর্শনের এই মৌলিক পরিবর্তন শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার পরিবর্তন এনেই ক্ষান্ত থাকেনি, সমাজনৈতিক এবং নৈতিক বিধি-বিধানকেও পরিবর্তিত করেছে।

ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন এই সত্যের কোন ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে যুগবিভাগ করা হয়েছে, তা'তে বৈদিক যুগের স্থান সবচেয়ে আগে। অবশ্য এ যুগের আগেও যে যুগ আছে—বেদের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিকযুগের সমাজ একেবারে আদিম সমাজ নয়– আদিম সমাজ থেকে বেশ খানিকটা-এগিয়ে-আসা সমাজ।

অতিপ্রাকৃত দেবশক্তিতে বিশ্বাস, এখানে একাধিক দেবদেবী কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং দেবদেবীদের তুষ্ট করবার আয়োজন যাগ-যজ্ঞের জটিল অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সমাজ এখানে শ্রেণী-বিভক্ত. সমাজের অনুকরণে দেবতা-সমাজেও, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ এবং গুণ-কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীভেদ কল্পিত হয়েছে। মানব সমাজে সকলের উপরে একজন—রাজা, দেবতা-সমাজেও সকলের উপরে একজন—অধিদেবতা। বহু দেবতাবাদের পরে একদেবতা-বাদ—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি······।" এই "একং সৎ"-এর ঘোষণার মধ্যে, বৈদিক ঋষির ব্রহ্ম ধ্যানের প্রথম সূচনা লক্ষ্য করা গেলেও, বৈদিক যুগে ধ্যানের চেয়ে কর্মের অর্থাৎ যজ্ঞের প্রাধান্যই বেশী। মননের চেয়ে মন্ত্রের উচ্চারণে ও যাদুশক্তিতে বিশ্বাস বেশী। ফলে, মন্ত্রের বিনিয়োগ স্বতন্ত্র বিদ্যার মর্যাদা লাভ করেছে—'ব্রাহ্মণ' সাহিত্য জন্মলাভ করেছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলে বেদ সম্পূর্ণ—"মন্ত্রব্রাহ্মণযোর্বেদনামধেয়ম্।" কিন্তু সকলেই যে মনন ত্যাগ করে শুধুমাত্র মন্ত্রের বিনিয়োগ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছেন তা নয়, যে মনন থেকে মন্ত্রের জন্ম—(মননাৎ মন্ত্র উচ্যতে)—কেউ কেউ সেই মননের দিকেই বেশী করে ঝুঁকেছেন। এই ঝোঁকের ফলেই অধিদেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে—পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং অমৃত মৃত, নিত্য-অনিত্য, মুক্তি-বন্ধ প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা মুনির মুখে নানা বাণী

উচ্চারিত হয়েছে। বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞের পাশে, নতুন যুগের—উপনিষদ-যুগের নতুন সাধনা,—ধ্যান-সাধনা—অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। ক্রমে কর্মযোগের চেয়ে জ্ঞানযোগের মর্যাদা বেশী হয়েছে। অবশ্য এই সময়ে জ্ঞানযোগের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে বলে যে কর্মযোগের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে—যাগযজ্ঞ সব বন্ধ হয়ে গেছে—তা নয়। জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য লাভ করায় ঋষিদের দেবতা-দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান, জীবের জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা, মুক্তির ধারণা আরো গভীর হয়েছে—আরো সূক্ষ্ম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়—পরমাত্মার স্বরূপ, জগতের সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ, জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু—পুনর্জন্মের কারণ, মুক্তির উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ধারণা জন্মেছে এবং তার ফলে সাধ্যবস্তু এবং সাধনার রীতিও পৃথক হয়ে গেছে। বৈদিকযুগে দেবতাদের তোষণ করাই ছিল লক্ষ্য এবং যাগ যজ্ঞ ছিল সেই তোষণ ব্যাপারের উপযুক্ত উপায়। উপনিষদ যুগে—সাধ্য হয়েছে ব্রহ্ম—পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ, তাই সাধনার রীতি হয়েছে—ধ্যান ও যোগ-সমাধি। "যজ্ঞ"থেকে "যোগ ;—সাধনরীতির এক নতুন স্তরে উত্থান। যজ্ঞ ছিল অনেকটা সামষ্টিক সাধনা—বহুজন নিষ্পাদ্য ব্যাপার ; আর ধ্যান ও যোগ হ'ল ব্যষ্টি-গত সাধনা—একের নিভৃত উপাসনা। যজ্ঞে যজমান বহু-জনের একজন হ'য়ে দেবতর্পণ করেছে ; ধ্যানে ও যোগে ব্যক্তি এককভাবে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে মুক্তিলাভ করতে চেষ্টা করেছে।

সাধনা রীতির এই পার্থক্য ভারতবর্ষের সমোজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। মুক্তির অদম্য পিপাসা অনেকের মধ্যেই একটা সমাজ-বিমুখ আত্মপরায়ণতা সৃষ্টি করেছে এবং সমাজ সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করবার বা আরণ্যকজীবন যাপন করবার প্রেরণা দিয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণ বা 'আরণ্যক' জীবন, মুক্তির সহায়ক হিসাবে ক্রমে অধিকতর মর্যাদা পেয়েছে। নির্বিঘ্নে ধ্যান-ধারণা করবার জন্য নির্জন স্থানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা, সমা-জের চোখে অতি প্রশংসনীয় কাজ ব'লে বিবেচিত হয়েছে। কারণ, এইসমস্ত

উপায়, পরমপুরুষার্থ মুক্তির জন্য অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য ব'লে মান্য হয়েছে। মুক্তি যেখানে এতখানি কাম্য সেখানে গৃহীর কাছে সন্ন্যাসের এই মর্যাদা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সমাজে সন্ন্যাসীরা যে এত অধিক মর্যাদা পেয়ে এসেছেন এবং এখনও পান, তার কারণ রয়েছে এখানেই—এই মুক্তিদর্শনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই।

এই মনন-প্রধান উপনিষদ্‌যুগের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। এঁদের একদল কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী, অন্যদল জ্ঞানকাণ্ডে বিশ্বাসী। প্রথম দল যাগযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভ করতে চেষ্টিত, দ্বিতীয় দল—'যোগ'-ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে ভববন্ধন থেকে মুক্তি দিতে প্রয়াসী। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার দুই উপদল। এক উপদল—অদ্বৈতবাদী, অন্যদল—দ্বৈতবাদী। প্রথম উপদল—বিশ্বজগতকে আত্মময় ব'লে মনে করেছে, তাঁদের কাছে মুক্তি-সাধনা হয়েছে ব্রহ্মে লীন হওয়ার সাধনা—মায়াবদ্ধ জীবাত্মার মায়াপাশ ছিন্ন করার সাধনা। অন্যদল প্রকৃতি ও পুরুষকে দুই স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে মনে করেছেন এবং মুক্তি বলতে বুঝেছেন—প্রকৃতির সম্পর্ক এড়িয়ে 'স্বরূপে অবস্থান'। উভয়েরই পন্থা—'যোগ' ও ধ্যান-সমাধি বটে, কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে উভয়ের পার্থক্য উপেক্ষণীয় নয়, বরং বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। দ্বৈতবাদী সাংখ্যরা প্রকৃতি থেকে পুরুষের অথবা পুরুষ থেকে প্রকৃতির উদ্ভব ঘটেছে, এ কথা স্বীকার করেন না। সাংখ্যবাদীর কাছে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি সত্য এবং পুরুষ নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের রহস্যময় যোগের ফলেই, অসঙ্গ পুরুষের 'জাত্যায়ূর্ভোগ' সম্ভব বৈদান্তিকের কাছে যেখানে সচ্চিদানন্দময় এক পুরুষ বহুরূপে লীলা করছেন, সাংখ্যবাদীর কাছে সেখানে পুরুষ 'বহু' এবং স্বরূপে তারা সমান হলেও প্রকৃতি-পরবশতার মাত্রা ও প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। গুণময়ী প্রকৃতির সংযোগ ছিন্ন না করা পর্যন্ত পুরুষের মুক্তি নেই। প্রকৃতি গুণময়ী এবং নিত্য পরিণামশীল। সে যেন পরিণামের এক অবিরাম প্রবাহ। পরিণামশীল এই প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, পুরুষের মুক্তি হ'তে পারে না।

বুদ্ধ এই সাংখ্যবাদীদেরই নতুন সংস্করণ। যদিও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত-'বুদ্ধ-প্রসঙ্গ' নামক সংকলন-গ্রন্থে মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় —এই সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অবর বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।" এবং যদিও শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয় মৈত্রেয়ী উপনিষদ থেকে "সঃ বৈ এষঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ অপ্রাণঃ নিরাত্মা অনন্তঃ অক্ষয়ঃ স্থিরঃ শাশ্বতঃ অজঃ স্ব-তন্ত্র (২।৪)"--উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—'শূন্য বা 'নিরাত্মা' বিশেষণে ব্রহ্মকেও বিশেষিত করা হয়েছে, তবুও এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার—সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করার পরে যে সব গুরুর কাছে যোগাভ্যাস করেছিলেন, তাঁদের সাংখ্যযোগী ব'লেই মনে করা হয়ে থাকে। বিশেষতঃ 'আত্মা' সম্বন্ধে, পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা এবং মুক্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধরা যে মত পোষণ করেন তা' অধিক পরিমাণে সাংখ্যঘেঁষা। 'বুদ্ধ কথা' নামক গ্রন্থে বুদ্ধযুগের "ধর্মদার্শনিক পরিবেশ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে, ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন লিখেছেন—বৈদিকধর্মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত, এমন কি বেদবিরোধী মতবাদও সে যুগে অনেক ছিল। এই মতবাদগুলি প্রচারিত হইয়াছিল প্রধানতঃ পরিব্রাজক-সন্ন্যাসীসম্প্রদায়গুলির মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল—'নিগ্রন্থ' (জৈন) সম্প্রদায়। বুদ্ধের প্রায়আড়াই শত বৎসর পূর্বে কাশীনগরীর পার্শ্বনাথ এই মতের সমধিক প্রচার করেন। বুদ্ধের যুগে বৈশালী নগরীর জ্ঞাতৃবংশজাত মহাবীর এই সম্প্রদায়ের সংস্কারক ও শক্তিমান প্রচারক ছিলেন। পার্শ্ব ও মহাবীর উভয়েই ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন।····· নিগ্রন্থমতের প্রধান শিক্ষা ছিল অবিনাশী আত্মায় এবং অবিনাশী 'পুদ্গলে' (যাবতীয় জড়বস্তুর মৌলিক স্থূল উপাদান) বিশ্বাস। আত্মার প্রধান লক্ষণ হইতেছে চেতনা। আত্ম (বা জীব) ও পুদ্গল উভয়ই গতিশীল; আত্মার স্বভাবগতি উর্ধ্বমুখ, পুদ্গলের স্বভাবগতি অধোমুখ। আত্মা অরূপী হলেও দেহানুযায়ী আয়তনবান।

পুদ্‌গলের সহিত বন্ধনই জীবের সংসার ভ্রমণের কারণ। এই বন্ধন হইতে মুক্তিই মোক্ষ। জীবের পুদ্‌গল বন্ধনের কারণ হইতেছে কর্ম, কর্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা পূর্বজন্মার্জিত কর্মনাশ হইতেছে মোক্ষলাভের উপায়।...... পরমাত্মা ঈশ্বর বা ভগবানপ্রভৃতির কোন প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্বের উল্লেখ প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে নাই।" এই মত অবৈদিক হ'লেও মূলতঃ দ্বৈতবাদ এবং সাংখ্য-মতেরই অনুরূপ। সাংখ্যের 'প্রকৃতি' এবং নিগ্রন্থের 'পুদ্‌গল', সাংখ্যের পুরুষ, নিগ্রন্থের 'আত্মা' নামতঃ পৃথক বটে কিন্তু তত্ত্বতঃ প্রায় এক। তারপর সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগের, কর্মবিপাকের এবং কর্মক্ষয়ের ধারণাও এখানে আছে। 'সর্বং খল্বিদং' সাংখ্যযোগী যেমন মানেন না, এঁরাও তেমনি মানেন না।

অবৈদিক নিগ্রন্থ মতের মতোই, বৌদ্ধমত, সাংখ্য-যোগ দর্শন থেকে যতটা পরিভাষায় ততটা মূলতত্ত্বে পৃথক নয়। বুদ্ধ-বাণীর তাৎপর্য্য, বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা স্বীয় মেধা অনুসারে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে (বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক যোগাচার) বিভক্ত হয়েছেন এবং উৎকট দার্শনিক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু এ কথা স্বীকার করা যায় না যে, বৌদ্ধ পরাদর্শন সম্পূর্ণ নতুন—সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে আবির্ভূত। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ এবং সাংখ্যীয় দ্বৈত বাদের বাইরে এসে বুদ্ধ নতুন এবং অতিরিক্ত একটি পরাদর্শন (Metaphysics) প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এমন কথা বলা চলে না। তারপর, ব্রহ্ম থেকে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি হ'য়েছে কি না অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি দু'টি স্বতন্ত্র সত্তা, কি না দু'য়ের সংযোগে জীবাত্মার উদ্ভব ঘটেছে কি না—এমন সব মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বুদ্ধ মাথা ঘামাতে যাননি। তাঁর কাছে জীবের মুক্তির প্রশ্ন, দুঃখপরিনিবৃত্তির সমস্যাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে—এ কথায় আর যাই প্রমাণিত হোক না হোক, এই কথাটাই বেশী ক'রে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধ জীবাত্মার এবং 'মুক্তি'র ধারণা প্রাচীন দর্শন থেকেই গ্রহণ করেছেন এবং তা'তেই সন্তুষ্ট রয়েছেন। মানতেই হবে—'জীবাত্মার অর্থাৎ আত্মার

স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস না থাকলে জন্মজন্মান্তর, দুঃখহানি বা নির্ব্বাণের কথা উঠতেই পারে না এবং একথাও মানতে হবে যে বুদ্ধ এ সবই মেনেছেন। 'সর্বমনাত্মম্'—বলায় যদি 'আত্মা' না মানা হ'য়ে থাকে এবং 'সর্বং ক্ষণিকম' বলায়'যদি সব ক্ষণস্থায়ী কোন নিত্য পদার্থ মানার অবকাশ না থেকে থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে—বুদ্ধদেব যে ডালে বসেছেন সেই ডালেরই গোড়া কেটে ফেলেছেন।

'সর্বমনাত্মম্' বলতে যদি, প্রকৃতি প্রপঞ্চ 'অনাত্মম্' (অচেতন) এই না বুঝিয়ে, চেতন 'আত্মা' ব'লে কোন স্বতন্ত্র সত্তাবান কোন-কিছু নেই—এই বুঝায় এবং 'সর্বং ক্ষণিকম্' বলতে যদি 'সব অনিত্য' এই কথা ছাড়া অন্য কিছু অর্থাৎ 'সবই ক্ষণিকের'—সব কিছুরই স্থায়িত্ব ক্ষণিক—এই কথা বুঝায়, তা'হ'লে "তৃষ্ণা" "চিত্ত সংস্কার" 'জন্ম-জন্মান্তর' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা অসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায় না কি? তৃষ্ণা যদি থাকে, কাকে আশ্রয় ক'রে থাকবে? কা'র আশ্রয়ে সংস্কার আহিত হবে? মৃত্যুর পরে কাকে আশ্রয় ক'রে স্কন্ধগুলি 'আলয়'রূপে বিরাজ করবে? একটি কেন্দ্রস্থানীয় আশ্রয়ী বা সংস্থা—'পুরুষ' বা 'আত্মা' যাই বলা হোক না কেন, তাকে স্বীকার করতেই হবে। নিত্য আত্মা স্বীকার না করলেও বৌদ্ধরা **"পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তান"কেই** আত্মার স্থলে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, এই স্কন্ধপঞ্চক সন্তান অনাদি এবং নির্ব্বাণান্ত। এই "পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তান"—এর ধারণা, মনে হয়, সাংখ্যের পুরুষবহুত্বের ধারণা থেকেই জন্মেছে। যদিও সাংখ্যের পুরুষ এবং পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তান' সর্বাংশে এক নয়, তবু একস্থলে উভয়ের সাদৃশ্য আছে এবং সেই স্থলটি এই যে উভয়েই 'সর্বং খল্বিদং এর অংশ নয়— ঈশ্বর বা বিধাতাপুরুষের লীলাকৈবল্যের ফল নয়; উভয়েই অনাদি এবং প্রত্যেক অনাদির মতোই রহস্যময়। সাংখ্যদর্শনের নির্গুণ পুরুষ যতখানি রহস্যময় এবং পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে জীবাত্মার উদ্ভব যতখানি অহেতুক বৌদ্ধদর্শনের 'পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তান'-এর অনাদিত্বও ততখানিই রহস্যময়। তবু, এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে 'পুরুষ'

ও 'পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তান' অনাদিত্বধর্মে এক হ'লেও নিত্যত্ব-ধর্মে পৃথক। প্রথমটি যেখানে নিত্য, দ্বিতীয়টি সেখানে অনিত্য :অর্থাৎ নির্বাণান্ত। নির্বাণের পরে পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তানের কি অবস্থা হয়? যদি লয় পায়, কোথায় বা কার সঙ্গে লয় পায়? যদি থাকে কোথায় এবং কি অবস্থায় থাকে?—সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় থাকে কি না? এ সব প্রশ্নের জটিল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না ক'রে, এখন যে কথাটা আগে বলতে চেয়েছি, সেই কথায় ফিরে আসা যাক।

বুদ্ধের অনেক আগেই, ভারতীয় সমাজ-জীবনে মুক্তির আবেগ এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রবৃত্তি, পরমপুরুষার্থ লাভের অঙ্গ .হিসাবে, যথেষ্ট মূল্যবান ব'লে গণ্য হয়েছিল। পুরুষার্থ-সাধনায় মুক্তি বা মোক্ষের স্থান ছিল সকলের উপরে। 'ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের সাধনা ছিল সাধারণের আর মোক্ষ-সাধনা ছিল তাঁরই যিনি ছিলেন অসাধারণ। "প্রবৃত্তিরেষ ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" 'প্রবৃত্তির দাস যাঁরা, তারা বিষয়াসক্ত হ'য়েই জীবন কাটিয়েছেন. কিন্তু যারা নিবৃত্তির অনুশীলনকে জীবনে বড স্থান দান করেছেন—বিষয়াসক্তির প্রতিক্রিয়ায় যাদের মধ্যে বৈরাগ্য জন্মেছে, তারা সাধারণের মত জীবনযাপন করতে পারেননি। জীবনের পূর্ণ মূল্য আদায করতে তারা ক্ষ্যাপার মতো পরশ-পাথর খুঁজতে বেরিয়েছেন। যা পেলে জীবনের সব চাওয়া পাওয়া শেষ হবে—এমন কিছু পাওযার আশায় সমাজ-সংসার সব-কিছু ত্যাগ করেছেন। চিরজীবনের তৃষ্ণায় তাঁরা জীবনের সহজ দাবী-দাওয়া অস্বীকার ক'রে অন্ধ-আবেগে ছুটে বেরিয়ে গেছেন। এর জন্য, বনে বনে, গুহায় গুহায়, আশ্রমে আশ্রমে, কত প্রাণায়াম কত ধ্যান, কত সমাধির ঐকান্তিক অভ্যাস চলেছে। এর জন্য কত কৃচ্ছ্র সাধনা—কত চিত্তবৃত্তিনিরোধের ব্যায়াম, কত ভজনপূজন আরাধনা—কত জপ-যজ্ঞ-কীর্তন চলেছে। এমন কি, সংসারের দূরে আর এক সংসার, সাধারণ মানব সমাজের পাশে আর এক সন্ন্যাসী-সমাজ, গড়ে উঠেছিল।

এ কথা আগেই একবার বলেছি—মুক্তিকে মানুষ পরমপুরুষার্থ ব'লে

জানলেও, মুক্তির জন্য সমাজ-সংসার ত্যাগ করার আবেগ এবং সঙ্কল্প অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই জন্মে থাকে। কেন এমন হয়— এপ্রশ্নের আলোচনা করতে গেলে, কেন দু'টি ব্যক্তি পৃথক হয়, ব্যক্তিত্বের পার্থক্যে কিভাবে আচ-রণের পার্থক্য ঘটে, সমাজ ও পরিবেশ কিভাবে ব্যক্তির আচরণ প্রভাবিত করে, এই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আজ পর্যন্ত যে যে ব্যক্তি সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে—সন্ন্যাসগ্রহণের বিশেষ বিশেষ কারণ নির্দেশ করতে পারলেই,—'কেন এমন হয় ?' এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়া যাবে।

বিশেষ কারণটি যাই হোক—সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবণতা ভারতীয় সমাজের এক পুরাতন সংস্কার। এই সংস্কারের প্রেরণাবশেই খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কপিলবাস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ একদিন স্ত্রী-পুত্র-ধন-ঐশ্বর্য সমস্ত ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। বোধ হয় জীবনকে দু'হাতে ভোগ ক'রেই, ভোগসম্ভোগের রস নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েই, জীবনের মোহ যে কত হেয় তা' তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ; বুঝতে পেরেছিলেন—জীবনকে ক্ষণস্থায়ী রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের উপচারে তৃপ্ত ক'রে তৃপ্তি নেই। বোধহয় জীবন-পরানুরাগ ঐকান্তিক ছিল বলেই, তিনি সমস্ত ক্ষণিকতার প্রবাহ থেকে মুক্ত করে, জন্ম-জন্মান্তরগ্রহণের সংসার-ক্লেশ থেকে দূরে জীবনকে চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে চেয়েছিলেন এবং তারই প্রেরণায়—সেই চিরজীবনের তৃষ্ণায়— বহুভুক্ত সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সংসার তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি ; পুত্রস্নেহ—পত্নীপ্রেম—পিতৃভক্তি তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি। সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে তিনি মহাজীবনের পথে ছুটে গিয়েছিলেন ; জীবনরহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করতে একাগ্রচিত্তে সাধনা করেছিলেন।

বুদ্ধজীবনের **প্রথম এবং প্রধান তাৎপর্য**—মহাজীবনের আকূতি— ঐকান্তিক জীবনরহস্য-জিজ্ঞাসা এবং রহস্য ভেদ করবার জন্য অদম্য সঙ্কল্প নিয়ে একাগ্র সাধনা। রহস্য ভেদ ক'রে বা সিদ্ধিলাভ ক'রে কি পাওয়া গেছে সেটা

বড় কথা নয়, বড় কথা—জিজ্ঞাসার ঐ ঐকান্তিকতা, সঙ্কল্পের অদম্যতা এবং সাধনার একাগ্রতা। অজ্ঞেয়কে জানবার, অসাধ্যকে সাধন করবার এবং অপ্রাপ্যকে পাওয়ার সাধনার যে সর্বকালীন এবং সর্বজনীন আবেদন বা মূল্য রয়েছে,—বুদ্ধজীবনের প্রথম এবং প্রধান মূল্য সেখানেই। বুদ্ধ যে পরাদর্শন প্রচার করেছিলেন আজকে হয়তঃ তার ঐতিহাসিক মূল্যটুকু ছাড়া আর কোন মূল্যই নেই ; যে সন্ন্যাস ও সংঘ-জীবনের প্রেরণা তিনি জাগিয়েছিলেন তাকে হয়তঃ আজ আর কেউ কাম্য ব'লে মনে করে না কিন্তু, বুদ্ধের জীবনের ভিতর দিয়ে মহাজীবনের জন্য যে আকূতি ফুটে উঠেছিল, তার মূল্য অবশ্যই চিরন্তন। যে মহাজীবননের আকূতির মধ্যে বুদ্ধের জীবনাবেগ ব্যক্ত হয়েছে—তা' তো সর্বকালের কাছে—সর্বজীবনের কাছেই রসণীয়। এই আকূতির মধ্যেই বুদ্ধ-জীবনের রস,—বুদ্ধচরিতেরও রস নিহিত।

বুদ্ধজীবনের **দ্বিতীয় তাৎপর্য** বা সার্থকতা—অষ্টাঙ্গিক মার্গের—মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা প্রভৃতি ভাবের অনুশীলনের ভিতর দিয়ে মানুষের নৈতিক-সত্তার পূর্ণ বিকাশের আদর্শ স্থাপনা। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক ধ্যান এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করলে, নির্ব্বাণ লাভ হোক বা না হোক, মানুষ যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে আদর্শ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়, অর্থাৎ মানুষের সামাজিক সহানুভূতি যে আদর্শ পর্যায়ে পৌছায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। মৈত্রী-করুণ-মুদিতা-উপেক্ষা প্রভৃতি ভাবনার অনুশীলন, অবশ্যই প্রত্যেক যুগের সমাজের কাছে পরম কর্তব্য বলেই গৃহীত হবে। আসল কথা—বুদ্ধের সাধনারীতির আধ্যাত্মিক মূল্য থাক বা না থাক, নৈতিক মূল্য অসাধারণ-সর্বকাল গ্রাহ্য—সর্বজনগ্রাহ্য। ২৬ বর্গে বিভক্ত 'ধর্মপদ' গ্রন্থে (৪২৩ শ্লোকে) যে সব বাণী সংকলিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি বাণীই মহা-মূল্য। এই সব বাণী যে শুধু এক যুগেরই উপলব্ধি তা নয়—এদের মধ্যে সমস্ত যুগের প্রবুদ্ধ আত্মার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বুদ্ধজীবনের আর একটি

তাৎপর্য এবং অবশ্য উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য—সন্ন্যাস ও গৃহ ধর্মের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধন করা—গৃহীকে এবং রাজাকে গৃহি-সন্ন্যাসী—রাজ-সন্ন্যাসীতে পরিণত করা—অহিংসাকে জীবন-যাপনের সর্বস্তরে মূলধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ভারতের পক্ষে এর ফল ভাল হ'য়েছে কি না বা কোনকালে, সমস্ত মানবসমাজ অহিংসাকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করবে কি না—এ সব প্রশ্নের আলোচনায় প্রবেশ না ক'রেও এই কথাটা বলা যায় যে, মানবসমাজ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিশ্বমানবতারই ধ্যান করছে এবং যে আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে, তার ভিত্তি—অহিংসা ও মৈত্রী। হিংসাকে মূলধন ক'রে ব্যবসায় এবং বৈষয়িক মোটা লাভের হিসাব ছেড়ে দিয়ে, মানুষ যেদিন তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির আসল মূল্য বিচার করতে বসবে, সেদিন অহিংসা ও মৈত্রী-ভাবনার অনুশীলন তার কাছে মহামূল্য সম্পদ ব'লেই বিবেচিত হবে। বাস্তবিকই, যেদিন প্রত্যেকটি সমাজ অহিংসায় বা মৈত্রী-ভাবনায় দীক্ষিত হবে, সেদিন মানব-সমাজ নতুন এক স্তরে বিবর্তিত হবে। বুদ্ধের সাধনা মানুষকে সেই স্তরে উন্নীত করতে পারেনি—এ কথা যত সত্য, তত সত্য এই কথাটিও যে বুদ্ধই প্রথম মানব-সমাজকে অহিংসার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন। এই সব তাৎপর্যের জন্য বুদ্ধ আজও শরণ্য।

কিন্তু মানুষের মধ্যে অবতার-কল্পনার প্রবণতা এতই প্রবল যে, শাক্যমুনি বুদ্ধ অনতিবিলম্বেই ভক্তদের কাছে 'ভগবান' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দীঘনিকায় গ্রন্থের মহাপদান সুত্তন্তে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের অবতার এবং ইন্দ্রাদি দেবতার স্তবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বর্ণনার মূলে এই মনোভাবই কাজ করেছিল যে বুদ্ধ হিন্দুদেবতাদের চেয়ে অনেক বড়; ইন্দ্রাদি বৈদিক এবং অন্যান্য পৌরাণিক দেবতা বোধিসত্ত্বের অধীন বা সেবক। এইজাতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে এই কথাটাই বিশেষভাবে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছে যে বোধিসত্ত্বের বুদ্ধ রূপে অবতরণ, ইন্দ্রাদি দেবতাদেরই

প্রার্থনার ফলে ঘটেছে। অর্থাৎ দেবতারা নিজেদের শক্তিতে বুদ্ধ-অবতারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেননি বলেই বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং বুদ্ধের জন্ম, গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা, সুসম্পন্ন করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, বুদ্ধ ভক্তদের এই প্রচার-কার্য, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে জয়লাভ এবং প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সহজেই অনুমান করা চলে যে অন্যান্য সর্ব্বসম্প্রদায়গুলির প্রবল বাধা ঠেলেই বৌদ্ধধর্ম্মকে অগ্রসর হতে হয়েছিল এবং জনচিত্ত জয় করাব জন্য—সকল ধর্ম্মের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বুদ্ধভক্তরা বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য বৌদ্ধদের এই চেষ্টা বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারেনি। ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনকে নস্যাৎ করবার জন্য, বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার বোধ করবার জন্য, অন্যান্য সম্প্রদায় যথাসাধ্য চেষ্টাই করেছিলেন।

তবে সংঘর্ষের পরে সমন্বয়—এ নিয়ম এক্ষেত্রেও কাজ করেছে। কালক্রমে, বৈষ্ণবসম্প্রদায় বুদ্ধকে অবতার বলে ঘোষণা করেছেন। জয়দেবলিখিত দশাবতারস্তোত্রই তার বড় প্রমাণ। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণবরাই কেন বুদ্ধকে অবতার বলে প্রথম স্বীকার করেছেন ভেবে দেখারই কথা। আমার মনে হয়—বুদ্ধের অহিংসা-বাণী ও প্রেমমন্ত্রের সঙ্গে বৈষ্ণবদের 'প্রেমের ধর্ম্ম'—এর সাদৃশ্য ছিল বলেই এবং শাক্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৌদ্ধ-মিত্রতা অর্জন করবার প্রয়োজনেই বৈষ্ণবকবি বুদ্ধকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। তবে এই ঘোষণায় একদিকে যেমন বুদ্ধের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে, তেমনি অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ ক'রে নেওয়ার চেষ্টাও র'য়েছে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বল্‌লে, সম্মান দেখাবার ছলে বুদ্ধকে হত্যাই করা হয়—বৌদ্ধধর্মকে, বৌদ্ধদর্শনকে তার স্বতন্ত্র-প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে বিতাড়িত করবারই চেষ্টা করা হয়। যাই হোক,—জয়দেবের পরে, বুদ্ধ সাধারণ হিন্দুদের কাছে দশাবতারের অন্যতম অবতার ব'লেই সম্মান পেয়ে

আসছেন। পৌরাণিক যুগের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসে-গড়া বৈকুণ্ঠোপম দিব্যধামে এই বুদ্ধের আদিম অধিষ্ঠান,—মর্ত্তে তাঁর নরলীলা—নির্বাণে নরলীলার **অবসান**। আমাদের কাছে বুদ্ধ নর নয়, নররূপী বিষ্ণু—কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর।......

বুদ্ধ-জীবনের তথ্য ঃ—

১। **জন্মকাল**—অনুমান খৃঃ পূঃ ৫৬৩

২। **পিতা**—শুদ্ধোদন

—পালিশাস্ত্রে—'শাক্য শুদ্ধোদন' নামে খ্যাত

(বংশ)—ইক্ষাকুবংশীয় (দীঘনিকায়)

(গোত্র)—গৌতম গোত্রীয় ও শাক্যবংশীয় আদিত্য-গোত্রীয় (মহাবগ্‌গ)

(জাতি)—পার্ব্বত্য মঙ্গোলীয় ? ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত

—পরবর্তী বৌদ্ধ লেখকদের মতে—'রাজা' (বস্তুতপক্ষে—**ভূস্বামী**)

(রাজধানী)—কপিলবাস্তু (বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত)

—(শাক্যরা কার্যতঃ স্বাধীন হ'লেও নামে কোশলের অধীন ছিল)

৩। **মাতা**—মায়া

৪। **জন্ম সম্বন্ধে কিংবদন্তী**—(ক) মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন—**একটি** শ্বেত হস্তী তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে গর্ভে প্রবেশ করেছে। শুদ্ধোদনকে এ কথা জানাতেই তিনি জ্যোতিষীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন। **স্বপ্ন** ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন—মায়াদেবীর গর্ভে মহাপুরুষ জন্ম নেবেন। সংসারে থাকলে তিনি বড় রাজা হবেন, সংসার ত্যাগ করলে বড় সাধু হবেন (জৈনশাস্ত্রেও এই ধরণের গল্প কথিত আছে)

(খ) মায়াদেবী **পিত্রালয়ে** যাচ্ছিলেন বা **বেড়াতে** গিয়েছিলেন—**এমন** সময় কপিলবাস্তুর সন্নিকটে লুম্বিনী নামক **বনে** বা **উদ্যানে** বুদ্ধের জন্ম হয়।

(গ) **বৌদ্ধসাহিত্যে অতিরঞ্জিত বর্ণনা :—**

ইন্দ্রাদি দেবতারা বোধিসত্ত্বকে জন্মগ্রহণ করার জন্য স্তব করলেন ; মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে শিশুর জন্ম হ'লে স্বর্গে দুন্দুভি বাজল, মর্তে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল। দেবতারা মহাসমারোহে নবজাতককে মহার্ঘবস্ত্রে স্বহস্তে মাতৃগর্ভ থেকে গ্রহণ করলেন এবং পূজাবন্দনাদি করলেন।

(দীঘনিকায়-গ্রন্থের 'মহাপদান' সুত্তন্তটিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)

(৫) নামকরণ—সিদ্ধার্থ (পিতামাতার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে ব'লে)

(৬) জ্যোতিষীরা আবার ভাগ্যগণনা করলেন—সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের গুরু সম্ভাবনা আছে তা জানালেন।

(৭) মায়ের মৃত্যু—'সাতদিন' পরে মায়ের মৃত্যু।

(৮) মায়াদেবীর ভগিনী—শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নী শিশুর পালন ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে—"মহাপ্রজাবতী গৌতমী" বলে ইনি উল্লিখিত।

৯। বাল্যজীবন

(ক) বাল্যকাল থেকেই **ধীর** ও **ভাবুকপ্রকৃতির**—নির্জনস্থানপ্রিয়।

(খ) **করুণাকাতর চিত্ত**। দেবদত্ত (সমবয়স্ক পিতৃব্যপুত্র) একবার তীরবিদ্ধ ক'রে একটি হাঁসকে ভূপাতিত করলে সিদ্ধার্থ শুশ্রূষা ক'রে আহত পক্ষীর প্রাণ বাঁচান।

(গ) **ভোগবিলাসে পালিত।**

বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে সম্বোধন ক'রে একবার বলেছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! আমি সুকুমার ছিলাম, পরম সুকুমার ছিলাম, অত্যন্ত সুকুমার ছিলাম। হে ভিক্ষুগণ! আমার জন্য পিতৃগৃহে অনেক পুষ্করিণী খণিত হইয়াছিল। কোন স্থলে উৎপল, কোনস্থলে পদ্ম এবং কোন স্থলে বা পুণ্ডরীক উৎপন্ন হইত—এ-সমুদায় উৎপন্ন হইত আমারই জন্য। হে ভিক্ষুগণ! কাশীর চন্দন ভিন্ন অন্য কোন চন্দন ধারণ করিতাম না। হে ভিক্ষুগণ। আমার

বেষ্টনও কাশীর, কঞ্চুকও কাশীর, নিবাসনও কাশীর এবং উত্তরসঙ্গও কাশীর। আমার মস্তকে দিবারাত্রি ছত্রধারণ করা হইত। শীত বা গ্রীষ্ম, ধূলি বা তৃণ বা হিম কিছুই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। হে ভিক্ষুগণ! আমার জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল।—একটি হৈমন্তিক, একটি গ্রৈষ্মিক, আর একটি বার্ষিক (বর্ষাকালের জন্য)। হে ভিক্ষুগণ! বার্ষিক প্রাসাদে বর্ষাকালের চারিমাস তূর্যবাদিনী নারীগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত·· ···" ('বুদ্ধ-প্রসঙ্গ-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

১০। **বিবাহ** (বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ)

(ক) উচ্চমনা ও নম্রপ্রকৃতির কন্যা হলে বিয়ে করতে রাজি।

(খ) ভাবী পত্নীর গুণের তালিকা গুরুজনদের হাতে দিয়ে তদনুসারে কন্যা নির্ব্বাচন করতে বলেন।

(গ) সমবেত শাক্যকুমারীদের ভিতর থেকে স্বয়ং এক তরুণীকে মনোনীত করেন।

পত্নীর নাম—'রাহুল-মাতা' (পালিশাস্ত্রে)

—গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা, ভদ্রা বিম্বা ইত্যাদি

—রাহুল-মাতা সিদ্ধার্থের **'মাতুলকন্যা'** ?

—রাহুল-মাতা সিদ্ধার্থের **পিতৃব্যকন্যা**

(শুদ্ধোদনের অন্য এক ভ্রাতা অমৃতোদনের কন্যা)

১১। **বৈরাগ্য ও গৃহত্যাগ**

(ক) মজ্ঝিম নিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায় থেকে—সিদ্ধান্ত

(১) জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, সংক্লেশ—এই ছয়টি বিষয় চিন্তা করে সংসারে বীতরাগ হয়েছিলেন।

(২) অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেননি। সন্ন্যাসগ্রহণকালে পিতামাতা অশ্রুমুখ হয়ে ক্রন্দন করেছিলেন।

(৩) গৃহেই কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করিয়েছিলেন এবং গৃহেই কাষায় বস্ত্র পরিধান ক'রে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন।

(খ) বৈরাগ্য সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস : [জাতকের নিদান কথা] উদ্যান-ভূমিতে যাওয়ার পথে—জরাজীর্ণ, ব্যাধিত, মৃত এবং প্রব্রজিত—এই চারিপ্রকার পুরুষ দেখে গৌতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। আগে লিখিত আছে যে উদ্যানে যাবার আগেই পথ থেকে এই চারপ্রকার লোককে অপসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু দেবগণ চারদিনে যথাক্রমে ঐ চারটি দৃশ্য সৃষ্টি করেছিলেন। (এ ঘটনা ঘটেছিল—'বিপশ্বী' নামক বুদ্ধের জীবনে ('দীঘ-নিকায়' দ্রষ্টব্য)

(গ) ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবরণ :—
বহু নারী নৃত্যগীত বাদ্যাদি দ্বারা গৌতমের চিত্তবিনোদন করত। এক রাত্রে, গৌতম ঐ নারীদের নিদ্রিতাবস্থায় বীভৎসরূপ দেখে, সংসারের উপর বীতরাগ হয়েছিলেন। (এ ঘটনা ঘটেছিল—'যশ' নামক শ্রেষ্ঠিপুত্রের জীবনে—'বিনয়পিটক' দ্রষ্টব্য।

১২। সাধক আলাড়-কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন

১৩। পরে—রাম-পুত্র উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন

১৪। মগধদেশে উরুবেলা নামক গ্রামে উপস্থিত হয়ে—কঠোর তপস্যা

১৫। কৃচ্ছ্রসাধনা ত্যাগ ক'রে মধ্যপন্থা অবলম্বন
—বুদ্ধত্বলাভ।

১৬। **ধর্ম্মচক্রপ্রবর্তন**

(ক) বারাণসীর নিকটবর্তী ঋষিপত্তনের মৃগদাব বনে গিয়ে পূর্বের সঙ্গী পঞ্চ ভিক্ষুর কাছে প্রথম ধর্ম ব্যাখ্যা করেন।

(খ) 'যশ' নামক শ্রেষ্ঠিপুত্রকে দীক্ষা দান করেন। যশের চারজন বন্ধু এবং আগে ৫০ জন দীক্ষিত—(শিষ্যসংখ্যা হয় মোট ৬০)॥

(গ) উরুবিল্ব গ্রামের নৈরঞ্জনা-নদী-তীরের এবং গয়ার তিনজন বানপ্রস্থাবলম্বী ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ করেন। এই তিন ব্রাহ্মণ সদলে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

(ঘ) গয়াশীর্ষ পাহাড়ে কিছুদিন কাটিয়ে—রাজগৃহ নগরের উপকণ্ঠে, যষ্ঠিবন নামক স্থানে আসেন।

(ঙ) ভিক্ষুপরিবেষ্টিত বুদ্ধের কাছে রাজা বিম্বিসার উপস্থিত হন এবং বেণুবন-আরাম' ভিক্ষুসংঘকে দান করেন।

(চ) নালন্দা-গ্রামের কোলিত ও উপতিষ্য নামক দুই ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত যুবক—বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উপতিষ্যের অপর নাম—সারিপুত্র এবং কোলিতের অপর নাম—'মৌদ্‌গল্যায়ন'।

(ছ) ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে বিশেষত গৃহীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

১৭। শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে—সশিষ্যবর্গ বুদ্ধ কপিলবাস্তুতে যান এবং ন্যগ্রোধ-আরামে বাস করেন।

(ক) পুত্রকে ভিক্ষা করতে দেখে শুদ্ধোদনের বংশভিমান আহত হয়—পুত্রের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হয়। মহাপ্রজাবতী গৌতমী সশিষ্য বুদ্ধকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে আহার করান।

(খ) বুদ্ধের উপদেশ শুনতে—সকলেই উপস্থিত হন ; একমাত্র রাহুল-মাতা আসেন না—বলেন আমার যদি কোন মূল্য থাকে আমার স্বামী নিজেই আমার কাছে আসবেন। তিনি আসলে আমি তাঁকে প্রণাম করব।" বুদ্ধ এ কথা শুনে—রাহুলমাতার কক্ষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ॥ (সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি খুবই করুণ)॥

(গ)—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে ভিক্ষাপাত্র ধরে দাঁড়াতে ব'লে, কৌশলে সংসার ত্যাগ করান। (স্ত্রী জনপদকল্যাণীর পরম সৌন্দর্যের আকর্ষণের সঙ্গে নন্দকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল)

(ঘ) রাহুলের দীক্ষা—

একদিন বুদ্ধ আহার করতে বসেছেন। রাহুলমাতা পুত্রকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে, বুদ্ধকে দেখিয়ে বললেন—রাহুল, উনি তোমার পিতা, ওর মহামূল্য সম্পত্তি আছে, ওর কাছ থেকে তুমি তোমার পৈতৃক ধন চেয়ে নেও'। রাহুল বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন—শ্রমণ! আমার পিতৃধন আমাকে দেও। বুদ্ধের উত্তর না পেয়ে, ঐ কথা বলতে বলতে রাহুল বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ন্যগ্রোধ-আরামে গেলেন এবং সারিপুত্র তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

(ঙ) শুদ্ধোদনের কাছে প্রতিশ্রুতি—ভবিষ্যতে পিতামাতার বিনা অনুমতিতে কাকেও দীক্ষা দেওয়া হবে না।

(চ) কপিলবাস্তু থেকে বিদায়ের পথে 'অনুপ্রিয়'-গ্রামে অবস্থান—নাপিত উপালি এবং পিতৃব্যপুত্র দেবদত্ত ও আনন্দ প্রভৃতিকে দীক্ষা।

১৮। রাজগৃহে—৩ বর্ষা যাপন।
সুদত্ত (অনাথপিণ্ডদ) গৃহী শিষ্য হন।

১৯। অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীর জেত উদ্যানে বুদ্ধের ও সংঘের জন্য প্রশস্ত ভবনাদি নির্ম্মাণ করান। (জীবনের শেষ ২৫ বর্ষা বুদ্ধ এখানেই বাস করেন)

২০। **সংঘে নারীর প্রবেশ অনুমোদন করেন**
(ক) মহাপ্রজাবতী গৌতমী ও বহু শাক্যনারী প্রবেশ করেন।

২১। মৃত্যু—বা নির্বাণলাভ। খৃঃ পূঃ ৪৮৩

'লাইট অফ এশিয়া'তে বুদ্ধ-জীবনের বিবরণ

বুদ্ধজীবনের উল্লিখিত তথ্যরাজির উপর নির্ভর ক'রে, পরবর্তীকালে অনেকেই কাব্য-নাটকাদি রচনা করেছেন। এড়ইন আরনল্ডের জগদ্বিখ্যাত "Light

of Asia"-নামক যে কাব্যগ্রন্থখানি অবলম্বন ক'রে নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'বুদ্ধচরিত' নাটক রচনা করেছিলেন, তা'তেও মোটামুটি ঐ সব তথ্যই গ্রহণ করা হয়েছে। আরনল্ডের কাব্যখানি মহাকাব্যের ধরণে লেখা—আটটি সর্গে অর্থাৎ "Book"-এ বিভক্ত। এই কাব্যে মুখ্যতঃ বুদ্ধের জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে, রাজা শুদ্ধোদনের, বুদ্ধপত্নী যশোধারার এবং পুত্র রাহুলের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং উপসংহারে অতি সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বলা চলে ইঙ্গিত মাত্রই দেওয়া হয়েছে। **প্রথম সর্গে** বর্ণিত বিষয়—(ক) বুদ্ধের জন্ম, (খ) বুদ্ধের শিক্ষাদীক্ষা, (গ) বুদ্ধের সহজাত সমবেদনা, জীবে দয়া, ভাবুকতা ও ধ্যানপ্রবণতা। **দ্বিতীয় সর্গে** বর্ণিত বিষয়—অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক বুদ্ধকে ভোগবিলাসে আসক্ত করার জন্য রাজা শুদ্ধোদনের ঐকান্তিক প্রয়াস—সুন্দরী কন্যা নির্বাচনের উপায় হিসাবে 'সুন্দরী যুবতী-মেলা'-আহ্বান এবং সিদ্ধার্থকে দিয়ে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা—যশোধারাকে দেখে সিদ্ধার্থের মুগ্ধভাব—নিজকণ্ঠের হার পুরস্কার দান—যশোধারার পিতা সুপ্রবুদ্ধের নিকটে শুদ্ধোদনের দূত প্রেরণ—যশোধারার স্বয়ংবর-সভা—ধনুর্বিদ্যায়, অসিচালনায় ও অশ্বারোহণে সর্বোত্তম বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে সিদ্ধার্থের যশোধারার পাণিগ্রহণ—বিবাহোৎসব—বিলাস-ব্যসনের জন্য প্রমোদভবনাদি নির্মাণ—প্রমোদভবনের চতুঃসীমায় যা'তে মৃত্যু, বার্ধক্য, দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যাধি প্রভৃতি ঔদাস্যজনক কোন দৃশ্য না দেখা যায় এবং সেই সম্পর্কে কোন কথা না শোনা যায়—সেইরূপ আদেশ ঘোষণা। **তৃতীয় সর্গে** বর্ণনা করা হ'য়েছে—বিলাসে মগ্ন থেকেও সিদ্ধার্থ সময়ে সময়ে দিব্য-লোকের বাসনায় আত্মহারা হয়ে উঠেন—তাঁর প্রাণ কাঁদতে থাকে—চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে—বীণার ঝংকারের মধ্যে দেবগণের গান শুনতে পান—দেবতারা তাঁর কাণে গানে গানে বাণী পৌছে দেন : [—যার অনুবাদ করলে দাঁড়াবে—"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই ....]—সুন্দরী কুমারীর গানের পদ শুনে সিদ্ধার্থের বৃহত্তর বিশ্বের সবকিছু দেখার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে—

যশোধারার হাতে হাত রেখেও, তাঁর প্রাণ বিশ্বানুভবের জন্য ব্যাকুল—প্রাণে তাঁর অতৃপ্তির দুঃসহ বেদনা।—বিলাসভবনের বাইরে যে বিরাট বিশ্ব পড়ে আছে, তাকে দেখবার জন্য সিদ্ধার্থের সঙ্কল্প—পুত্রের সঙ্কল্প শুনে শুদ্ধোদন আদেশ ঘোষণা করেন—অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত, বৃদ্ধ প্রভৃতি বৈরাগ্যজনক ব্যক্তিদের রাজপথ থেকে অপসারিত করা হোক—সমস্ত রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা হোক—এই আদর্শের ফলে রাজ্য মায়াপুরীতে পরিণত হয়। সিদ্ধার্থের নগর-পরিদর্শনে যাত্রা—চতুর্দিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাস—অকস্মাৎ এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকের আবির্ভাব—মুখে তার কাতর প্রার্থনা—'বাবা, ভিক্ষা দেও, দয়া কর। কঙ্কালসার বৃদ্ধকে দেখে ছন্নের (channa) কাছে সিদ্ধার্থের বহুপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা—ছন্ন (ছন্দক) বার্ধক্যের পরিণাম ব্যাখ্যা করে বলে। সিদ্ধার্থের প্রশ্ন—সকলেরই এই পরিণাম ? 'সকলেরই'—উত্তর করে ছন্ন।—সিদ্ধার্থ গৃহে ফিরে আসেন—মনে দারুণ অস্বস্তি। উন্মনা সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ—সমস্ত বিষয়ে উদাসীন—নির্বাক। কথা বললেন যখন যশোধারা তাঁর পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু ঐ এক কথা—একদিন কাল সব রূপযৌবন হরণ করবে—এ আমি কিছুতেই সইতে পারছিনে। এই আতঙ্কে আমি কেবলই ভাবছি—কী ক'রে কালের হাত এড়ানো যায়। সিদ্ধার্থ বিনিদ্র রজনী যাপন করেন।

— অন্যদিকে ঐ রাত্রেই রাজা শুদ্ধোদন দুঃস্বপ্ন দেখেন—**প্রথম দুঃস্বপ্ন**—**বিরাট এক পতাকা**—সমুজ্জ্বল সুবর্ণাভ সূর্যের আলোক ঝলমল করছে—ইন্দ্রের পতাকা। দেখতে না দেখতে প্রবল ঝড় উঠে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত—কতগুলি ছায়াশরীর এসে ছিন্ন পতাকার খণ্ডগুলি পূর্বদিকে বহন ক'রে নিয়ে গেল। **দ্বিতীয় দুঃস্বপ্ন—দশটি বিরাটকায় হস্তী**—সর্বাগ্রবর্তীর পৃষ্ঠে রাজার পুত্র, সকলেই তাঁর অনুগমন করছে। **তৃতীয়—অত্যুজ্জ্বল রথ**—চারটি অমিততেজা অশ্ব তাকে বহন করছে, রথের মধ্যে সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট। **চতুর্থ দুঃস্বপ্ন—স্বর্ণনাভি রত্ননেমি চক্র,**—চক্রের পরিধিতে রহস্যময় লেখা।

পঞ্চম দুঃস্বপ্ন—বিশাল দুন্দুভি—পর্বত এবং নগরের মাঝখানে স্থাপিত; তার উপর সিদ্ধার্থ লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত করছে আর তার বজ্রনির্ঘোষে আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হ'চ্ছে। **ষষ্ঠ স্বপ্ন—অট্টালচূড়া**—পৌরভবনের শীর্ষ ছাড়িয়ে অভ্রভেদ ক'রে উঠেছে; তার উপর দাঁড়িয়ে কুমার সিদ্ধার্থ দু'হাতে রত্ন ছড়িয়ে দিচ্ছেন—বিশ্ববাসী সেই রত্ন লুফে নেওয়ার চেষ্টা করছে। **সপ্তম স্বপ্ন—আর্তস্বর,**—ছয়জন লোক আর্তনাদ করছে আরে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করছে এবং দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে পালিয়ে যাচ্ছে।—মৃগচর্মপরিহিত মুনিবেশধারী এক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধের আবির্ভাব ও স্বপ্নব্যাখ্যা—প্রথম স্বপ্নের তাৎপর্য—পুরাতন ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের লোপ, নতুন বিশ্বাসের আরম্ভ। দশটি হস্তী—দশ মহাজ্ঞান। ঐ জ্ঞানের শক্তিবলেই রাজকুমার বিশ্বে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। চারটি অগ্নি-নিঃশ্বাসী অশ্ব—চার সত্যধর্ম, চক্র—ধর্মচক্র। দুন্দুভিনির্ঘোষ—ধর্ম-প্রচারের প্রসার; অভ্রভেদী চূড়া—বৌদ্ধধর্মের ক্রমোন্নতি। ছয়জন লোকের ক্রন্দন—সিদ্ধার্থের কাছে ছয় ধর্ম-দার্শনিকের তর্কযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার। বৃদ্ধমুনির অন্তর্ধান—রাজার বিষাদ আরো বৃদ্ধি পায়—সর্বক্ষণ বিলাসে মুগ্ধ ক'রে রাখার জন্য সুন্দরী নর্তকীদের প্রতি আদেশ করেন এবং প্রমোদভবনের প্রত্যেক দ্বারে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেন।—দ্বিতীয়বার নগরীর শোভা দেখতে যাত্রা—পথে ব্যাধিগ্রস্তের দুর্দশা দেখে অনুকম্পা—মৃত্যুভাবনায় মন বিষাদময় হ'য়ে যায়—মৃতদেহ দর্শন—মৃত্যুচিন্তায়, জীবনের পরিণতি দেখে মন বিষাদ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। করুণাশ্রুতে চক্ষু পূর্ণ হয়—উর্ধ্বাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, আবার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আসেন—বহুদূরবর্তী সত্যের আলো সন্ধান করতে চান—বিশ্বের দুঃখভার দূর করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগে—নিত্যানিত্যবিবেক জাগে—জীবনের অনিত্যতা চিন্তা করতে থাকেন। ঘোষণা করেন :—

"......The Veil is rent
Which blinded me! I am as all these men

Who cry upon their gods and are not heard,
For are not heeded—yet there must be aid !
For them and me and all there must be help
Perchance the gods have need of help themselves.
Being so feeble that when sad lips cry
They can not save ! How can it be that Brahm
Would make a world and keep it miserable
Since, if ill powerlul, he leaves it so.
He is not good and if not powerful.
He is not God ?" (The Light of Asia—Book III)

চতুর্থ স্বর্গে—বুদ্ধের গৃহত্যাগ। নিস্তব্ধ নিশীথকাল—সমস্ত পুরী নিদ্রিত। প্রমোদকক্ষে বিলাসিনী রমণীরাও প্রমোদক্লান্ত হ'য়ে বিচিত্রভঙ্গিমায় প্রসুপ্ত। আরো অভ্যন্তরে সিদ্ধার্থের শয়নকক্ষের পাশে গঙ্গা ও গোতমী নিদ্রিতা। সিদ্ধার্থ ও যশোধারা তাঁদের শয়নকক্ষে—সুপ্তোত্থিতা স্বপ্নোদ্বেজিতা যশোধারা অশ্রুসিক্ত চোখে তিনবার সিদ্ধার্থের হস্ত চুম্বন করেন—শেষ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে আর্তস্বরে বলে উঠেন—জীবিতেশ্বর ! জাগো, কথা ব'লে হৃদয় শান্ত করো। সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করেন—কি হ'য়েছে প্রাণেশ্বরী ? যশোধারা দুঃস্বপ্নের কথা জানান ;—বহুশৃঙ্গী এক অতিকায় ষণ্ড মাথার উপরে এক তারকাপ্রায় মণি বহন ক'রে রাজপথে বিচরণ করছে—ধীরে ধীরে সে নগরদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত, কেউ তাকে বাধা দিতে পারছে না। সেই মুহূর্তে দৈববাণী শোনা গেল—তাকে ধরে রাখতে না পারলে নগরীর সব গরিমাই অন্তর্হিত হবে। তবু—কেউ তাকে ধরে রাখতে পারল না। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম—সকলকে জোর করে নগর দ্বার বন্ধ করতে বললাম ; কিন্তু কোন বাধাই সে মানল না, ছুটে বেরিয়ে গেল। আর একটা অদ্ভুত স্বপ্ন—চারটি অদ্ভুত দৃশ্য—তারা যেন চার লোকপাল, সুমেরু

পর্বত থেকে নেমে এসেছেন ; দেখলাম ইন্দ্রের পতাকা তোরণ থেকে খসে পড়েছে, তার স্থলে এক বহুলেখাঙ্কিত বিচিত্র বর্ণের পতাকা উড়ছে, তবে লেখা পাঠ ক'রে বিশ্ববাসী আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। একটা আর্তস্বর উঠল—সময় আসন্ন। সময় আসন্ন! সিদ্ধার্থ বলেন—পদ্মলোচনে ঠিকই দেখেছ। যশোধারা শেষ স্বপ্নটি বলেন :—আমি তোমার কাছে এলাম, এসে দেখলাম—শয্যা শূন্য, দেখলাম, আমার মণিহার কালসর্পে পরিণত হ'য়েছে—হাতের কঙ্কণ খসে পড়ে গেছে।—খোঁপার ফুল শুকিয়ে ধূলো হয়ে গেছে—আমাদের শয়ন-পালঙ্ক মাটির তলে বসে গেছে। তখনই আমি সেই শাদা ষাঁড়টির গর্জন শুনলাম—সেই পতাকাটিকে উড়তে দেখলাম এবং আবার সেই —'সময় আসন্ন! সময় আসন্ন!' আর্তস্বর শুনতে পেলাম। সিদ্ধার্থ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—প্রিয়ে শান্ত হও! অক্ষয় প্রেমের মধ্যে যদি শান্তি থাকে, তবে শান্ত হও। যদিও তোমার স্বপ্নে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে, যদিও দেবতারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছেন, যদিও মনে হ'চ্ছে পৃথিবীর দুঃখদুর্দ্দশার অবসান হ'তে চলেছে,—তবু, আমার ও তোমার ভাগ্যে যা'ই ঘটুক না কেন, এই কথাটা মনে রেখো—আমি তোমাকে ভালবেসেছি—ভালবাসি। সত্য বটে,—জীবের ও জগতের দুঃখদুর্দ্দশার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিনে মন আমার বিষণ্ণ, কিন্তু সত্যিই যদি আমার প্রাণ অজ্ঞাত প্রাণের ব্যথায় ব্যথিত হয়, যদিও অপরের দুঃখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে, তবুও একথা জেনো আমার বাসনা তোমাদের মত প্রিয়জনদের ঘিরেই বারবার ঘুরবে। স্বপ্নের তাৎপর্য যা'ই হোক—চিরদিনই আমি তোমার ; তোমার জন্যই আমার সমস্ত চাওয়া, সমস্ত পাওয়া। এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করবে—আমাদের জীবন দিয়ে আমরা জগতের দুঃখ হরণ করতে চেষ্টা করছি—এসো আলিঙ্গন কর আমাকে। শান্ত হ'য়ে ঘুমাও।

যশোধারার সজল চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। ঘুমের মধ্যে বার বার দীর্ঘ-শ্বাস পড়ে। মনে ভাসে—সময় আসন্ন! সিদ্ধার্থের চোখে ঘুম নেই। আকাশের

তারারা যেন ইসারায় কথা বলে—এই সেই রাত্রি! বেছে নেও—একদিকে মহত্ত্বের পথ, একদিকে সুখৈশ্বর্য, একদিকে রাজাধিরাজ হওয়া, অন্যদিকে গৃহহীন সন্ন্যাসীর জীবন। আবার কাণে ভেসে আসে সেই দৈব গীতি সিদ্ধার্থ সঙ্কল্প গ্রহণ করেন—বলেন, আমি বিদায় নেব। সময় উপস্থিত।—আমি এই জন্যই জন্ম নিয়েছি। আমার সমস্ত দিনরাত্রি এই জন্যই আমাকে, প্রস্তুত করেছে! রাজা হ'তে আমি আসিনি—জয়ের পর জয় স্তূপীকৃত করে স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করতে আমার জন্ম হয়নি। পথই আমার আবাস, পথের ধূলিই আমার শয্যা হোক, নীচাদপি নীচ আমার সঙ্গী হোক, তারা যা পরিধান করে তাই আমার পরিধান হোক, ভিক্ষান্ন আমার উপজীব্য হোক—'গুহা বা অরণ্য আমার আবাসস্থল হোক। হৃদয় আমার বিশ্বের সকলের দুঃখে কাঁদছে। এই দুঃখব্যাধি আমি দূর করবই—এ জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ বা কঠোর সংগ্রাম যা করতে হয় করব।

দেবতাদের কি সে শক্তি বা অতখানি করুণা আছে? কে তাঁদের দেখেছে? ভক্তদের দুঃখ দূর করতে তাঁরা কি করেছেন? কি ভাবেই না এই সব দেবতারা মানুষকে প্রেরণা দেয় স্তবস্তুতি করতে, ভোজসামগ্রী ও নিরীহ পশু-বলি দিতে, পুরোহিতের পেট ভরাতে, বিষ্ণু—শিব—সূর্য বলে কাতর প্রার্থনা জানাতে। এই সব দেবতা কাকেও রক্ষা করতে পারেন না। এদের উপাসনা করে কে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে? জন্ম-মৃত্যুর, ব্যাধি-জরার হাত এড়াতে পেরেছে? অবিরাম সেই এক পুরাতন প্রহসন চলেছে। এই অভিশাপ থেকে জীবকে উদ্ধার করতেই হবে। নিশ্চয়ই উদ্ধারের কোন উপায় আছে। সত্যের জন্য, প্রেমের জন্য, মুক্তির জন্য যদি সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয় তা'ও করতে হবে। মুক্তি পর্ব্বতগুহায় বা স্বর্গে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক তাকে পেতেই হবে। একদিন না একদিন সেই দুর্নিরীক্ষ্য সত্য উদ্‌ঘাটিত হবেই। ক্ষতবিক্ষত পদ তার গন্তব্য স্থলে পৌছবেই। যাকে পাওয়ার জন্য সমস্ত সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে, তাকে পাওয়া যাবেই। মৃত্যুই হয়ত

একদিন মৃত্যুকে জয় করবে। এমনি অনেক চিন্তার পরে সিদ্ধার্থ—বিশ্ববাসীর মুক্তিকল্পে, পিতা, পত্নী, পুত্র সকলেরই মুক্তিকল্পে, গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন—বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হন। ভ্রূ-যুগল দিয়ে সিদ্ধার্থ যশোধারার পদ স্পর্শ করেন স্ত্রীর ঘুমন্ত মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে, সজল চোখে চেয়ে থাকেন, বেদি প্রদক্ষিণ করার মতো, শয্যার চারিধারে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে 'আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান এবং গঙ্গা ও গৌতমীর কাছেও নিঃশব্দে বিদায় নেন।

পুষ্পসৌরভে বাতাস অমোদিত—পৃথিবী অজ্ঞাত আশায় কম্পিত—আকাশ দিব্য সুরে মুখরিত। দিকপালগণ সিদ্ধার্থের সঙ্কল্পস্থির করুণাকোমল সজল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকেন। সিদ্ধার্থ ছন্দকের কাছে গিয়ে আদেশ দেন—কণ্টককে (Kantaka) নিয়ে এস। "এত রাত্রে—অন্ধকার পথে—অশ্বারোহণ করবেন ?" প্রশ্ন করে ছন্ন। ছন্দকের নিষেধ ও অনুনয় উপেক্ষা ক'রে সিদ্ধার্থ কণ্টকের পৃষ্ঠে আরোহণ করে গৃহত্যাগ করেন। একে একে সমস্ত দ্বার নিঃশব্দে অর্গলমুক্ত হয়ে যায়।

অনোমা নদীর তীরে পৌঁছে সিদ্ধার্থ নেমে পড়েন, কণ্টককে চুম্বন করেন—। ছন্দকে বলেন—"তুমি যা' করলে এতে তোমার মঙ্গল হবে।—আমার অশ্ব, মুকুট, পরিচ্ছদ, অসিবন্ধ অসি, অসিছিন্ন, কেশগুচ্ছ রাজাকে নিয়ে দেবে এবং বলবে—সিদ্ধার্থ রাজচক্রবর্তীর চেয়েও বড় হয়ে ফিরে আসবে—আলোক নিয়ে ফিরে আসবে। বলবে—

"Since there is hope for man only in man, and none hath sought for this as I will seek who cast away my world to save my world."

পঞ্চম সর্গে—বৈভার-বিপুল্ল-তপোবন-শৈলগিরি-রত্নগিরি-বেষ্টিত রাজ-গৃহে (বিম্বিসারের রাজধানী) সিদ্ধার্থের অবস্থান—ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ—

রত্নগিরির গিরিগুহায় যোগী-ব্রহ্মচারী-ভিক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন সাধকের বসতি—তাঁদের কাছে সিদ্ধার্থের দেহজয়ের বা বাসনাক্ষয়ের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের কারণও স্বরূপ জিজ্ঞাসা—কঠোর তপস্যায় দেহকে শুষ্ক করে ব্রহ্মলাভের সাধনার প্রতি সিদ্ধার্থের বিরাগ—তাঁর ধারণা—দেহকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করলে দেহীর সাধনাই ব্যাহত হবে—। পথে যেতে যেতে শাবকহারা খোঁড়া মেষশাবকটিকে কাঁধে তুলে নেন—মেষপালককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানেন—রাজার পূজায় মেষ বলি হবে। মেষপালকের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থের গমন। নদী-তীরে পুত্রশোকার্তা রমণীর সঙ্গে দেখা—এর মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য মায়ের কাতর অনুরোধ—সিদ্ধার্থ ওষুধ তৈরির জন্য, যে বাড়ীতে কেউ কোনদিন মরেনি এমন বাড়ী থেকে একতোলা কালো সরষে আনবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন—কৃশা-গোতমী কোথাও সরষে পাননি—এই কথা জানালে সিদ্ধার্থ বলেন—যেখানে জীবন সেখানেই মৃত্যু ; এই মৃত্যু জয় করার জন্যই আমার সাধনা। তোমার পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করগে'।

* মেষপালকের সঙ্গে সঙ্গেই নগরীতে প্রবেশ—সৌম্যকান্তি সিদ্ধার্থকে দেখে জনপদবাসীর বিস্ময় ও ভক্তি—রাজার যজ্ঞ-গৃহে মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি—পশুবলির সমারোহ—রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—সিদ্ধার্থের আবির্ভাব—পশুদের গলরজ্জু খুলে দিয়ে, করুণার জন্য, হিংসা বন্ধ করবার জন্য কাতর আবেদন—পুরোহিতরা লজ্জিত—রাজা বিম্বিসারের কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ—সিদ্ধার্থের বিনয়-শক্তির কাছে সকলেই পরাভূত—পুরোহিত যজ্ঞাগ্নি এবং খড়্গ দূরে নিক্ষেপ করেন রাজা ঘোষণা করেন বলি নিষেধ। সব প্রাণ এক—যে করুণা করে সেই করুণা লাভ করে। বিম্বিসারকে দীক্ষিত ক'রে রাজগৃহ থেকে সিদ্ধার্থের গয়ায় গমন।—অলার, উদ্র ও পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা ও আলোচনা—জ্ঞানকাণ্ডের ও কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্তে সিদ্ধার্থের অতৃপ্তি।

ষষ্ঠ সর্গেঃ—গয়ায় নির্জনবাসে—দুঃখ, নিয়তি, শাস্ত্র-সূত্র, জন্মের কারণ, মৃত্যুর পরে আত্মার গতি, পুনর্জন্মের পূর্বে আত্মার অবস্থিতি প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা—চিন্তামগ্ন অবস্থায় ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মরণ—ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ অনাহারে শরীরের কৃশতা ও গ্লানি—মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা—*একদিন খররৌদ্রে এই অবস্থায় শায়িত মুদ্রিতচক্ষু সিদ্ধার্থকে দেখে মেষপালক বালক বৃক্ষপল্লব দিয়ে ছায়া তৈরি করে দেয়, ধীরে ধীরে ছাগদুগ্ধ পান করিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করে। সংজ্ঞা ফিরে এলে সিদ্ধার্থ ঘটির বাকী দুধটুকু চান, কিন্তু বালক শূদ্র বলে দিতে চায় না। সিদ্ধার্থ বলেন—দয়া ও দানই মানুষকে আত্মীয়তা সূত্রে যুক্ত করে। রক্তে সকলেই এক, মায়ের পেট থেকে কেউ তিলক বা উপবীত নিয়ে জন্মে না। যে সৎ কাজ করে সেই ব্রাহ্মণ, যে অসৎ কাজ করে সেই পাপী, আমাকে তুমি দুধ খেতে দেও।" বালক হৃষ্টচিত্তে দুধ দেয়।

*আর একদিন নগরীর ইন্দ্রদেবের মন্দিরের দেবদাসীরা ঐ পথে যাচ্ছে··· তাদের মধ্যে যে সেতার বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে সে তাঁর কাছে এসে গান ধরে—

"Fair goes the dancing when the Sitar's tuned
Tune us the Sitar neither low nor high,
And we will dance away the hearts of men
The string overstretched breaks and music flies
The string over slack is dumb, and music dies
Tune us the sitar neither low nor high."

সিদ্ধার্থের নতুন শিক্ষা হয়—জীবনের তার এত উচ্চগ্রামে বাঁধলে জীব বে-সুরো বাজবেই। প্রাণকে বাঁচাতেই হবে। *(সুজাতার কাহিনী)—পুত্রসন্তান কামনায় সুজাতার বনদেবতার কাছে মানসা—পুত্রজন্মের তিন মাস পরে মানসা শোধ করতে বহু ভোজ্যসামগ্রী নিয়ে বনদেবতার মন্দিরে গমন—সিদ্ধার্থকে সাক্ষাৎ দেবতা ব'লে ধারণা ও প্রণাম—দধি-দুগ্ধ পায়সান্ন ভোজ্য দানে আপ্যায়ন। আহার ক'রে সিদ্ধার্থের পুনর্জীবন লাভ। সিদ্ধার্থের

আত্মপরিচয় দান—সুজাতার গভীর ধর্মচেতনা—ন্যায়নিষ্ঠা সেবাপরায়ণতা। বোধিবৃক্ষের তলে সিদ্ধার্থের ধ্যান ও বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা—*তমোলোকের রাজা **মারের** সিদ্ধার্থের সাধনা পণ্ড করার চেষ্টা—জ্ঞানের ও আলোকের শত্রু অরাতি, তৃষ্ণা, রাগ ও তাদের অনুচর, মোহ, বিভীষিকা, অজ্ঞান, কাম সকলকে লেলিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের সাধনায় বাধা সৃষ্টির চেষ্টা—দশটি প্রধান পাপের উপস্থিতি ও বুদ্ধকে পরীক্ষা—(১) আত্মবাদ (অহংকার) (২) সংশয় (৩) শিলাব্বৎ-পরমাস (৪) কাম (৫) পতিঘ (ঘৃণা) (৬) রূপরাগ (৭) যশোরাগ (৮) মান (মদ) (৯) উদ্ধচ্ছ (ঔদ্ধত্য) (০) অবিদ্যা—সিদ্ধার্থের অটল সঙ্কল্পের কাছে সকলের পরাজয়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সম্বুদ্ধত্ব লাভ। অভিজ্ঞা লাভ—দুঃখ-সত্যের উপলব্ধি—সত্যোপলব্ধি—অবিদ্যা থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে নামরূপ, নামরূপ থেকে বেদনা—বাসনামাতৃকা—তৃষ্ণা—তৃষ্ণাক্ষয়ে ভবপরিক্রমার অবসান—স্কন্ধ থেকে নিষ্কৃতি সংসারচক্রে আবর্তনের পরিসমাপ্তি—নির্বাণ লাভ। এমনিভাবে সমস্ত পৃথিবীতে অহিংসার দিব্যজ্যোতি সঞ্চারিত হ'ল—।

৭ম সর্গে :—শুদ্ধোদন ও যশোধারার বিরহবিষণ্ণ ভোগবিরত দিনযাপন—ত্রিপুষ ভল্লুক প্রভৃতি বণিকদের মুখে সিদ্ধার্থের বার্তা—বুদ্ধত্বলাভের ও ধর্ম প্রচারের কাহিনী শ্রবণ—বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে বারাণসী গমন—পাঁচজন শিষ্যের দীক্ষা—ঋষিদের মধ্যে প্রথম দীক্ষিত হল—কৌণ্ডিণ্য, কৌণ্ডিণ্যের পরে ভদ্রক, অশ্বজিৎ, বাসব, মহনাম, রাজপুত্র যশ (৫৪ জন সহ)—মৃগবন ও ঋষিপত্তন থেকে যষ্টি ও বিম্বিসারের রাজধানীতে গমন—বেলুবনে অবস্থান—সেখানে রাজকৃত শিলালেখ :—

"যে ধর্ম হেতুপ্‌পভবা
যেষাম্ হেতুন্ তথাগতো
অহ যেষাঞ্চ যো নিরোধো
এবং বাদী মহাশ্রমনো

নযশত লোকের দীক্ষাগ্রহণ ও কাষায় বস্ত্র ধারণ—

ভিক্ষুসংঘে বুদ্ধের বাণী—উপসংহার বাণী :—

সব্ব পাপস্স অকরনম্

কুসলস্স উপসম্পদা

স চিত্ত পরিযোদপনম

এতন্ বুদ্ধানুশাসনম্।—

—বণিকদের মুখে ঐ সব বার্তা শুনে শুদ্ধোদন অমাত্যদের প্রেরণ করেন—নযজন বার্তাবহের মুখে শুদ্ধোদন বলে পাঠান—আজ দীর্ঘ সাত বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় আছি, মরার আগে তোমার মুখ দেখতে চাই'—যশোধারা বলে পাঠান—"তোমাদের দলের বাণী—রাহুলের মা, তোমার মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করছে"। যা হারিয়েছ, তার চেয়েও অধিক যদি কিছু পেয়ে থাক, তার ভাগ—আমার যা প্রাপ্য, রাহুলের যা প্রাপ্য—তা আমাদের দিয়ে যাও। বুদ্ধের বাণী শুনে সকলেরই বার্তা নিবেদন করতে ভুলে যায়।

শেষে রাজা সিদ্ধার্থের ক্রীড়াসঙ্গী উদয়ীকে পাঠান—উদয়ী তুলো দিয়ে কাণ বন্ধ করে সংঘারামে প্রবেশ করেন এবং রাজার ও যশোধারার কথা নিবেদন করেন—বুদ্ধ সম্মত হন।—কপিলবাস্তু অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয় রাজপথ কুসুমাস্তীর্ণ করা হয়—ন্যগ্রোধ আরামের মাঝখানে উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করা হয়—এই আরাম থেকে দক্ষিণ দিকের রাজপথ এবং লোকালয় অনেকখানি দেখা যায় *যশোধারা পাল্কিতে চড়ে নগর প্রাচীরের পাশে গিয়ে অপেক্ষা করেন—সন্ন্যাসী-বেশে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করতে করতে আগমন করেন—যশোধারার কাছে এলে, যশোধারা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ান—কৃতাঞ্জলি হ'য়ে অশ্রুপূর্ণ ও রুদ্ধকণ্ঠে 'প্রভু! সিদ্ধার্থ!' বলে সম্ভাষণ ক'রে পায়ের উপর পড়ে যান। বুদ্ধ তাঁকে ধরে তুলে প্রবোধবচনে সন্তুষ্ট করেন।—রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধের পরিধান ও আচরণের কথা শুনে ক্ষুব্ধ হন—বুদ্ধকে ভৎর্সনা করেন—প্রশ্ন করেন—এ সব কেন? বুদ্ধের উত্তর—আমার

জাতিধর্ম! আমার জন্ম বুদ্ধবংশে, আমি মহৈশ্বর্যের অধিকারী :—বুদ্ধের বাণী শুনে রাজার ও যশোধারার সান্ত্বনা লাভ—নতুন দৃষ্টি লাভ করে বুদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।

অষ্টম সর্গেঃ—শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ—রাজা, অমাত্যগণ, আনন্দ, দেবদত্ত, সারিপুত্র (Serijut) ও মৌগাল্যন (Mugallan) এবং অন্যান্য সকলে শ্রোতা—তাঁর জানুর উপরে কৌতূহলী রাহুল স্মিত-হাস্যে—পায়ের কাছে যশোধারা শান্তচিত্তে উপবিষ্ট—বাণী শ্রবণের লোভে দেব-নর পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলেই ব্যাকুল—

বুদ্ধের বাণীঃ—

*ওঁ অমিতায়! অমেয়কে পরিমাপ করতে যেয়ো না, অতলের মধ্যে চিন্তাসূত্রকে হারিয়ে ফেলো না। যে প্রশ্ন করে সে ভুল করে, যে উত্তর দেয় সেও ভুল করে—কিছুই বলতে যেয়ো না। * শাস্ত্রে আছে—আদিতে ছিল অন্ধকার আর ব্রহ্ম ছিলেন সেই অন্ধকারে ধ্যানস্থ। আদি বা ব্রহ্ম বা আলোক খুঁজতে যেয়ো না। *এই চোখে কে কি দেখবে? এই মন দিয়ে কে কি বুঝবে? অবগুণ্ঠনের পর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে এবং তার পরেও দেখা যাবে, তার পিছনেও অবগুণ্ঠন রয়েছে। শেষ নেই। *তারকারাজি বিরাজ করে, প্রশ্ন করে না। জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে, কারণ আছে—কার্য আছে—কাল আছে—সৃষ্টি স্থিতি-লয় আছে—এইটুকু বুঝলেই যথেষ্ট।

*অস্তিত্বের এক অবিরাম প্রবাহ—নিত্য পরিবর্তনশীল লহরী যেমন লহরীকে এগিয়ে নিয়ে যায়—এক হয়েও যেমন এক নয়—সুদূর উৎস থেকে বেরিয়ে সুদূর সাগর অভিমুখে যাত্রা—সূর্যের উত্তাপে বাষ্প হ'য়ে মেঘাকারে ধারণ ক'রে আবার জলে পরিণতি—অবিরাম আবর্তন। অবিরাম ঘূর্ণমান চক্র—কারো সাধ্য নেই গতিরোধ করে।

* প্রার্থনা করে কি হবে—অন্ধকার আলোকিত হবে না, মূক অন্ধকারের

কাছে কিছু চেয়ো না। কৃচ্ছ্রসাধন করেও কোন ফল পাবে না স্তবস্তুতি ও নৈবেদ্য দিয়ে নিরুপায় দেবতাদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করো না—পশু বলি দিয়ে দেবতাদের ঘুষ দিতে যেয়ো না। মুক্তির উপায় তোমার ভিতরেই আছে—তোমার জীবনেই তোমার কারাগার। যে যেমন কর্ম করে তেমন সে ফলভোগ করে। সবই অস্থির—পরিবর্তনশীল। কালক্রমে পুণ্য ক্ষয় পায়, পাপ স্খলিত হয়।—কর্মগুণে ভৃত্য রাজা হতে পারে, রাজা দীন ভিক্ষুক হতে পারে। কর্মগুণে তুমি ইন্দ্রের চেয়েও বড় হতে পার; কর্মদোষে কীট হয়ে জন্মাতে পার। অদৃশ্য চক্র অবিরাম ঘুরছে—বিরাম নেই, উপশম নেই, স্থিতির অবকাশ নেই। ... ...

কিন্তু এই চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই যদি না থাকত, তাহলে জীবন অভিশাপের নামান্তর,—দুঃখময় এই অস্তিত্ব। তা' নয়, তুমি বদ্ধ নও, অস্তিত্ব অমৃতময়; বিপরিণামশীল জগতের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে—ধ্রুব স্থিতি। দুঃখের চেয়েও বড়—ইচ্ছাশক্তি। এর বলেই শিব থেকে শিবতর, শিবতর থেকে শিবতমকে লাভ করা যায়* আমি সেই বিরাট সত্যকে দেখেছি এবং তোমাদের দেখাব যা ব্রহ্মের চেয়েও বড়—যা **অনাদি ও অনন্ত এক মহাবিধান** গোলাপে গোলাপে তারই স্পর্শ, কমলপত্রে তারই হাতের ছাঁচ, মাটির অন্ধকার গর্ভে বীজের নীরবতায়, সে বসন্তের উত্তরীয় বয়ন করে। বিচিত্রবর্ণ মেঘে মেঘে তার আলপনা। ময়ূরপুচ্ছে তারই মরকত মণি। তারায় তারায় তার বিরামভূমি, বিদ্যুত, ঝড়-বৃষ্টি তারই ভৃত্য। সেই মহাবিধানের সূত্রেই মানুষের হৃদয়-মন বাঁধা। প্রেম দিয়ে এর প্রাণকেন্দ্র গঠিত, এর পরিণতিতে শান্তি ও অমৃত। তৃষ্ণা—রক্ত থেকে কামনাবীজ ও সংস্কার, নষ্ট করতে পারলেই—জন্মসম্ভাবনা তিরোহিত হবে—জীবনের হিসাব-নিকাশ (life count closed) শেষ হ'য়ে যাবে—নির্বাণ লাভ করবে—ওঁ মণিপদ্মে ওম্।

এরই নাম **কর্মবাদ**। শুভ্রজ্যোতি দীপবর্তিকার নির্বাণের মতো জীবন যখন মৃত্যুপরিণাম লাভ করে তখন মৃত্যুও সেই সঙ্গে মরে।* এ কথা বলো

না—'আমি আছি', আমি ছিলাম', 'আমি থাকব'; মনে করো না তুমি এক দেহ থেকে আর এক দেহে সঞ্চারিত হ'তে হ'তে চলেছ। জীবনের সংস্কার—অবশেষ থেকেই নতুন করে আয়তন গড়ে উঠে, যেমন করে গুটিপোকা গুটি তৈরি ক'রে তার মধ্যে বাস করে। সংস্কারই ধীরে ধীরে আকৃতি-প্রকৃতি হয়ে দেখা দেয় যেমন সাপের ডিম ফুটলে সাপের আকৃতি ও ফণা দেখা দেয়, যেমন কাশের বীজ উড়ে বেড়ায় এবং ভিজে মাটি পেয়ে অঙ্কুরিত হয়। যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক, তারা এই চারটি আর্য সত্যকে গ্রহণ কর—(১) দুঃখ (২) দুঃখের কারণ (৩) দুঃখ নিবৃত্তি (৪) নিবৃত্তির উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ :—পঞ্চশীল আচরণ কর ... ...

*—বাণী শ্রবণের পরে শুদ্ধোদনের নতজানু হয়ে পুত্রের কাছে দীক্ষাগ্রহণ—যশোধারার আবেদন—রাহুলকে তোমার এই জ্ঞানরাজ্যের উত্তরাধিকার দান কর।'

এর পর '৪৫ বৎসর বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করেন এবং নির্বাণ লাভ করে পরম শান্তি লাভ করেন।

বুদ্ধচরিত নাটকে উপাদান প্রয়োগ

"Light of Asia"—নামক কাব্যখানি অবলম্বনে বুদ্ধচরিত নাটক রচিত—এ কথা উৎসর্গ-পত্রেই নাট্যকার বলে দিয়েছেন; সুতরাং তা' সমালোচকের আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে না। সমালোচক শুধু মিলিয়ে দেখতে পারেন—ঘটনাবিন্যাসে নাট্যকার কাব্যের ক্রমটি অনুসরণ করেছেন কি না, ঘটনাবিন্যাসে ও অন্যবিষয়ে তিনি অন্যথা কল্পনার সুযোগ নিয়েছেন কি না, নিলে কতখানি নিয়েছেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি কাব্যের 'রূপ ও রস'কে নাটকীয় করতে পেরেছেন কিনা। প্রথমে আমরা বুদ্ধচরিত ও 'লাইট অফ এশিয়া'র ঘটনা-ক্রম মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে পারি :—

(১) বুদ্ধচরিত নাটকের কার্য—উপস্থাপনা লক্ষ্য করলে দেখা যায়—নাট্যকার বুদ্ধের জন্মের 'সূচনা' থেকে 'কার্য' আরম্ভ করেছেন। Light of Asia-গ্রন্থেও এমনি একটা 'সূচনা' অংশ আছে এবং তা'তে দেবতাদের দিয়ে, বুদ্ধের কাছে পুনর্জন্মগ্রহণের জন্য স্তবস্তুতি করানো হয়েছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, দুই সূচনা মূলতই পৃথক। নাটকে যে 'সূচনা' তৈরি করা হয়েছে, তা'তে বুদ্ধকে বিষ্ণু-অবতার রূপে দেখানো হ'য়েছে—দশ অবতারের অন্যতম রূপে অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের বিপরীত আলোকে রেখে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর মুখে "অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম আমি' বসানো

বা "একা আমি নাহি অন্যজন
ব্যোম সমীরণ, তপন সলিল স্থল
আমিই সকল--
মায়ারূপে নানা রূপ করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান
আমি মন প্রাণ, আমি দয়া
আমি নিষ্ঠুরতা
আমি ভক্ত আমিই ঈশ্বর—বসানো, বা বিষ্ণুর বিরাট মূর্তি ধারণ অবৌদ্ধ দর্শনের পরিবেশে যতটা শোভা পায়, বুদ্ধ-চরিতের সূচনায় তেমন শোভা পায় না। নাট্যকার এখানে বৌদ্ধধর্মের পৌরাণিকীকৃত রূপটিই গ্রহণ করেছেন; ফলে নাটকখানি রীতিমতো একখানি পৌরাণিক নাটকে পরিণত হয়েছে। দয়ার প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু বুদ্ধ-অবতার হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—

বিদ্যাদর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ
অস্ত্র বলে না হবে শাসন
সে দর্প দমিব বিদ্যা বলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে পথহারা নর

ধর্মে ভরি', করে সবে নিষ্ঠুর আচার
নব বিধি করিয়ে প্রচার
ভ্রম দূর করিব সবার
'অহিংসা পরম ধর্ম' করিব ঘোষণা
যুক্তি বলে বিমুখি সকলে
জ্ঞানজ্যোতি করিব বিকাশ।

প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে—এবং দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, নাট্যকার বুদ্ধের জন্ম এবং জননী মহামায়ার মৃত্যু এই দুইটি ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন। প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্য—প্রমোদকানন—প্রথমেই * নালক ও শ্রীকালদেবল এই দুইটি কল্পিত চরিত্রের সংলাপের সাহায্যে **'মহামায়ার স্বপ্নদর্শন'** বৃত্তান্তটি পরোক্ষ-ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। (স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনতে শ্রীকালদেবের মহেশ্বরের কাছে যাওয়ার কথা 'লাইট অফ এশিয়া'তে নেই) এবং তাদের প্রস্তাবকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে পাত্র-পাত্রী (মহামায়া, সখিগণ, বাহকবৃন্দ ও রাজদূত-গণের) প্রবেশ করিয়েছেন। *মহামায়া ও সখিগণ সামান্য আলাপের পরে প্রস্থান করেছেন। প্রবেশ করেছে—**মার, আত্মবোধ ও সন্দেহ**। (এই ঘটনা এখানে প্রক্ষিপ্ত। ঘটনাটি আছে ৬ষ্ঠ সর্গে—যেখানে বুদ্ধের সাধনা পণ্ড করার জন্য দশ প্রধান পাপ চেষ্টা করেছে)। এই পাপগুলি রাণীর গর্ভ অধঃপাতে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে—সখীরা রাণীকে নিয়ে পুরীর ভিতর প্রস্থান করেছে॥ *গণকদ্বয়ের প্রবেশ ও দু' একটি সরস টিপ্পনি ক'রে রাজ-সভায় যাওয়ার জন্য প্রস্থান—নাট্যকারের কল্পনা—তবে অপ্রয়োজনীয়।

*রাজা শুদ্ধোদন ও মন্ত্রীর প্রবেশ—কথোপকথন—উৎসবের দিনেও রাজার মনে অহেতুক ভয়ের সঞ্চার হয়—পুত্র-সন্তানের জন্য ঐকান্তিক কামনা, কিন্তু তার সঙ্গে 'দূরে অমঙ্গল ছায়াও' দেখেন। শ্রীকালদেবলের বিশেষ সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রবেশ—তা গোপনে প্রকাশ্য ব'লে রাজা মন্ত্রীকে রাজ্ঞীর সংবাদ আনতে পাঠিয়ে দেন। শ্রীকালদেবল জানান—'বুদ্ধ অবতার হবেন তনয়রূপে

তব।……তবে অবিমিশ্র সুখ নাহি ধরাতলে……বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে……হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রহে মহারাজ।"—মন্ত্রী প্রবেশ করে বুদ্ধের জন্ম এবং রাণীর মূর্চ্ছার সংবাদ নিবেদন করেন,—রাজা ও শ্রীকালদেবল যাওয়ার উদ্যম করতেই দূত প্রবেশ করে—রাণীর মৃত্যু-সংবাদ—এবং নব শিশুর অলৌকিক ক্রিয়ার সংবাদ জানায়। রাজার আক্ষেপ ও বেগে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভাঙ্ক শেষ হয়। * [এই অংশে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে– তা লাইট অফ এশিয়ার সঙ্গে মেলে না। রাণী উপবনে পুত্র প্রসব করেছেন এ সংবাদ রাজপ্রাসাদে পৌঁছলে তাকে প্রাসাদে আনার জন্য পাল্‌কী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই পালকী বহন করতে—সুমেরু পর্বত থেকে দিকপালরা নেমে আসেন এবং ছদ্মবেশে পাল্‌কী বহন করেন। রাজা শুদ্ধোদন উৎসবের আদেশ দেন—দেশবিদেশ থেকে বণিকরা নানা উপঢৌকন নিয়ে আসেন—পুত্রের নাম রাখেন 'সিদ্ধার্থ'। বৃদ্ধ সাধু অসিতের পায়ের কাছে শিশুকে রাখতে গেলে অসিত সঙ্কোচের সঙ্গে নিষেধ করেন—বলেন—"হে শিশু। তোমাকে আমি প্রণাম করি। তুমিই সেই—তুমিই বুদ্ধ… রাজা! তুমি ধন্য, তোমার বংশ ধন্য। তবে এই পুত্রের জন্যই তোমার বুকে শেল বিদ্ধ হবে—রাণী! সাতদিনের মধ্যেই তুমি সর্ব দুঃখমুক্ত হবে।' (৭ দিনের দিন রাণী প্রাণ ত্যাগ করেন]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রমোদ-কাননের অপর পার্শ্বে, শ্রীকালদেবল শুদ্ধোদনকে বুদ্ধের দিব্য রূপ প্রদর্শন করান। দেবদেবীগণের প্রবেশে ও গীতে —বুদ্ধের অবতারত্ব ষোলকলায় পূর্ণ হয়।—দিব্যজ্যোতির মণ্ডলটি আরো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবটুকু কৌতূহলই এখানে মেটানো হয়েছে—এরপর নাটকের কার্যাবলী—শুধু—জ্ঞাত বিষয়েরই পুনর্জ্ঞান— Rediscovery of the known.

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—নাট্যকার দেববালাদ্বয়ের বার্তাজ্ঞাপক সংলাপের ভিতর দিয়ে, সিদ্ধার্থের মায়ের মৃত্যুর পর থেকে, বিমাতা গৌতমীর

লালনপালন—জ্যোতির্বেত্তাগণের গণনা—সিদ্ধার্থের শিক্ষাদীক্ষা - আশৈশব ভাবুকতা, চিত্তের সহজ অনুকম্পা—পুত্রের ঔদাস্য দেখে শুদ্ধোদনের দুশ্চিন্তা সিদ্ধার্থের বিবাহ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা—সুন্দরী মেলা থেকে গোপার নির্বাচন—(স্বয়ংবর প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত)—পুত্রের জন্য প্রমোদ-আগার নির্মাণ—প্রভৃতি সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন এবং ইন্দ্রদেব যে উদ্দেশ্যে (সিদ্ধার্থের মোহ দূর করবার জন্য) দেববালাদ্বয়কে প্রেরণ করেছেন – তাও ব্যক্ত করেছেন। দেববালাদ্বয়ের কল্পনা—'Light of Asia'-তে না থাকলেও 'Light o' Asia'র অভিপ্রায়ের সঙ্গে কল্পনার তেমন বিরোধ নেই। কারণ বীণার সঙ্গীতে সিদ্ধার্থ—heard the Devas play' (তবে জনৈক মন্ত্রীর সঙ্গে দেববালাদ্বয় যে ভাবে আচরণ করেছে—সহচরী হওয়ার বাসনা মনে মনে পোষণ করেই বিনা নিয়োগেই প্রমোদকাননে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, তা' সমুচিত ঘটনা ব'লে স্বীকার করা যায় না।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—উপবনে সিদ্ধার্থ ও গোপা। সিদ্ধার্থের এবং গোপার প্রাণ পূর্ণ মিলনের আলোকের মধ্যেও ছায়াচ্ছন্ন। দুঃস্বপ্নের ছায়া যেয়েও যেতে চায় না। দেববালার গীতে সিদ্ধার্থের ভাবান্তর ঘটে। বহির্বিশ্ব দেখার ঐকান্তিক সাধ জাগে—প্রাণীর দুঃখ দূর করবার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে। সেই মহাব্রতে পত্নীর উৎসাহ চান। (এ পর্যন্ত মোটামুটি তৃতীয় সর্গের প্রথমাংশ অনুসরণ করাই হয়েছে) *তবে সিদ্ধার্থের সঙ্গে শুদ্ধোদনের নগর ভ্রমণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা লাইট অফ-এশিয়াতে নেই। আর যা আছে তা'কে নতুন যোজনা বলা যায় না। (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে তৃতীয় সর্গের প্রথমাংশ হয়েছে—Thus Suddhodana Commands—পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছে)।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—তৃতীয় সর্গের বাকী অংশ (নগর পথে বৃদ্ধ, রুগ্ন মৃত সন্ন্যাসী দেখে সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য) প্রদর্শিত হয়েছে। 'লাইট

অফ এশিয়াতে একদিনে সব দৃশ্য দেখানো হয়নি। এখানেই শুদ্ধোদনের দুঃস্বপ্নের ও স্বপ্নব্যাখ্যার বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—কক্ষে শুদ্ধোদন, মন্ত্রী ও পণ্ডিত। এই দৃশ্যটি কল্পিত। মূল গ্রন্থে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকার ও পুত্রের গৃহত্যাগের অনুমতি গ্রহণ বর্ণনা করা হয়নি। তৃতীয় সর্গের দুঃস্বপ্নটিকে এই গর্ভাঙ্কে নাট্যকার শুদ্ধোদনের উন্মত্ত প্রলাপের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন এবং পণ্ডিতের উক্তির সাহায্যে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ (চতুর্থ সর্গের বিবরণ) প্রদর্শিত। বিবরণটিকে খুব যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। 'লাইট অফ এশিয়া'-র এই দৃশ্যে যে গভীর ভাবদ্বন্দ্বের– জীবনের যে গভীর আলোড়নের ছবি ফুটে উঠেছে নাটকে তা' পাওয়া যায় না। তারপর কাব্যে বিদায়ের পরে, গোপা শুদ্ধোদন ও গৌতমীর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়নি। নাটকে গোপার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, শুদ্ধোদন-গোতমীর বিলাপ ও উন্মত্তভাব প্রভৃতি দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—প্রথমতঃ গৃহত্যাগের ও সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছয় বৎসর অবধি কৃচ্ছ্রসাধনার রূপ 'পরোক্ষভাবে অর্থাৎ শিষ্যদ্বয়ের রসিকতার ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম সর্গে প্রথমাংশে যা বর্ণিত হয়েছে, তা' এখানে প্রদর্শিত বা উল্লিখিত হয়নি।

বিভিন্নপন্থী সাধকদের সঙ্গে সিদ্ধার্থের আলোচনা— তাঁদের উত্তরে পরিতৃপ্তি না পাওয়া—এই সব ঘটনা নাট্যকার এক লাফে পার হয়ে গিয়ে- কৃচ্ছ্রসাধনার শেষ অবস্থা থেকে দৃশ্য আরম্ভ করেছেন। এই কারণেই আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনাকে আগে উপস্থাপনা করেছেন কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম সর্গে—রাখালের সঙ্গে দেখা এবং তার সঙ্গে রাজা বিম্বিসারের যজ্ঞ স্থলে যাওয়া, বলি বন্ধ করা এবং যাওয়ার পথে—জনৈকা স্ত্রীলোকের—(যাকে কৃষ্ণ তিল সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন) সঙ্গে দেখা বর্ণনা করা হয়েছে; সুজাতার

কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে ষষ্ঠ সর্গের প্রথমাংশে। নাট্যকার প্রথম গর্ভাঙ্কে সুজাতার বৃত্তান্ত শেষ করে—রাখালের সঙ্গে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎকার এবং রাখালের সঙ্গে রাজবাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প উপস্থাপনা করেছেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য রাজার পূজাগৃহ সম্মুখে কালীমূর্তি, বিম্বিসার, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদ্বয়। এই দৃশ্যে বলি অর্থাৎ জীবহিংসা বন্ধ করার জন্য সিদ্ধার্থ চেষ্টা করেছেন এবং বিম্বিসারকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। 'লাইট-অফ-এশিয়া' গ্রন্থে বিম্বিসার যজ্ঞ করেছেন। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য অগ্নিতে ঘি ও সোমরস ঢালা হয়েছে—পশুবলি দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করা হয়েছে, "কালীমূর্তি" সেখানে নেই। নাটকের কালীমূর্তি নাট্যকারেরই মন গড়া। শক্তি পূজার সঙ্গে, বিশেষত কালীপূজার সঙ্গে পশুবলির অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে বলেই, এরূপ কল্পনা দেখা দিয়েছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—পুত্রশোকাতুর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্য। নতুন ক'রে মৃত্যুর বেদনা উপলব্ধি—জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করার সঙ্কল্প গ্রহণ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—বোধিস্বত্বলাভ। সিদ্ধার্থের সাধনা, সাধনা পণ্ড করার জন্য 'মার', 'সন্দেহ' কুসংস্কার, রাগ, অরাতি, কাম, ও গোপার বেশে রতি প্রভৃতি বিঘ্নকারিগণের উৎপাত এবং শেষ পর্যন্ত পরাজয়—সিদ্ধার্থের বোধিস্বত্ব লাভ উপস্থাপনা করা হয়েছে। কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের শেষাংশে—অর্থাৎ সুজাতা বৃত্তান্তের পরবর্তী অংশে রয়েছে—সিদ্ধার্থের সাধনা পণ্ড করার জন্য 'মার' অরাতি, তৃষ্ণা, রাগ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রাণপণ চেষ্টা করে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত সমস্ত রকম উৎপাত সৃষ্টি করেও তারা কিছু করতে পারে না। একে একে দশটি পাপ—'আত্মবাদ', সংশয়, 'শীলব্বৎ-পরমাস (Silabbat-Paramasa) বা কুসংস্কার, কাম, পতিঘ (ঘৃণা) রূপরাগ, যশোরাগ, অরূপ-রাগ, মান, অবিদ্যা বুদ্ধকে প্রলুব্ধ ও বিক্ষুব্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে সিদ্ধার্থ

বোধিসত্ত্ব লাভ করেন এবং বুদ্ধত্বলাভের পর সর্বপ্রথম এই বাণী উচ্চারণ করেন—অনেক জাতি সংসারং········(প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

পঞ্চম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে—বুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ও গৃহীদের প্রতিক্রিয়া—বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্য দস্যু নিয়োগের চেষ্টা—দস্যুর হিংসা ত্যাগ করে বুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ—ব্রাহ্মণ ও বণিকের ক্ষমা প্রার্থনা *কাব্য-গ্রন্থে (লা. অ. এ.) এরূপ কোন ঘটনার বর্ণনা নেই নাট্যকার বোধ হয়—'The slayer hid his knife, the robber laid his plunder back ·····' এই তথ্যটুকু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে (বুদ্ধজীবনী-কথিত) প্রতিক্রিয়ার দৃশ্যটি রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য কপিলবাস্তুতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে—বুদ্ধকে কপিলবাস্তুতে নিয়ে গিয়ে গৌতমী ও শুদ্ধোদনের সঙ্গে মিলিত করা হয়েছে—বুদ্ধের উপদেশে শুদ্ধোদন মায়া ত্যাগ করে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেছেন—গৌতমী "নূতন সংসার" দেখে আনন্দিত হয়েছেন। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—গোপার এবং রাহুলের ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ—রাহুলের সঙ্গী বালকগণেরও রাহুলের অনুগমন।

*লাইট-অফ-এশিয়া'-তে বুদ্ধের কপিলবাস্তু আগমনের এবং পিতা-মাতা-পত্নী-পুত্রের সঙ্গে মিলনের বৃত্তান্ত অন্যভাবে বর্ণিত আছে। (কাব্যগ্রন্থের অষ্টম সর্গের বিবরণ দ্রষ্টব্য)

এবার, কাব্য-বর্ণিত উপাদানের সংযোজন বা ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু' একটি কথা ব'লে, নাটকের বৃত্তবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

'লাইট অফ এশিয়া'—বুদ্ধচরিতের কাব্য-রূপ—শ্রব্য-কাব্য-রূপ। অর্থাৎ কাব্যে বুদ্ধ-জীবনের বিভিন্ন পর্বের ঘটনারাজিকে, একটা রসাত্মক পরিণতি দেওয়ার জন্য, সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস বা উপস্থাপনা করা হ'য়েছে—চরিতকে কাব্যে বিপরিণত করা হ'য়েছে! নাট্যকার সেই শ্রব্য-কাব্যকেই দৃশ্যকাব্যের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন—একজাতীয় কাব্য থেকে অন্য

জাতীয় কাব্য রচনা করেছেন। এখানে নাট্যকারের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব শ্রব্যবৃত্তকে দৃশ্যবৃত্তে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব ও কৃতিত্ব (ইংরেজিতে যা'কে বলা হয় dramatization' এবং বাংলায় বলা হয় 'নাট্যরূপ')। শ্রব্যকাব্যের কবি এবং দৃশ্যকাব্যের কবি উভয়েই জীবন-সত্যের রসরূপ গড়তে চান বটে, কিন্তু উভয়ের রীতি এক নয় ব'লেই উভয়ের কর্মকৌশলও এক নয়। শ্রব্যাকারে উপস্থাপিত কাহিনীর যে বিরাট বিস্তার বা দেশ-কাল-ব্যাপ্তি (Canvas) সম্ভব, দৃশ্যাকারে উপস্থাপিত কাহিনীর পক্ষে তত বিশাল বিস্তার বা ব্যাপ্তি সম্ভব নয়। যদিও প্রত্যেক নাটকই কোন-না-কোন বিশেষ কাহিনীর নাট্যরূপ, তবু নাটকে কাহিনীর সবটুকু দৃশ্য ক'রে তোলা চলে না। Clayton Hamilton-এর মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলা যেতে পারে—Every play is a dramatization of a story that covers a larger Canvas than the play itself………" নাটকে যেটুকু দৃশ্য করা হয়, তার চেয়ে অনেকখানি আনতে হয় পরোক্ষভাবে। এখানেই নাট্যকারের বিশেষ প্রতিভার ক্ষেত্র। কাহিনীর অদৃশ্য অংশকে দৃশ্যের মধ্যে অবিরোধে এবং সমুচিতভাবে স্থান ক'রে দেওয়া তথা কাহিনীর প্রবাহ বা ধারা (Continuity) রক্ষা করার, বীজ-স্থাপনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত কার্য-ধারার মধ্যে একটা ঊর্ধ্ব টান (Progression) অক্ষুণ্ণ রাখার সামর্থ্যের মধ্যেই নাট্যকারের সৃষ্টিশক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। এই কারণেই শ্রব্যকাব্যকে দৃশ্যবন্ধে রূপান্তরিত করতে গেলেও নাট্যকারকে ঘটনা-নির্বাচনে ও উপস্থাপনায়, গ্রহণ-বর্জনের, পরিমার্জন-পরিবর্দ্ধনের স্বাধীনতা ও সুযোগ গ্রহণ করতে হয়। শ্রদ্ধেয় জন হাউয়ার্ড লসনের ভাষায় বলা যায়—"insofar as the dramatist only transposes material from one medium to another he is merely a literary hack"……But the creattive dramatist can not be satisfied with the repetion of dialogue or situations; having selected a novel or a biography or a historical event, he proceeds

to analyse this meterial and to define the root-action which expresses his dramatic purpose ; in developing and remoulding the material, he draws on the whole range of his Knowledge and experience ("The process of Selections" —Chap—Theory and Technique of play-writing)। স্বষ্টিক্ষম নাট্যকার মাছি-মারা কেরাণী ন'ন। তিনি যেমন ঘটনার ক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করেন না, তেমনি শ্রব্যকাব্যের বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবকেও যথাযথভাবে অনুকরণ করেন না। কিন্তু তিনি যাই করুন অর্থাৎ যে নতুন দৃশ্য-পরিকল্পনাই করুন, এবং চরিত্রের যে নতুন আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক আচরণই কল্পনা করুন, সব ক্রিয়াকলাপের মূল্য নির্ভর ক'রবে উপস্থাপনার নাটকীয় উৎকর্ষের তারতম্যের উপরেই। নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার যদি উপস্থাপ্যবিষয়ে—"broadening of its intellectual scope, emotional depth, poetic richness, technical variety and structural grace"—ঘটাতে না পারেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই সেই নাট্যরূপকে উৎকৃষ্ট স্বষ্টি ব'লে প্রশংসা করা চলে না। আরো একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং সে কথাটা এই যে নাট্য-রূপ (নভেলেরই হোক, জীবনচরিতেরই হোক আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনারই হোক) যে পরিমাণে জীবন-সম্পর্কের বাস্তবিক রূপ থেকে দূরে সরে যায়—(পাত্র-পাত্রীর আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক আচরণে কৃত্রিমতা বেশী ফুটে উঠলেই বাস্তবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়), সেই পরিমাণে তার নাটকত্বেরও হানি ঘটে। শ্রব্যকাব্যের বর্ণনা-সম্ভৃত কল্পনারঞ্জিত এবং পরিব্যাপ্ত পরোক্ষ রূপকে দৃশ্যকাব্যের বাস্তবিককল্প সংহত এবং প্রত্যক্ষ রূপের বা আচরণের স্তরে নামিয়ে আনতে না পারলে, লৌকিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, জীবনসংগ্রামের মায়া স্বষ্টি করতে না পারলে, রচনা আর যাই হোক, প্রকৃত নাটক হয়ে উঠে না। যথার্থ নাটক এবং যথার্থ উপন্যাসের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে ফার্ডিনাণ্ড ব্রুনেতিয়েরে যা' বলেছেন

—তার তাৎপর্য এই যে, যেহেতু নাটকের ধর্ম হ'চ্ছে দৃশ্যত্ব, নাটকে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সংগ্রামের বা বুঝাপড়ার প্রত্যক্ষ রূপ উপস্থাপিত হয়, যথার্থ নাটকের উপস্থাপনায় পাত্র-পাত্রীর আচরণই বড় কথা, বর্ণনা-বিশ্লেষণের অবকাশ সেখানে কম, নেই বল্‌লেও চলে। নাটকে জীবনের অভিব্যক্তির দৃশ্য, উপন্যাসে জীবনের বর্ণনাও বিশ্লেষণ। জীবনের অভিব্যক্তি না হ'য়ে রচনা যে পরিমাণে জীবনের বর্ণনা-বিশ্লেষণ হ'য়ে উঠে, সেই পরিমাণেই তা' উপন্যাসের ধর্ম লাভ করে। উক্তিপ্রত্যুক্তিবন্ধে, অর্থাৎ দৃশ্যাকারে রচিত হ'লেও তা' শ্রব্য-ধর্মী। বাস্তবিক শ্রব্যকাব্যের সঙ্গে দৃশ্যকাব্যের মৌলিক পার্থক্য এখানেই—জীবনের রূপকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষবৎ ক'রে উপস্থাপনা করার মধ্যে।

বুদ্ধচরিত-নাটকে 'লাইট-অফ-এশিয়া'র যে নাট্যরূপ ব্যক্ত হয়েছে, তা' পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে, নাট্যকার কাব্যবর্ণিত পরিস্থিতিগুলি এবং পরিস্থিতিনিহিত বাস্তবিকতাটুকু ভালভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। পরি-স্থিতির বাস্তবিকতাটুকু ব্যবহার করতে পারেননি—এ কথার অর্থ এই যে কাব্যের পরিস্থিতিতে পাত্র-পাত্রীরা যেভাবে আচরণ করেছে, তা'তে জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ অধিকতর মাত্রায় ব্যক্ত হ'য়েছে; কিন্তু নাটকের পাত্র-পাত্রীর আচরণে—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ততখানি বাস্তবিকতার মাত্রা পাওয়া যায় না; অথচ নাটকেই—জীবনের দৃশ্য রসরূপেই—স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপটি বেশী ক'রে ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। নাট্যরূপ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলেই এ বিষয়ের উপসংহার করছি। নাট্যরূপের মধ্যে নাট্য-কারের নির্বাচন-শক্তির (process of selection) তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায় না। কাব্যে যেমন বুদ্ধজন্মের সূচনা থেকে কাহিনী আরম্ভ করা হ'য়েছে, নাটকেও তেমনি সূচনা থেকে. প্রকৃত আরম্ভ এবং তারপর জন্ম, জন্মের পরে (যদিও দীর্ঘ ব্যবধানে)—যৌবন, এমনি পর পর (দু'একস্থলে আগের ঘটনাকে পরে এবং পরের ঘটনাকে আগে) ঘটনা সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে শ্রব্য কাব্যের বুদ্ধ

কাহিনীর 'Canvas' এবং নাটকের 'Canvas' আয়তনে সমানই আছে; দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য যা আছে তা' এই যে শ্রব্য কাব্যে যে পরিমাণ কথা-বস্তুর স্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, দৃশ্যকাব্যে তা হয়নি। শ্রব্য কাব্যের শিল্পী তাঁর 'Canvas' যেভাবে পূর্ণ করতে পেরেছেন, দৃশ্যকাব্যের কবি সে ভাবে পূর্ণ করতে পারেননি। ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে বড় বড় ফাঁক থেকে গেছে। গঠন সমালোচনার সময় এ কথাটা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

গঠন-বিচার

বুদ্ধদেব-চরিত নাটকের গটন বিচার করতে অগ্রসর হয়ে প্রথমেই এই কথাটা মনে আসে যে নাট্যকার শ্রব্যকাব্যের 'Canvas'—ব্যবহার করেই দৃশ্যকাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন। নির্বাচন-বুদ্ধির কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে, ঘটনাবলীকে অল্পকালের বলয়ের বা আয়তনের মধ্যে সংহত করে নিতে চেষ্টা করেননি। তা' করেননি ব'লেই প্রারম্ভিক ঘটনা-নির্বাচনে (Selection) এবং সমগ্র অতীতকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে কার্যারম্ভ (exposition) করার মধ্যে যে কবি-প্রতিভা বা সংগঠন-শক্তি প্রকাশ পায়, তার কোন পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। যে আরম্ভের আগে আর কোন আরম্ভ কল্পনা করা যায়না, নাট্যকার সেখান থেকেই আরম্ভ ক'রেছেন—বুদ্ধজন্মের সূচনা থেকে সুরু করেছেন এবং সেই সুরু থেকে অগত্যা লাফে লাফে বিভিন্ন পর্ব লঙ্ঘন ক'রে শেষ পর্যায়ে পৌচেছেন। এইরূপ আরম্ভের যা' অনিবার্য পরিণাম তাই ঘটেছে—নাটকের কার্য বহুকালব্যাপী হ'য়ে পড়ায়, কার্যের ক্রমবিকাশের ধারায় সুষম কালব্যবধান এবং ক্রমপরিণতির (Progression) রূপ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ফলে, বৃত্তে অর্থাৎ ঘটনা সমাবেশে শৈথিল্য এবং পরিপাটি অঙ্গাঙ্গিযোগেয় অভাব দেখা দিয়েছে। 'এপিসোডিক প্লট'-এর মতো এখানেও ঘটনাগুলি কার্যকারণ-ন্যায়ে না ঘটে, একের পর এক ঘটে গেছে।

কাহিনীর মধ্যে একটা লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু এই চেষ্টা এমন সচেতন চেষ্টা নয় যা'তে বলা যেতে পারে—নাটকের root-idea বা premise—আকর্ষণ কেন্দ্রের মতো সমস্ত ঘটনাকে আপনার কেন্দ্রে আকৃষ্ট করে রেখে দিয়েছে—সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়ে উদ্দেশ্যের টান (pull) সুস্পষ্ট মাত্রায় উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা-বিন্যাসকে এমন একটি 'শক্তিক্ষেত্রে' পরিণত করা সম্ভব হয়নি, যেখানে আগের ঘটনার চাপে (push) পরের ঘটনা এগিয়ে যাচ্ছে এবং পরের ঘটনা আগের ঘটনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যের অভিমুখে। এই আদর্শ গঠন না থাকলে বৃত্তকে নাটকীয় বলা চলবে কি ? শ্রব্য কাব্যের 'Canvas'-এ দৃশ্যকাব্য রচনা করলে তাকে নাটক বলা হবে কি ?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত, এই জাতীয় গঠন নাটকীয় কি অনাটকীয় এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ; আর উত্তর দিতে গেলে ক্লাসিকাল ঐক্যের সংস্কার এবং রোমাণ্টিক ঐক্যের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেই হ'বে। এ কথা ঠিক বটে—আজ আমরা ক্লাসিকাল ঐক্যের সংস্কার নিয়ে নাটকের ঐক্য বিচার করতে যাইনে এবং এ কথাও ঠিক—"structural union of the parts being such that, if any one of them is displaced or removed, the whole will be disjointed and disturbed, for a thing whose presence or absence makes no visible difference, is not an organic part of the whole"—এরিষ্টটলের এই সূত্র আজ অক্ষরে অক্ষরে মানতে চাইনে (মানলে অনেক বড় বড় নাট্যকার রেহাই পাবেন না), আজ আমরা বহুর-সমবায়ে যে জটিল এবং যৌগিক ঐক্য সেই 'unity in diversity'-কে স্বীকার করে নিয়েছি। এই যৌগিক ঐক্যের সংস্কার, বলা চলে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে বদ্ধমূল হ'য়েছে।

রোমান্স-জাতীয় বহুদেশ-কাল-পাত্র সমন্বিত কাহিনীর প্রভাবে ইউরোপীয় নাটকের গঠনে যৌগিক ঐক্যের মর্যাদা ক্রমশঃ স্বীকৃত হতে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে, একাধিক উপধারাযুক্ত কাহিনী—ক্রমবিকাশশীল চরিত্র সৃষ্টির প্রথা চালু হয়ে যায়। ক্রমবিকাশশীল চরিত্র সৃষ্টি করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে—কাহিনীর কালব্যাপ্তি বাড়িয়ে নেওয়া—Canvas-কে বড় করে নেওয়া। চরিত্রকে এক অবস্থা থেকে অন্য এক অবস্থায় বা পরিণতিতে পৌঁছে দিতে গেলেই জীবনের অনেকখানি অংশকেও দৃশ্য করে তোলা দরকার এবং দরকার বলেই উপসংহারের অনেক আগে থেকেই চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়। গ্রীক নাটকের ঐক্য ও কাহিনী এবং সেক্সপীয়র নাটকের ঐক্য ও কাহিনী পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করলেই, সরল ঐক্যের এবং যৌগিক ঐক্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে—ছোট 'ক্যানভাসে' জীবনের বিশেষ একটি কার্যকে (action) উপস্থাপিত করার এবং বড় 'ক্যাসভাসে' ক্রমবিকাশশীল চরিত্রের পরিণতি দেখানোর পার্থক্যটুকু স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হবে। অনেক ক্ষেত্রেই বড় 'ক্যানভাস' বা পশ্চাৎপটে জীবনের ক্রমপরিণামশীল ছবি আঁকবার প্রবৃত্তি (বিশেষত ঐতিহাসিক ঘটনার ও ব্যক্তির নাট্যরূপ দিতে গিয়ে) স্বাভাবিক বা প্রচলিত মাত্রা হারিয়ে বসেছে—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কাহিনী অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে পড়েছে। এই প্রবৃত্তি আরো বেড়েছে—জীবন-চরিতের নাট্যরূপ রচনার ক্ষেত্রে। জীবনের একদিক বা অনেকখানি উপস্থাপিত করার ঝোঁক, ক্রমে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, জীবনের সবটুকু উপস্থাপনা করার ঝোঁকে পরিণত হয়েছে।

বলা বাহুল্য 'কার্য-ঐক্য' (unity of action)—এর পরিবর্তে 'নায়ক ঐক্য' (unity of hero) প্রাধান্যলাভ করেছে অর্থাৎ ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও পরিণতি দৃশ্য করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই চেষ্টারই বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়—জীবনের ব্যাপ্তিকে আদ্যন্ত প্রদর্শিত করায়। নাট্যকারের মূলধন এক্ষেত্রে উপস্থাপ্য ব্যক্তি-চরিতের সামাজিক চাহিদা—ব্যক্তিকে ঘিরে সমাজমনের

কৌতূহল। সামাজিকগণ ব্যক্তিজীবনের আগাগোড়া জানতে চায় ব'লে (এবং তাই বুঝেই) নাট্যকার কাহিনীকে যথাসাধ্য গোড়া থেকে আরম্ভ করতে চেষ্টা করেন এবং কেউ কেউ বা অনাদি উৎস পর্যন্ত 'সূচনা' বা 'প্রস্তাবনা' নাম দিয়ে দৃশ্য করে থাকেন। এরা এ হিসাব করতে যান না যে—"the beginning of a play is not absolute, it is a point in a larger story... ... and which is necessarily a very exciting point in the development of the story—because it is the point at which a dangerous decision is made" (লসন্)। এদের কাছে প্রারম্ভিক পরিস্থিতি নির্বাচনের সমস্যা বলে কোন সমস্যা নেই। কারণ এরা যেখান থেকে আরম্ভ করেন তার আগে আর কোন আরম্ভ কল্পনা করা যায় না। সূচনা 'বা প্রস্তাবনা'কে নাটকের বৃত্তাংশ বলে স্বীকার না করলে, অবশ্য মূল বৃত্তের আরম্ভে নির্বাচন-ব্যাপার একটা লক্ষ্য করা যায় বটে।

কিন্তু "সূচনা" বা "প্রস্তাবনা" রচনা করায় আর যে তাৎপর্যই ফুটে উঠুক, মূল কার্যের (action) উৎস যত আলোকিতই হোক, বৃত্তের সংহত রূপের দৈন্যও যে ফুটে উঠে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের পৌরাণিক নাটকে, যেখানে দেবতাদের মর্তে অবতরণ করে নররূপে লীলা করার বা অভিশপ্ত দেবদেবীর নরদেহ ধারণ ও কর্মানুসারী ফলভোগের কাহিনী দৃশ্যাকারে উপস্থাপিত হয়, সেখানে এইরূপ 'সূচনা' বা 'প্রস্তাবনা, রচনা করে দেবলোকের অভিপ্রায়ের সঙ্গে নরলোকের ঘটনাকে কার্যকারণ সূত্রে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে—দর্শকের কাছে দৈব-ইচ্ছার রূপটি, ভাবী ঘটনার পরিণামটি, আগেই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এরূপ ক্ষেত্রে দর্শকরা যে আনন্দ লাভ করেন তা' কৌতুহল নিবৃত্তির আনন্দ নয়, তা জন্মে জানা ঘটনাকেই যথাজ্ঞাত ঘটতে দেখে, নিয়তির অমোঘ বিধানের জয় উপলব্ধি করে—প্রত্যাশার পরিপূরণ থেকেই এবং শিল্পকর্মের উৎকর্ষের উপলব্ধি থেকে। ঘটনার ভূতভবিষ্যৎ জানার পরেও ঘটনা দেখে যে আনন্দ হতে পারে, উপস্থিত

বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটতে পারে—জানা নাটকের অভিনয় দেখে রসাস্বাদনই তার বড় প্রমাণ। সূচনা বা প্রস্তাবনা রসনিষ্পত্তির পরিপন্থী কি না এ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু এই কথাটই বলবার যে. সূচনা বা প্রস্তাবনাকে নাটকের মূল বৃত্তের বাইরের অংশ বলে স্বীকার করলে পরোক্ষভাবে এই কথাই স্বীকার করা হয় যে নাট্যকার সমগ্র কাহিনীকে একান্বয়ে গ্রথিত করতে পারেননি অর্থাৎ যেখান থেকে আরম্ভ করলে, কার্য (action) তার অতীতকে আত্মস্থ করে নিয়ে, অবিচ্ছিন্ন ধারায় এবং ক্রমান্বয় বজায় রেখে বিশেষ এক পরিণামে গিয়ে শেষ হতে পারে. সেখান থেকে আরম্ভ করতে পারেন নি। তা' করতে গেলে সূচনাকে বা প্রস্তাবনাকে পৃথক বা অসংলগ্ন না রেখে কার্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে দেওয়া দরকার। আমাদের পৌরাণিক নাটকে এরূপ কলা-কৌশলের প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। বুদ্ধদেবচরিত নাটকেও—(মূলতঃ পৌরাণিক না হওয়া সত্ত্বেও, যা' পৌরাণিক-ধর্ম্মান্বিত হয়ে দাঁড়িয়েছে) এই ধরণের অসংলগ্ন 'সূচনা' দেখা যায়। শুধু তাই নয় সূচনা দিয়েও নাট্যকার তৃপ্তি পান নি. বুদ্ধের জন্ম-বৃত্তান্তটিও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তথা পৌরাণিক আবহাওয়াকে আরো জমাট করে তুলেছেন। নাটকের মুখ্যকার্য বলতে গেলে—বুদ্ধের বৈরাগ্য, মুক্তির আবেগ, সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়া, অটুট সংকল্প নিয়ে সাধনা—সিদ্ধিলাভ—মুক্তিমন্ত্র প্রচার। সেখানে বুদ্ধের 'জন্ম' বা শৈশবকে পৃথকভাবে উপস্থাপনা করা অপরিহার্য নয়; পরিণত সিদ্ধার্থকে দিয়েই কার্য্যারম্ভ করা উচিত। (তবে মন্দের ভাল এইটুকু যে শিশু-সিদ্ধার্থের কোন ক্রিয়াকলাপ 'দৃশ্য' করে তোলা হয়নি।)

যা'ই করা হোক, সন্ধি-বিন্যাসের রীতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে, একথা বলতেই হবে যে, নাটকের মূল ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে। আগের ব্যাপার পরের ঘটনার জন্য আবশ্যক হ'লেও কার্য-ধারার সঙ্গে কার্যকারণযোগে যুক্ত হয়ে নেই। তবে কেউ যদি বলেন—এ

নাটকে বিষ্ণুর বুদ্ধ-অবতার হওয়াই আসল ব্যাপার, অতএব সূচনাতেই কার্যের প্রকৃত আরম্ভ, তা'হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তা'ই ব'লে একথা কখনই প্রমাণ করা যাবে না—প্রথম অঙ্কে উপস্থাপিত ঘটনাবলী নাটকের পরবর্তী ঘটনা উপস্থাপনার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

প্রারম্ভিক ঘটনা নির্বাচনের এই ত্রুটিকে চরিতধর্মিতার দোহাই দিয়ে, মার্জনা করার চেষ্টা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু সে চেষ্টায় আর যা'ই হোক, গঠন-সুষমার দৈন্য, অংশকে সমগ্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত করার ত্রুটি, দূর করা যাবে না। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম অঙ্কের শেষ থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ অবধি, কালগত যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, তাকে ভরাট করবার কোন চেষ্টা যেমন নাট্যকার করেননি, তেমনি অঙ্কটিকে ভাবী অঙ্কের সূচনা করবার নিয়মটিও পালন করেননি। চতুর্থ অঙ্কের পরে পঞ্চম অঙ্কে কার্যের যে অগ্রগতি ঘটানো হ'য়েছে—(কপিলবাস্তুতে বুদ্ধের গমন) তা'র মধ্যেও কোনরূপ ক্রমবিবর্তনের ধারা রক্ষা করা হয়নি। ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়েছেন। কিন্তু ঘটনাগুলির বিন্যাসে বা সংযোগে আসত্তি বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে পারেননি। নাটকীয় ঘটনার পক্ষে এই ত্রুটি মারাত্মক। এর ফলেই, বহুঘটনার পারস্পরিক যোগে যে সমন্বিত সমগ্র (whole) তৈরি হয়, গঠনটি তা' হ'তে পারেনি। সংক্ষেপে বলা যায় :—Exposition, Continuity ও Progre-ssion—এই তিন ব্যাপারে নাট্যকার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। Exposition সম্বন্ধে আগেই সামান্য আলোচনা করেছি। তা' নাটকীয় হ'য়েছে কি না, এ প্রশ্নের আলোচনা নাটকীয়তার বা রসের আলোচনা। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে "Exposition"-এর উদ্দেশ্যটি কার্যারম্ভের তথা রসের আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য জানিয়ে দেওয়া বটে, কিন্তু কথোপকথনের আকারে সংবাদ জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয় ; নাটকীয়ত্ব না থাকলে নিছক বিবরণ ছাড়া তা' আর কিছুই নয়। প্রকৃত "Exposition"-এ "the information must be dramatized" বুদ্ধ-

চরিতে প্রকৃত Exposition (২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক) বিবরণের পর্যায় অতিক্রম ক'রে আচরণের—পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির বুঝাপড়ার—পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। সামান্যভাবে গঠন-বিচার এই পর্যন্তই যথেষ্ট—যদিও বিস্তারিত গঠন-বিচার বলতে নাটকের **মুল ভাব** (root-idea) ও **মুল-কার্য** (root-action) নির্ধারণ করার পরে—মূল-কার্যের সন্ধিবিভাগ বা প্রধান বিভাগ (অঙ্ক-বিভাগ) অঙ্কান্তর্গত কার্যের উপ-বিভাগ (দৃশ্য-বিভাগ) এবং প্রতিটি দৃশ্যের ঘটনা-বিন্যাসের সার্থকতা বিচার করাই বুঝায়। যে মূলসূত্র এই বিচার-ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে তা'—লসনের ভাষায় বলা যেতে পারে—"every detail of the action is determined by the end toward which the action is moving". মোট কথা, মূলভাবকে নির্ধারণ না করা পর্যন্ত যেমন 'মূলকার্যের সার্থকতা বিচার করা যায় না, 'মূলকার্য' নিরূপণ না করা পর্যন্ত সন্ধি-বিভাগ বা অঙ্কবিভাগের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বা সার্থকতা বিচার করা যায় না, তেমনি অঙ্কনিষ্পাদ্য কার্যাংশের রূপ স্থির না করা পর্যন্ত দৃশ্য-কল্পনারও দোষগুণ বিচার করা সম্ভব নয় এবং দৃশ্যের উদ্দেশ্য স্থির না ক'রে দৃশ্যান্তর্গত ঘটনাবলীর উৎকর্ষ-অপকর্ষ এবং ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করা চলে না। কয়েকটি অনুচিত কল্পনা-স্থল নির্দেশ করেই গঠন-বিচারের উপসংহার করা যাক।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্য 'প্রমোদকানন'। এই দৃশ্যে যতগুলি ঘটনার সমাবেশ করা হ'য়েছে, তাদের সবগুলির ঔচিত্য আছে একথা বলা যায় না। প্রমোদকাননে গণকদ্বয়ের অযাচিত প্রবেশ ও রসিকতা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে অপেক্ষিকর কালগত অনৌচিত্যের একটি স্থল আছে। ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধার্থের গৃহ-ত্যাগের পরেই গোপা ও ধাত্রীর সামান্য সংলাপ এবং শুদ্ধোদনেরও গৌতমীর সামান্য একটু বিলাপের পরেই 'একাদশ যোজন' দূরবর্ত্তী অনোমা নদীর তট থেকে 'সিদ্ধার্থের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদসহ ছন্দকের প্রবেশ' অসম্ভব ঘটনা; তেমনি অতি

অল্প সময়ের ব্যবধানে 'সন্ন্যাসিনী বেশে গোপার প্রবেশ' ততোধিক অতি-নাটকীয়। কালৌচিত্যের দিকে লক্ষ্য কম থাকায়—চতুর্থ অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে 'পায়সান্ন লইয়া সিদ্ধার্থের প্রস্থান' এবং "একদিকে সিদ্ধার্থ অপরদিকে রাখালের প্রবেশ"—এই দুই ঘটনার মধ্যে যে কাল-ব্যবধান প্রত্যাশিত, তা' পাওয়া যায় না। তারপর, শেষ গর্ভাঙ্কে—রাহুলের উক্তি—"এস ভাই, নিত্যধামে খেলিব সকলে মিলি" নাটকের পৌরাণিকতা-বৃদ্ধির সহায়ক হ'লেও, পাত্রানুচিত সংলাপেরই নিদর্শন।

নাটকীয়ত্ব—রস—চরিত্রসৃষ্টি

'লাইট অফ এশিয়া'—কাব্যকে নাট্যকার যে নাট্যরূপ দিয়েছেন তা' কতখানি নাটকীয় হয়েছে, এ সম্বন্ধে আগেই সামান্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে এই কথাই বলা হ'য়েছে যে নাট্যকার জীবনকে যে পরিমাণে বর্ণনাত্মক রূপ দিয়েছেন, সে পরিমাণে জীবনের কর্মপরায়ণ, আচরণাত্মক রূপ আঁকতে পারেননি। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রগুলি যত কথা বলেছে, তার চেয়ে অনেক কম কাজ করেছে, কম অনুভাব-সঞ্চারিভাব ব্যক্ত করেছে। নাটকের পক্ষে যে এ ব্যপার প্রশংসণীয় নয়, নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে একটা কথা বলার আছে। বুদ্ধদেবচরিতের নাটকীয়ত্ব নির্ধারণ করার আগে প্রথমেই বুদ্ধদেবচরিত-নাটকের জাতি-প্রকৃতি নিরূপণ ক'রে নিতে হবে। কারণ জাতি-প্রকৃতি না জানা পর্যন্ত নাট্যকার্যের গতিবিধি কেমন হবে, অগ্রগতির লয় কত দ্রুত বা কত বিলম্বিত হবে—এ সকলের কোন কিছুরই হিসাব ঠিক করে করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যতত্ত্ব-সমালোচক দেনিস দিদেরোর বক্তব্য স্মরণীয়। "Of a sort of Drama Philosophical" পরিচ্ছেদে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—নাটক যেখানে দার্শনিক সেখানে ঘটনার গতিবেগ যেমন মন্থর হ'তে বাধ্য তেমনি দৈহিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ও বাচনিক ক্রিয়ার মাত্রাও অবশ্যই

অধিকতর হবে। এই ধরণের নাটকে যে সমালোচক ঘটনার দ্রুতগতি এবং চঞ্চল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা আশা করবেন, দিদেরোর মতে—তাঁরা কৃপার পাত্র। কারণ তাঁরা জানেন না বা জানলেও বুঝতে চান না যে জাতিভেদে প্রকৃতিভেদ, প্রকৃতিভেদে চালচলনভেদ। একথা ঠিক বটে যে নাটকে জীবন-দ্বন্দ্বের রূপ উপস্থাপিত হয় এবং Contradiction is the power that moves things" কিন্তু একথাও স্মরণীয় যে ব্যক্তি-প্রকৃতি একরূপ নয় ব'লে দ্বন্দ্বের প্রকৃতিও সব ক্ষেত্রে একরূপ হয় না। কোন দ্বন্দ্বে বাইরের বাধা অতিক্রম করার সংগ্রাম বড় হয়ে দেখা দেয়, কোন দ্বন্দ্বে বা ভিতরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বড় হয়ে উঠে ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের বাধা ভিতরের বাধা, দুয়ের বিরুদ্ধেই প্রায় সমান সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। বাইরের দ্বন্দ্বের স্তর অতিক্রম ক'রে সংগ্রাম যত অন্তরের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, যত আত্মিক দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে, তত ক্রিয়ার উচ্ছলতা এবং ঘটনার গতিবেগ হ্রাস পেতে থাকে—তত শারীরিক ক্রিয়ার স্থলে সাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রধান হয়ে উঠে। আত্মিক বা সাত্ত্বিক ক্রিয়ায় প্রাধান্য ঘটলে বিশেষতঃ চরিত্রের এবং ঘটনার গতিবেগ কমে গেলে, ক্রিয়ার দীপ্তত্বের (energy) অভাবে নাটকীয়ত্বের হানি ঘটার আশঙ্কা থাকে বটে, কিন্তু হানি ঘটা বা না-ঘটা নির্ভর ক'রে শেষ পর্যন্ত অভিনয় এবং দর্শকের বোধশক্তির ও রসরুচির উপরে—এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না। কারণ —"The effectiveness of action does not depend on what people do, but on the meaning of what they do"—(লসনের মন্তব্য), অর্থাৎ ক্রিয়ার সার্থকতা খানিকটা ক্রিয়া থাকলেই হয় না, ক্রিয়ার সার্থকতা সেখানেই যেখানে তা' তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য (meaning) নিরালম্ব কোন-কিছু বিষয় নয়। সামাজিক ব্যক্তির জীবনাবেগের যে রূপ দ্বন্দ্বের আকারে নাটকে ব্যক্ত হয় সেই জীবনাবেগের রূপের মূল্যের মধ্যেই তাৎপর্যের গুরুত্ব থাকে—The root of this meaning lies in the Conscious will"। এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য দর্শকের মধ্যে

যত কম থাকবে, তত কম হবে দর্শকদের কাছে নাটকীয় কার্যের আবেদন। এক কারণেই—'dynamic action'-এর নাটক সাধারণ দর্শকদের যত চেতিয়ে রাখে 'static action-এর নাটক তত চেতিয়ে রাখতে পারে না। সাধারণ দর্শক শেষোক্ত শ্রেণীর নাটকের তাৎপর্য যত কম বুঝে, তত কম বুঝে তার action' তত কম ধরতে পারে তার নাটকীয়ত্ব।

'বুদ্ধদেব-চরিত'-নাটকের নাটকীয়ত্ব বিচার করবার সময় উল্লিখিত কথা কয়েকটি আমাদের মনে রাখা দরকার। বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার—বুদ্ধদেবচরিত সাধারণ বাসনা-কামনা-বিক্ষুব্ধ জীবনের রূপ নয়; বুদ্ধদেব চরিতে এমন একটি ব্যক্তির জীবনের রূপ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করা হয়েছে যিনি মহাজীবনের আহ্বানে, ঐকান্তিক আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিয়ে, রাজ্য-পরিজনের মায়া-মোহ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছেন—দুঃখজয়ের কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে, বিশ্ববাসীকে দুঃখমুক্ত করবার ব্রত নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। বুদ্ধজীবনের দ্বন্দ্ব—কামনার সঙ্গে জাগ্রত আধ্যাত্মিক সত্তার, বিবেকবুদ্ধির দ্বন্দ্ব, সংসারের শত মায়াবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার দ্বন্দ্ব—অশেষ ক্লেশের, বহু বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে এবং শেষপর্যন্ত লক্ষ্যে পৌছানোর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে শারীরিক বা আঙ্গিক ক্রিয়া অপেক্ষা বাচিক ও সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অবকাশই বেশী। চিত্তদৈন্য, ভাবাবেশ, বিবেকখ্যাতি, আত্মবিশ্লেষণ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির আর্তি, নির্বেদ শম প্রভৃতি যেখানে প্রধান অনুভাব-সঞ্চারিভাব, সেখানে উচ্ছল আঙ্গিক ক্রিয়ার অবকাশ কম, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অবশ্য বাচিক ক্রিয়ার অবকাশ বেশী ব'লে এত বেশী নয় যা'তে নাটকের স্বধর্ম—দৃশ্যাত্মকতা—ক্ষুণ্ণ হয়। ধ্যানমনন, আত্মবিশ্লেষণাদি ব্যাপারে বাচিক ক্রিয়ার অবকাশ বেশী থাকলেও, বচনে চরিত্রের আচরণ ফুটে না উঠে শুধু যদি বিবরণই ব্যক্ত হয়, তবে তা' অনাটকীয় বচন মাত্র। নাটকে যা' কিছুই আসুক, আসবে জীবনের আচরণশীল রূপটিকে ব্যক্ত করবার জন্যই। প্রত্যেক আচরণেই পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ও বুঝাপড়ার রূপটি কি, তাই ব্যক্ত হ'য়ে থাকে এবং সেই হিসাবে

প্রত্যেক নাটকীয় সংলাপকে ঐ সম্পর্কের অভিব্যক্তি হয়ে উঠতে হবে। সংলাপ যতক্ষণ ঐ সম্পর্কের প্রকাশ-রূপে থাকে, ততক্ষণ পরিস্থিতিকেই সমুচিতভাবে উপস্থাপিত করে; যত পরিস্থিতি থেকে অর্থাৎ সম্পর্ক থেকে আলগা হয়ে পড়ে, তত অনাটকীয় হয়ে উঠে। বুদ্ধদেবচরিত নাটকে এই ধরণের অনাটকীয় স্থল আছে। পরিস্থিতি চেতনা বা সম্পর্কচেতনা সবক্ষেত্রে জাগ্রত নেই ব'লেই সংলাপে যতটা ভাব-বিস্তার ব্যক্ত হয়েছে, ততটা জীবনের স্বাভাবিক রূপ ব্যক্ত হয়নি।

অনাটকীয়তার পাপ যা' আছে এই ছিদ্রপথেই তা' প্রবেশ ক'রেছে। এরই আনুষঙ্গিক ফল গতির দৈন্য। এই জাতীয় অধ্যাত্ম-বিষয়ক নাটকে এমনিতেই গতি-লয় বিলম্বিত হয়; তার উপরে যদি জীবন-সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক না হ'য়ে, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ পরিস্থিতি থেকে আলগা হয়ে বর্ণনাত্মক কাব্যসুলভ বিস্তার খোঁজে, তা'হলে বিলম্বিত গতি আরো বিলম্বিত হ'য়ে পড়ে। আচরণের রূপ স্বাভাবিক গতি ছাড়িয়ে বর্ণনার রূপের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে নাটকীয়তাও ক্ষুণ্ণ হয়। এ ত্রুটি এখানেও আছে। বিশেষ ক'রে—সিদ্ধার্থের বাচনিক ক্রিয়ায় এই ত্রুটির দৃষ্টান্তস্থল পাওয়া যাবে। তবে দৃষ্টান্তস্থল খোঁজার সময় একথা মনে রাখতেই হবে—সিদ্ধার্থের মতো জাগ্রতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে যে পরিমাণ ভাবতন্ময়তা ও স্বগতোক্তি স্বাভাবিক, অন্যের পক্ষে তা' স্বাভাবিক নয়। সিদ্ধার্থ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা তা'তে ভাবুকের অন্তর্দর্শনমূলক ভাবনার অনেকখানি অবকাশ আছে। সিদ্ধার্থের চরিত্রই বুদ্ধদেবচরিত নাটকের নাটকীয়ত্বের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে।

নাটকে চরিত্রের প্রয়োজন রসকে বা ভাবকে ব্যক্ত করার জন্যই—ইংরেজি পরিভাষা প্রয়োগ ক'রে বল্‌লে বলা যায়—'root-action', root-idea বা premise-কে ব্যক্ত করার জন্যই। রসের ও ভাবের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ যে রূপ কল্পনা করা যায়, তা' তত্ত্বমাত্র—concept-মাত্র। রসের ও ভাবের বাস্তব অভিব্যক্তি ঘটে ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রেই। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে আমরা

বলতে পারি—ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ দেওয়াই শিল্পীয় কাজ। শিল্পকর্মের দিক থেকে বলা যায়—শিল্পীর কাজ ভাবকে রূপকল্পনার ভিতর দিয়ে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী করে তোলা—রস ভাবেরই অভিব্যক্ত রূপ (অবশ্যই সামাজিকের আস্বাদনযোগ্য) "ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ"—এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষেই শিরোধার্য। ভাবাত্মক না হ'লে কোন রূপই রসাত্মক হ'তে পারে না। unity of impression—সৃষ্টি করতে গেলেই বৃত্তকে ভাবকেন্দ্রিক ক'রে বর্ণনা করতেই হবে। সুতরাং ঘটনা বা চরিত্রকে যতক্ষণ কোন ভাবের বাহন না করা হয়, ততক্ষণ তারা শিল্পের অঙ্গীভূত হ'য়ে উঠে না। নাট্যকার-সমালোচক গলসওয়ার্দির কথাটা উদ্ধৃত ক'রে বলা যায়—"The perfect dramatist rounds up his characters and facts within the ring-fence of a dominant idea, which fulfills the craving of his spirit"—অর্থাৎ নাট্যকারকে চরিত্র ও ঘটনাকে একটা ভাবের অঙ্গুরী-বলয়ের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই 'ভাব'—এর মধ্যেই নাট্যকারের মনোবাসনা ব্যক্ত হয়।

বুদ্ধদেবচরিত-নাটকেও নাট্যকার বিশেষ একটি মনোবাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন—বুদ্ধের জীবন-কাহিনীকে বিশেষ একটি প্রধান ভাবের অধীন করে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই ভাবটিকে প্রতিপাদ্যের (premise) আকারে প্রকাশ করতে গেলে বলা যায়—আত্মা যখন বোধিসত্ত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে, কোন বাধা-বন্ধন মায়া-মোহ আর তাকে সংকীর্ণ সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না,—ধর্মের-ছদ্মবেশ-পরা অধর্ম তাকে ভুলাতে পারে না, পরমপদ বা সাধ্যবস্তু না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি থাকে না,—সাধনার বিরাম থাকে না—মুক্তি পেয়ে এবং মুক্তিমন্ত্রে জগতকে দীক্ষিত করেই তাঁর সাধনা শেষ হয়। এই প্রতিপাদ্যকে কার্যরূপ দিতে নাট্যকার বুদ্ধ-কাহিনী অবলম্বন করেছেন। অন্যভাবে বললে বলা চলে—বুদ্ধকাহিনীর নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার ঐ ভাবটিকেই প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। এই

প্রসঙ্গেই, 'সূচনা'তে বিষ্ণু যে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার; কারণ তার মধ্যে নাটকের মূল প্রতিপাদ্যও ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের কথা আছে—(ক) বিদ্যাদর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণদের বিদ্যাবলে দমন (খ) ভ্রান্ত ধর্ম ও নিষ্ঠুর আচারের হাত থেকে পথহারা নরের উদ্ধার (গ) 'অহিংসা পরম ধর্ম'—ঘোষণা (ঘ) যাগযজ্ঞ নিবারণ, (ঙ) দেবার্চনে প্রাণীর হনন বন্ধ করা (চ), কর্ম দ্বারা কর্মনাশ ক'রে নির্বাণলাভের জন্য মানবকে প্রবৃত্ত করা। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, বুদ্ধের জীবনে দ্বন্দ্ব কোথায় তা' স্পষ্টাকারেই চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিদ্যাদর্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অহিসা-ধর্ম ও কর্ম দ্বারা কর্মক্ষয় করার ধর্ম প্রচার করার জন্য সংগ্রাম—এতগুলি সংগ্রাম যাঁর জীবনে রয়েছে, তাঁকে সংগ্রামশীল চরিত্র ক'রে তোলা নিশ্চয়ই খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এই সংগ্রামের ভিতরেই প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধজীবনের সামাজিক মূল্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু নাট্যকার, বুদ্ধের জীবনে ঐদিককার সংগ্রাম খুব জোরালো বা সংলক্ষ্য ক'রে তোলেননি। সংগ্রামের আভাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু যা'কে ঠিক সংগ্রাম বলা যায় তা' সৃষ্টি করেননি। নাটকে যে সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বুদ্ধের দ্বন্দ্ব বা জীবন-সংগ্রাম দেখাতে চেয়েছেন, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে—সিদ্ধার্থের অল্প জাগ্রত আত্মার গভীরে যে অতৃপ্তি ও উদাস ভাব জেগেছে, তার সঙ্গে, তাঁর মায়া-মোহের অর্থাৎ সংসারী সত্তার বুঝাপড়া দেখানো হয়েছে—মায়া-মোহের স্বপ্নে আধ্যাত্মিক সত্তার দাবী ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে, আবদ্ধ জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে মহাজীবনের ধারায় নিজের জীবনকে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাকুলতা উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে বৈরাগ্যপ্রবণতার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-বন্ধনের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে; চতুর্থ পর্বে—ধর্মের নামে নিষ্ঠুর আচার বন্ধ করার সংগ্রাম, পঞ্চম পর্বে—মার প্রভৃতি বিঘ্নকারিগণের সঙ্গে সংগ্রাম, ষষ্ঠ পর্বে ব্রাহ্মণের ও বণিকের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে৷

এবং সপ্তম পর্বে পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের নিজ মতে দীক্ষিত করার চেষ্টা রূপ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিগুলির প্রকৃতি এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বুদ্ধের—বুঝাপড়ার রূপ, এক কথায় দ্বন্দ্বের রূপ পর্যালোচনা করলেই, বুদ্ধ-চরিত্র সৃষ্টির এবং নাটকের অঙ্গিরসের নিষ্পত্তির মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—উপবন দৃশ্যে প্রথম সিদ্ধার্থকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রমোদ-ভবনের শত আকর্ষণে সিদ্ধার্থ আবদ্ধ। গোপার সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ—কৈশোরের শূন্য ভাব বা বিকার কেটে গেছে। জীবনকে আর লক্ষ্যশূন্য মনে হয় না। গোপার প্রেমের স্পর্শে তাঁর চোখে নতুন দৃষ্টি ফুটেছে। তবু যেন লুক্কায়িত আছে ছায়া।' বহু স্বপ্ন তিনি দেখেন! জাগরণেও চোখে বহু ছবি ভাসে, কিন্তু প্রেমের স্বপ্নে সকল স্বপ্ন ভুলে থাকেন। দেববালাগণের গান শুনে তাঁর নির্জ্জান মনের স্মৃতিতে সাড়া জাগে—মনে হয় কোথায় যেন তিনি এ গান শুনেছেন। বিশ্বের বিশাল বিস্তার দেখার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠে। বিশ্বপ্রেমেয় আবেগে ভাবাবেশ উপস্থিত হয়—জীবের দুর্গতি দূর করবার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে—মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য স্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। [সিদ্ধার্থের ভাব-ভাবান্তর এবং ভাবান্তর দেখে গোপার প্রতিক্রিয়া আরো স্বাভাবিক বা বাস্তবিক হ'লে, দ্বন্দ্বের তীব্রতা এবং চরিত্রের বাস্তবতা আরো বৃদ্ধি পেত—দু'টি চরিত্রই বেশী পরিমাণে আদর্শায়িত (idealized)]

এই দৃশ্যেই, সিদ্ধার্থের সঙ্গে শুদ্ধোদনের সাক্ষাৎকার ঘটে। বহির্বিশ্ব দেখার জন্য সিদ্ধার্থ পিতার কাছে অনুমতি চান। পুত্রের সন্তোষবিধান করতে শুদ্ধোদন অনুমতিদান করেন। (শুদ্ধোদনের আচরণ এক্ষেত্রে বর্ণহীন অর্থাৎ দ্বন্দ্বহীন। প্রত্যাশিত দ্বন্দ্বের অভাবে, চরিত্র-সৃষ্টির দুর্বলতা চোখে লাগে)

তৃতীয় অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে—বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত এবং সন্ন্যাসী দেখে সিদ্ধার্থের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও দুঃখ-ভাবনা জাগে। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন

করবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করার—'বিষম বন্ধন ছেদন' করার—সংকল্প করেন। (এই গর্ভাঙ্কে ভাবী দ্বন্দ্বের জন্য প্রস্তুতি চলেছে। সংসার ত্যাগের সঙ্কল্পে 'কার্য' (action) কক্ষান্তরে প্রবেশ করেছে।) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—সিদ্ধার্থ পিতার কাছে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন। শুদ্ধোদনের সমস্ত আবেদন-নিবেদন সিদ্ধার্থ যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। নিরুপায় শুদ্ধোদন—বলতে বাধ্য হয়েছেন—আজি যাও প্রমোদ ভবনে, কর যথা অভিরুচি কালি"। [পরিস্থিতি অনুযায়ী, পিতা-পুত্রের সংলাপে সংঘাত ফুটে উঠা উচিত। তা তেমন ফোটেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংস্কার সৃষ্টি করে না। সিদ্ধার্থের প্রস্থানের পর শুদ্ধোদনের উন্মত্তবৎ প্রলাপ যতই দীপ্ত হোক আর দিব্যদর্শনের নিদর্শনরূপে গৃহীত হোক, আতিশয্যদোষদুষ্ট তথা অতি-নাটকীয় বলে মনে হয়। চরিত্রের এই আচরণকে খুব সুসঙ্গত এবং অনিবার্য ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠা আসে।] তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—সিদ্ধার্থের প্রবুদ্ধ বিবেকের অনিত্য-ভাবনা দীর্ঘ দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। ছন্দকের সঙ্গে কথোপকথনে সিদ্ধার্থের উক্তি আরো দীর্ঘ হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। ছন্দকের অনুরোধ বা প্রশ্নকে উপলক্ষ্য ক'রে সিদ্ধার্থ আত্মহারাভাবে মননে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ছন্দক শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ কার্যে সহায় হয়েছে। সিদ্ধার্থ জগতের সমগ্র প্রাণীর কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকতে না পেরে, জীবের সন্তাপ দূর করবার সঙ্কল্প নিয়ে, পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র—সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, গৃহত্যাগ করেছেন।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—কৃচ্ছ্রসাধনারত সিদ্ধার্থের ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক; তা' সত্ত্বেও অটুট সঙ্কল্প নিয়ে তিনি মহাধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। দেহে প্রাণ থাকতে সত্যের সন্ধানে তিনি বিরত হবেন না। কিন্তু দেববালাগণের গীতে তিনি মধ্যপন্থার নির্দেশ পান—ভোগতৃষ্ণা এবং শরীর-নিগ্রহ দুই অতিশয়কে ত্যাগ করে তিনি মধ্যপথ গ্রহণ করেন। দেহরক্ষা না করলে দিব্যজ্ঞান-অন্বেষণ কি করে করা সম্ভব ? (সুজাতার দেওয়া পায়সান্ন ভোজন

ক'রে সুস্থ হন তারপর রাখালের সঙ্গে দেখা হয় এবং তার সঙ্গে রাজা বিম্বিসারের পূজাগৃহে যান—জীববলি বন্ধ করবার জন্য)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিম্বিসার রাজার পূজা-গৃহ। সম্মুখে কালীমূর্তি। মহাযজ্ঞ-ক্রিয়া। বলি আরম্ভ হবে, এমন সময়—মহারাজের জয় হোক ব'লে সিদ্ধার্থের প্রবেশ। ভিক্ষুক ব'লে নিজের পরিচয় দেন এবং 'প্রাণীবধ-যজ্ঞ' ভিক্ষা চান। বিম্বিসার ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেন—সিদ্ধার্থকে বাতুল বলে মার্জনা করেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ আবেদন করতে ক্ষান্ত হন না—সুদীর্ঘ ভাষণ আরম্ভ করেন এবং বিনা বাধায় ৬০ পংক্তি বলে যান। সিদ্ধার্থের জ্ঞানগর্ভ বাক্যে বিম্বিসারের চোখ খুলে যায়। আত্মপরিচয় দিয়ে, এবং বিম্বিসারকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করে প্রস্থান করেন। (যে বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে বাতুল বলতে দ্বিধা করেন না—এবং সন্ন্যাসী বলেই প্রাণবধ না করে মার্জনা করেন, সেই বিম্বিসার ৬০ পংক্তির ভাষণের মধ্যে একবারও বাধা দেবেন না তা' হ'তে পারে না। বিম্বিসারের শাক্ত সংস্কারকে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত করলে, দৃশ্যটির স্বাভাবিকতা এবং নাটকীয়ত্ব আরো বৃদ্ধি পেত। অন্ততঃ প্রথমাংশে দু'একবার বাধা সৃষ্টি করলেও অনৌচিত্য-দোষ বেশখানিকটা কেটে যেত—বিম্বিসারের ভাবান্তর আকস্মিক ব'লে মনে হ'ত না।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—তরুতলে সিদ্ধার্থ পুত্র শোকাতুরা এক জননীকে প্রবোধ-বচন শুনিয়েছেন এবং নতুন ক'রে মৃত্যুজয়ের সংকল্প গ্রহণ ক'রেছেন। (মৃত্যু-পীড়িত সংসারের ছবি দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধ'রে, নাট্যকার সিদ্ধার্থের মৃত্যুজয়ের সাধনার জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছেন—এ ছাড়া এ দৃশ্যের আর কোন তাৎপর্য নেই।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—সিদ্ধার্থ কাননের মধ্যে তরুমূলে উপবিষ্ট। সিদ্ধার্থের মনে হচ্ছে—বিশ্বময় আনন্দের রোল উঠেছে, দুঃখবিমোচনের আশা জেগেছে—জ্ঞানজ্যোতিবিকাশের শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। মন যেন মর্ত্যে নেই। মনে

হচ্ছে—দেহ থেকে বিস্তারিত হয়ে প্রাণ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। তিনি সমাধির সংকল্প নিয়ে সমাধিস্থ হন। মারের প্রলোভন জয় করেন; সংশয় তাঁর মনকে টলাতে পারে না; কুসংস্কারকে তিনি বিতাড়িত করেন এবং রতির ছলনা ব্যর্থ করে দেন। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত, কোন দুর্বিপাকেই তাকে টলাতে পারে না। মায়া পরাজিত হয়ে প্রস্থান করে। সিদ্ধার্থ সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সত্যের উপলব্ধিকে (৬১ পংক্তির) স্বগতোক্তিতে ব্যক্ত করেন। এই উক্তি দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ :—অসীম অনন্তের পটভূমিতে হ্রাস-বৃদ্ধি-হীন এক মহাশক্তির লীলা চলছে—শত শত বিশাল ভুবন সেখানে গড়ে উঠছে আবার ভাঙছে। আঁধার থেকে আলো ফুটছে। অচেতনের পরে সচেতন জন্মাচ্ছে। স্থূল শূন্যেতে মিশছে, আবার শূন্য থেকে স্থূল জন্ম লাভ করছে। যেখানেই জীবন সেখানেই দুঃখ। যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ দুঃখ। জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু অবস্থা ভেদ মাত্র। তেমনি দ্বেষ বা প্রণয়, আনন্দ-যন্ত্রণাও মানসিক অবস্থার ভেদ। সবকিছুর মূলে অবিদ্যা—মায়া। অবিদ্যার ছল বুঝতে পারলেই মমতা টুটে যায়। সৃষ্টি ও স্থিতি মায়ারই ছলনা। *পঞ্চভূতের সম্মিলনে—**জীবজ্ঞান,** জীবজ্ঞানে—**তৃষ্ণার,** উদ্ভব; তৃষ্ণা থেকে **বেদনা**। কর্মফলেই সুখদুঃখ ভোগ। ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হত হয়, তা'তে ক্রমে কর্মনাশ হয়, কর্মধ্বংসে পবিত্রতা বিরাজ করে—অবিদ্যা তিরোহিত হয় জরা-মৃত্যুহীন নির্বাণরত্ন লাভ সম্ভব হয়। [এখানে বৌদ্ধদর্শনের মূল বক্তব্য নাট্যকার উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। উক্তিটি দীর্ঘ বটে, কিন্তু সমাধিস্থ সিদ্ধ সংবুদ্ধের সত্যদর্শনের আবেগময় অভিব্যক্তি হিসাবে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। এই উক্তিটিতে নাট্যকারের এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরও মস্তিষ্ক শক্তির বা দার্শনিকতার বিলক্ষণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই জাতীয় পরাতত্ত্বাশ্রয়ী নাটকে দার্শনিক ভাবনা বা দিব্যানুভূতি—বলা যায় ভূষণং ন তু দূষণম্। ভাবনা যেখানে চরিত্রকেই প্রদর্শন করে সেখানে তাকে অনাবশ্যক বলা যায় না। এখানেও ভাবনা চরিত্রের উপাদানে পরিণত হয়েছে]

পঞ্চম অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে—ব্রাহ্মণের ও বণিকের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধ অহিংসা ও প্রজ্ঞাবল প্রয়োগ করে জয়লাভ করেছেন—যে দস্যুকে ব্রাহ্মণ ও বণিক বুদ্ধের প্রাণনাশ করতে নিযুক্ত করেছেন, সেই দস্যু বুদ্ধের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে। দস্যু বলে—দে ধন কোথায় দে। বুদ্ধ বলেন—(৪৬ পংক্তির উক্তি)—জ্ঞানরত্ন দেব, অজ্ঞান দূর হবে, চিত্তের বিকার দূর হবে। সুখ কোথায়? তৃষ্ণায় সকলেই ছুটছে; কারো ধনতৃষ্ণা, কারো কামিনী-তৃষ্ণা। অবিদ্যায় সকলকে নাচাচ্ছে; সুখ সুখ ক'রে শেষ পর্যন্ত সকলেই মৃত্যুর কবলে প্রবেশ করছে। ধনজন কোন কিছুই সঙ্গে যায় না। তবে কেন এই সুখের পিছনে ছুটে বেড়ান? ভোগে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। যত তৃষ্ণা, তত কর্মভোগ—দুঃখচক্রে অনন্তকাল ভ্রমণ। একমাত্র নির্বাণেই পরম শান্তি। অমৃত জীবন।

সেখানে মৃত্যু ভয় নেই—'নিত্যসুখ-ধাম পূর্ণ সর্ব্বকাম।' দস্যু শরণাপন্ন হ'লে বুদ্ধ—দস্যুকে ইন্দ্রিয় জয় করতে উপদেশ দেন, অহিংসাকে পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করতে বলেন। বলেন, হিংসা ত্যাগ করলে ত্রাস দূর হবে। সংশয় ত্যাগ করতে এবং চিত্তকে পবিত্র করতে পারলে ভব-ভয় দূর হবে। দস্যুকে হতাশ-সাগর থেকে উদ্ধার করে, কশ্যপকে ভ্রান্ত শাস্ত্রবচনেরও মিথ্যাচারের কারাগার থেকে উদ্ধার করেন। বুদ্ধের বচনে কশ্যপের সংস্কার আহত হয়। তার ধারণা—দেবপূজায় জীববলি শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং বুদ্ধের উপদেশ শাস্ত্রবচনের বিরোধী। বুদ্ধ কশ্যপের প্রতিবাদ খণ্ডন করতে বলেন—দেবতারা যদি বলিদানে তুষ্ট হন তবে দৈত্যের সঙ্গে দেবতার পার্থক্য কোথায়? দেবতার কোন শক্তি নেই। কর্মই বলবান। সুখদুঃখ কর্মের অধীন, দেবতার ইচ্ছার অধীন নয়। কর্মক্ষয়েই দুঃখের নিবৃত্তি। যে ঈশ্বর মানুষকে নিরন্তর কষ্ট দেন, তাকে দেবতা বলা অন্যায়। তাঁর কাছে বলি দিয়ে কোন ফল নেই। আত্মজয় কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর, পাপ বর্জন কর; ধর্ম অর্জন কর। হিংসা ও পাপকর্ম পরিহার কর; হিংসার চেয়ে বড় পাপ আর কিছুই নেই। এই বচনে কশ্যপের চোখ

খুলে যায়—কার্য-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে প্রকৃত ধর্ম লাভ করেন। বণিককেও কর্ম-ফল খণ্ডন করবার উপায় বলে দেন—বলে দেন 'কর্মফল না রহিবে আত্মবোধ ত্যাগে'। বিশ্ববাসী প্রত্যেককে আলোক দেওয়ার জন্য নানা দেশে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

* [কশ্যপ নিশ্চয়ই সেই বিদ্যাদর্পে-দর্পিত ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি নন, যা'কে বিষ্ণু বিদ্যাবলে পরাজিত করতে চেয়েছিলেন। দ্বন্দ্ব বলতে যা' বুঝায় এখানে তা' নেই। কশ্যপের বিদ্যাবলের সঙ্গে বুদ্ধের বিদ্যাবলের বুঝাপড়া হ'লে তবেই—দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যেত। বুদ্ধের প্রতিপক্ষকে দুর্বল ক'রে নাট্যকার বুদ্ধ-চরিত্রকেও দুর্বল করে ফেলেছেন। যে প্রতিপক্ষ একটি উক্তির আঘাতেই পায়ে লুটিয়ে পড়ে, তাকে জয় করার মধ্যে বিজয়ীর গর্ব করার কিছু নেই। যে নাট্যকার নায়কের প্রতিপক্ষকে দুর্বল করেন, নায়ককে বড় করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারেই তিনি নায়ককে ছোট ক'রে ফেলেন] **পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে**—চরিত্র-সৃষ্টিতে মেলোড্রামা-সুলভ চমকপ্রদ কিছু ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছে; পরিস্থিতিটি বাস্তবিকই অকল্পনীয়। সিদ্ধার্থ শুদ্ধোদনকে চেনেন না, শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে চেনেন না। যত নাটকীয়ই হো'ক এ অবস্থা শোচনীয়ভাবে অবিশ্বাস্য। বুদ্ধমাত্রেই বোধি-বংশের সন্তান, এই তত্ত্বটুকু জানাবার জন্য—এই কৃত্রিম তথা অতিনাটকীয় পরিস্থিতি-কল্পনা করায় দৃশ্যটির বাস্তবতা-গুরুত্ব বহুপরিমাণে কমে গেছে এবং চরিত্র-সৃষ্টি-ক্ষমতার দৈন্যও ফুটে উঠেছে। সিদ্ধার্থ এবং শুদ্ধোদন কোনও চরিত্রই এখানে সুন্দর শিল্পকর্মের মর্যাদা পায়নি। এখানেও শুদ্ধোদনকে ও গৌতমীকে ছোট একটু বক্তৃতার আঘাতেই বশীভূত করা হয়েছে। **তৃতীয় গর্ভাঙ্কে** গোপার সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎকার এবং রাহুলের দীক্ষা দেখান হ'য়েছে। গোপা পতিবিরহে মৃতপ্রায়। তমালের মূলে বসে পূর্বকথা স্মরণ ক'রে বিলাপ করছেন। মৃত্যুর আগে পতিদর্শনলালসা অত্যুগ্র। দেখার জন্য কাতরপ্রার্থনা জানান—'এস, এস বিলম্ব ক'র না', সেই মুহূর্তেই সিদ্ধার্থ প্রবেশ ক'রেন এবং সন্ন্যাসিনী গোপাকে মায়া-মোহ পরিত্যাগ করতে বলেন।

তাঁকে জানিয়ে দেন—'জন্ম-মৃত্যু ঘুচেছে এবার।' গোপা রাহুলকে পিতৃধন চেয়ে নিতে বললে রাহুল পিতার কাছে সম্পত্তি চায়। সিদ্ধার্থ রাহুলের হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দেন। * [পুত্রের হাতে পিতা ভিক্ষাপাত্র তুলে দিচ্ছেন—এই আচরণটুকু সিদ্ধার্থ-চরিত্রের শেষ কার্য এবং কার্যহিসাবেও মহিমময়। রাজ-পুত্রের হাতে ভিক্ষাপাত্র!—তৃষ্ণাজয়ের চমৎকার সংকেত। বৌদ্ধসাধনার বীজমন্ত্রটির সুন্দর সাংকেতিক প্রকাশ]

বুদ্ধদেবচরিত-নাটকের ঘটনা ও চরিত্রপরিকল্পনার ভিতর দিয়ে নাট্যকার, তৃষ্ণা, তৃষ্ণার পরিণাম, মহাজীবনের আর্তি, তৃষ্ণাজয়ের সংগ্রাম এবং সংগ্রামে জয়লাভ বা নির্বাণলাভ—এই বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করতে চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধার্থের জীবন-সাধনা দুঃখজয়ের—দুঃখের আত্যন্তিক পরিনিবৃত্তির সাধনা—নতুনপথে আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা–কর্মদ্বারা কর্মক্ষয় ক'রে বোধিসত্ত্ব লাভের সাধনা—এক কথায় পরমপুরুষার্থলাভের সাধনা। এই হিসাবে, বুদ্ধের জীবন, জীবন-বিমুখের বা পরাজিতের জীবনসংগ্রাম থেকে পলায়নের প্রয়াস নয়, বুদ্ধের জীবন জীবনের প্রেমে মহাজীবনলাভেরই আয়াস। যে মায়ামোহ (কামিনী+কাঞ্চন) ত্যাগ করতে সাধারণ মানুষ চোখে অন্ধকার দেখে, বুদ্ধ সেই মায়া-মোহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে—সমস্ত প্রেয় বিসর্জন দিয়ে, মহাজীবনের পরানুরাগে, দুঃখজয়ের অটল সঙ্কল্প নিয়ে বিশ্বপথে বেরিয়ে পড়েছেন।

অর্থলাভের বা কামলাভের জন্য যে অদম্য সংগ্রামের রূপ আমরা দেখে থাকি—'সংগ্রাম' বলতেই যে-সব সংগ্রামের কথা আমাদের মনে হয়. বুদ্ধের এই সংগ্রাম ঐ সমস্ত সংগ্রামের চেয়ে কম তীব্র বা কম দুঃসাধ্য তে নয়ই, বরং আরো তীব্র, আরো দুঃসাধ্য। বুদ্ধ অসাধারণ মুক্তিযোদ্ধা—আধ্যাত্মিক মুক্তি-সংগ্রামের অটলসঙ্কল্প ও অকুতোভয় যোদ্ধা। সিদ্ধার্থের এই বীরত্বকে শুধুমাত্র ধর্মবীরত্ব বললে যথেষ্ট বলা হয় না। পরিভাষা তৈরি করে বলতে গেলে বলা যায়—মোক্ষ-বীরত্ব বা মুক্তি বীরত্ব। যে মৌলিক ভাবের প্রেরণায় বুদ্ধ তৃষ্ণাজয়ের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাকে 'দেবতাবিষয়ারতিঃ'

বলা চলে না ; বলা যায়—মুক্তি-রতি—মুক্তিবিষয়ারতি। এই হিসাবে বুদ্ধদেব-চরিত নাটক অবশ্যই মুক্তিরসের বা নির্বাণরসের নাটক। নির্বেদ, উৎসাহ শম প্রভৃতি সঞ্চারিভাবের সংযোগে এই রস নিষ্পন্ন হ'য়েছে। (শাস্ত্রে দেবতা-বিষয়ারতির পরিভাষিক নাম—'ভাব'। 'মুক্তিবিষয়ারতি'কেও আমরা সংক্ষেপে 'ভাব' বলতে পারি এবং সেই হিসাবে—নাটকখানি 'ভাব-রসের নাটক। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার—সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে, মুক্তি-রসের উল্লেখ না থাকলেও,—'মুক্তি-রস' কল্পনা বলা যায় না। প্রযোজন-অনুসারে ভাবের বিশিষ্টতাকে ভিত্তি ক'রে নতুন নতুন 'রস' কল্পনা করা হ'য়েছে। ভক্তিরস, শান্তরস, দাস্যরস প্রভৃতিই তা'র দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেবচরিত-নাটকের রস-নিরূপণের-ক্ষেত্রে 'ভক্তি-রস' বা 'শান্তরস' উপযুক্ত পরিভাষা ব'লে গণ্য হতে পারে না, কারণ নির্বাণের বা মুক্তির সম্পূর্ণ তাৎপর্য ভক্তি বা শম শব্দের তাৎপর্যে ধরা পড়ে না। ভক্তিরসের আস্বাদন বা শান্তরসের আস্বাদন থেকে নির্বাণরসের আস্বাদন অনেকাংশে ভিন্ন। পরমপুরুষের আবেগ হিসাবে অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে এর একটা সামান্য ঐক্য আছে বটে, কিন্তু এই সামান্য ঐক্যের বাইরেই রয়েছে—বিশেষ পার্থক্য। মনে রাখতে হবে—নির্বাণের কামনা কোন দেবদেবীর পূজার্চনার আবেগ নয়, এমন কি 'স্বরূপে অবস্থান' করার অর্থাৎ আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের আবেগও নয় ; এ কামনা তৃষ্ণাক্ষয়ের সাধনা—তৃষ্ণার মূলোৎপাটন করার আবেগ। মোক্ষ বা মুক্তির সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক থাকলেও—'নির্বাণতত্ত্ব' একটি স্বতন্ত্র ধারণা—অতএব স্বতন্ত্র 'ভাব'।)

ইউরোপীয় শ্রেণী বিভাগপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে, বুদ্ধদেব-চরিতের জাতি-পরিচয় নির্ধারণ করতে গেলে, বলতে হবে—নাটকখানি **ধর্মমূলক কমেডি** আরো নির্দিষ্টভাবে বললে—ট্র্যাজি-কমেডি। 'গে-কমেডি'বা 'সিরিয়াস' কমেডি'র আবহাওয়া থেকে এর আবহাওয়া স্বতন্ত্র। যদিও তৃষ্ণাজনিত আর্তি নিয়ে সুরু এবং তৃষ্ণাজয়ের শান্তিও আনন্দে শেষ, তবু এর পরিমণ্ডলে ব্যথা-

বেদনার বাষ্পের মাত্রা উপেক্ষণীয় নয়। সিদ্ধার্থের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটতে ঘটতে কমেডি-পরিণাম ঘটেছে—এই যুক্তিতে যে নাটকখানিকে ট্র্যাজি-কমেডি বলেছি, তা' নয়; বলেছি এই কারণেই যে সিদ্ধার্থের পিতার বেদনা, মাতার বেদনা এবং স্ত্রীর বেদনা—চাপা কান্নার মতো নাটকের বুকে চেপে আছে।

সংসারী মানুষের প্রাণ, সংসার-কামী শুদ্ধোদনের ও গোপার বিপর্যস্ত বাসনার বিষাদময় রূপটি, ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারে না। নির্বাণের অমূল্য মূল্য বুঝলেও, পিতার ব্যথায়, পত্নীর ব্যথায় সমবেদনা বোধ না করে পারে না। এ ব্যথা যে দুঃসহ, পতিধর্ম গ্রহণ করার মুহূর্তেও গোপা তা' ভুলতে পারেনি—বলেছে—"এ দশা না হয় যেন কার'—। রাহুলকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাতে গোপা যখন বলেন—"মা হ'য়ে পরাই তোরে সন্ন্যাসীর বেশ'...বা সিদ্ধার্থ যখন রাহুলের হস্তে ভিক্ষাপাত্র তুলে দেন, তখন ধর্মনিষ্ঠার মহীয়ান (sublime) রূপ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই মহীয়ান রূপেও মহীয়ানের (সাবলাইমের) বেদনামিশ্র রূপোল্লাস ব্যক্ত হয়। অবিমিশ্র আনন্দ যে কমেডির উদ্দেশ্য এ সেইজাতীয় কমেডি নয়। বহু চোখের জলের পিছল পথে সিদ্ধার্থ তৃষ্ণাজয়ের অভিযানে অগ্রসর হ'য়েছেন। শেষমুহূর্তে পিতা-মাতা পত্নীর নয়ন ধারা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু চাপা দীর্ঘশ্বাসের বাষ্পে পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত। এই কারণেই নাটকখানিকে শুধু কমেডি না ব'লে ট্র্যাজেডি-কমেডি বলতে চাই। শুধু সিদ্ধার্থের দিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্য অন্য কথা এবং কি কথা আগেই বলেছি।

যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক পাত্র-পাত্রীর সাহায্যে নাট্যকার বুদ্ধ-চরিত উপস্থাপনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শুদ্ধোদন, গোপা, ছন্দক বিম্বিসার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একথা আগেই আলোচনা করেছি—পার্শ্বচরিত্রদের মধ্যে নাট্যকার পরিস্থিতি-অনুযায়ী উপযুক্ত অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ ঘটাতে পারেননি। শুদ্ধোদন যেমন জীবন্ত 'পিতা' হ'য়ে উঠেননি, গোপাও তেমনি জীবন্ত 'পত্নী' হ'তে পারেননি। শুদ্ধোদন যাও বা হ'য়েছেন, গোপা তা'ও

হ'তে পারেননি। যে গুণে চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠে সেই গুণেরই এখানে অভাব। জীবন-সংগ্রাম বা সম্পর্ক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াময়। চরিত্রে পরিস্থিতি-সঙ্গত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটলেই চরিত্রের আচরণে কৃত্রিমতা প্রবেশ করে, চরিত্র আলুগা হ'যে পড়ে। তখনই মনে হয় পাত্র পাত্রীরা নিজেরা আচরণ করছে না, নাট্যকারের ইঙ্গিত-অনুসারেই যেন চলছে। শুদ্ধোদনের আচরণে (গোপার আচরণেও) স্বাভাবিকতা বা সম্ভাব্যতার মাত্রা রক্ষিত হয়নি। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে যে যে অনুভাব সঞ্চারিভাব প্রত্যাশিত তা' তাঁর আচরণে পাওয়া যায় না। শুদ্ধোদনের মধ্যে বাৎসল্য-রসের গভীর কোন রূপ ফুটে উঠেনি; তেমনি গোপার মধ্যেও পতি-প্রেমের উল্লেখযোগ্য কোন অভিব্যক্তি ঘটেনি। যদিও গভীর চরিত্র সৃষ্টি বলতে সাধারণতঃ বুঝায়—"discover the entire range of emotion under the given Circumstance"—তবু খানিকটা আবেগের অভিব্যক্তিই যথেষ্ট নয়। কারণ—The scope of emotion within the dramatic scheme is limited by the scope of the events: the characters can have neither depth nor progression except in so far as they make and carry out decisions which have a definite place in the system of events and which drive toward the root-action which unifies the system."

যে পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি (will) থাকলে, চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, বুদ্ধদেব-চরিত নাটকের চরিত্রগুলিতে সেই পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই কারণেই, শুদ্ধোদন পিতার ব্যক্তিত্ব নিয়ে, গৌতমী মাতার ব্যক্তিত্ব নিয়ে, বিম্বিসার রাজার ও শাক্যের ব্যক্তিত্ব নিয়ে, সন্তোষজনক মাত্রায় ব্যক্ত হ'তে পারেনি। এই সব চরিত্র যতটা সাংকেতিক হয়েছে অর্থাৎ সংকেতের মতো অর্থ-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়েছে, ততটা জীবন্ত—রক্তমাংসের ব্যক্তি হয়ে উঠেনি। ফলে নাটকে, যাকে

বলে 'Unity of opposites'—**দুই সমশক্তি** ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ—(তথা নাটকের ক্রিয়ার দীপ্তি) তার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিক পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে—**গণকদ্বয়** (১ম অঙ্ক-১ম গর্ভাঙ্ক), **যন্ত্রী** (২য় অঙ্ক-১ম গর্ভাঙ্ক), **শিষ্যদ্বয়** (চর্থ অঙ্ক-১ম গর্ভাঙ্ক), **ব্রাহ্মণ** (৪র্থ অ, ২য় গর্ভঙ্ক) ব্রাহ্মণ, দস্যু ও বণিক (৫ম অঙ্ক-১ম গর্ভাঙ্ক), লঘুরস পরিবেশনে নিযুক্ত হয়েছে। তবে এদের লঘু আলাপ, নাটকের গুরুগম্ভীর ঘটনার ভিতর দিয়ে চলার সময় দর্শক মনকে সাময়িক ভাবে আরাম দেয় বটে, কিন্তু এরা হাস্য উদ্দীপিত করতে যে চেষ্টা করেছে অধিকাশ স্থলেই সেই চেষ্টা অতি স্থূল রসিকতা হয়ে উঠেছে। অবশ্য, শিষ্যদ্বয়ের সংলাপে শ্লেষের স্পর্শ আছে এবং তা থাকায় তা স্থূল রসিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে গেছে।

উপসংহারে—নাটকের সংলাপ ও গান সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার নাটকের সংলাপ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, বুদ্ধদেব-চরিত কাব্যিক নাটক ব'লে সংলাপ প্রধানতঃ (দু'চারটে পার্শ্ব চরিত্রের সংলাপ ছাড়া) ছন্দোবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ কাব্যিক নাটকের সংলাপে কল্পনার তান-বিস্তার করার অবকাশ একটু বেশী থাকলেও, এই নাটকের সংলাপে কল্পনা, অর্থাৎ কবিত্ব ফলানোর চেষ্টা, ক্রিয়ার স্বাভাবিক গণ্ডী তেমন লঙ্ঘন করেনি। তৃতীয়তঃ নাটকের বিশেষতঃ বুদ্ধ-চরিত্রের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য, বুদ্ধের উক্তি প্রধানতঃ 'illustrative' হ'য়েছে (প্রায় একই কথা বার, বার, বলা হয়েছে); চতুর্থতঃ—সংলাপ যতটা বর্ণনাধর্মী হয়েছে, ততটা আচরণ-প্রকাশক অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভাষা হয়ে উঠেনি।

বুদ্ধদেব চরিত নাটকে '**গান**' আছে মোট—দশটি।

(১) প্রথম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে—১ম গান। গায়ক—"**মার, আত্মবোধ ও সন্দেহ**"।

(২) ২য় অঙ্কে—১ম গর্ভাঙ্কের শেষে ২য় গান—গায়ক—**দেবদেবীগণ**

(৩) ২য় অঙ্কে—১ম গর্ভাঙ্কে—৩য় গান—গায়ক—**দেববালাদ্বয়**

(৪) ২য় অঙ্কে—২য় গর্ভাঙ্কে—৪র্থ গান—গায়ক— **দেববালাদ্বয়**

(৫) ২য় অঙ্কে—২য় গর্ভাঙ্কের শেষে—**দেববালাদ্বয়ের** গান

(৬) ৪র্থ অঙ্কে—১ম গর্ভাঙ্কে—**দেববালাগণের** গান

(৭) ৪র্থ অঙ্কে—৪র্থ গর্ভাঙ্কে—**রাগ, অরাতি, কাম ও রতির** গান

(৮) ৪র্থ অঙ্কে—৪র্থ গর্ভাঙ্কে—ঐ বিঘ্নকারিগণের গান

(৯) ৪র্থ অঙ্কে—৪র্থ গর্ভাঙ্কে—**সিদ্ধাচারগণ ও দেবদেবীগণের** গান

(১০) ৫ম অঙ্কে—৩য় গর্ভাঙ্কের শেষে—বালকগণের গীত

এতগুলি গান যেখানে আছে সেখানে এ প্রশ্ন উঠবেই—উঠতে পারেও—গানগুলি নাটকের নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ ক'রেছে কি না অর্থাৎ যাত্রানাটকের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে কি না। নাটকে গানের অবকাশ আছে কি না, থাকলে কতখানি আছে—এ প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না ক'রে, এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'য়েছে তা উল্লেখ করলেই, মনে করি, উল্লিখিত মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হবে।

যাত্রা-নাটকে 'গান'-যোজনার রীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—যাত্রায় অনেকক্ষেত্রেই গান, মূল কাহিনীর সঙ্গে অপরিহার্য প্রয়োজনের যোগে যুক্ত নয়, যেখানে যুক্ত সেখানেও ক্ষীণসূত্রে যুক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়—যাত্রায় গান কাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে তাকে বিনা প্রয়োজনেও আসরে নামতে হয়। যাত্রায় অধিকাংশস্থলেই পাত্র-পাত্রীর আবেগপূর্ণ মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতে গানের সাহায্য নেওয়া হয় এবং বিরাম-ক্ষণটিকেও গান দিয়ে পূর্ণ ক'রে রাখা হয়। পাত্র-পাত্রীরা আবেগের মাত্রা চড়লেই যেমন 'গানের' সুরে তা' ব্যক্ত করেন, তেমনি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট, ঘটনার তাৎপর্য প্রভৃতি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার জন্যও "বিবেক" তার দলবল নিয়ে প্রস্তুত থাকে। এই কারণেই, যাত্রা নাটকে গান নিছক বাহ্যিক অলংকার মাত্র নয়, গান সংলাপের মতোই, রসসঞ্চারের অন্যতম উপায়—রসসঞ্চারের ও তত্ত্বপ্রচারের মাধ্যম।

নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার রীতি ভিন্ন বলে, নাটকে গানের অবকাশ কম। পাত্র-পাত্রীর পরিবেশ ও মানসিক অবস্থা থেকে গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে না বের হ'লে, গান যোজনা অবাঞ্ছিত ঘটনার মতোই অনুচিত। নাটকে গানকে, সংলাপের মতো, চরিত্রের স্বাভাবিক অভি-ব্যক্তি হয়ে উঠতে হবে—পরিস্থিতি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নিতে হবে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে যে গান জন্মে না সে গান অনাটকীয়।

এই মূল সূত্র সামনে রেখে বুদ্ধদেব-চরিতের গানগুলির নাটকীয়ত্ব পরীক্ষা করা যাক। তবে পরীক্ষাকালে একথাটা সবসময়েই মনে রাখতে হবে যে, নাটকের 'বিষয়বস্তু'—অতিপ্রাকৃত ঘটনাময়—ঘটনায় স্বর্গ-মর্ত্যের পাত্র পাত্রীরা জড়িত। অর্থাৎ এখানে পাত্র পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধু লৌকিক চরিত্রের আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেবদেবীর আচরণও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই পৌরাণিক পরিমণ্ডলের কথা বিস্মৃত হ'লে, যে যে পরিস্থিতিতে গান যোজনা করা হ'য়েছে তার কাছে আমরা সামাজিক-নাটকোচিত বাস্তবিকতা দাবী ক'রে বসতে পারি। এ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক।

গান সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, গানগুলির একটি ছাড়া সবগুলিই গেয়েছে—অতিপ্রাকৃত পাত্র-পাত্রী **প্রথম গান** করেছে—"মার আত্মবোধ ও সন্দেহ"—অর্থাৎ কয়েকটি রূপক-চরিত্র এবং গেয়েছে একটি আবেগগর্ভ মুহূর্তে —মহামায়ার গর্ভপাত ঘটাবার চক্রান্ত—বুদ্ধের জন্ম যা'তে না হ'তে পারে তারই চক্রান্তকে—কার্যে পরিণত করার সময়ে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ লৌকিক নয় ব'লে লৌকিকের বাস্তবিকতা দাবী করা এখানে সঙ্গত হবে না। **দ্বিতীয় গান** করেছে—দেবদেবীরা—সম্পূর্ণ অলৌকিক জগতের ঘটনা—গানে বুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করায় দেবদেবীর উল্লাস ব্যক্ত হ'য়েছে। একেবারে অনপেক্ষিত যোজনা বলা যায় না। **তৃতীয় গান** করেছে—দেববালাদ্বয়—যন্ত্রীর কাছে গানের পরীক্ষা (পরীক্ষার রূপটা অবশ্য তেমন ফোটেনি) দেওয়ার সময়

যন্ত্রীর অনুরোধে। কাহিনীর সঙ্গে এই গানের যোগ অধিকতর অন্তরঙ্গ। **চতুর্থ গান** করেছে—এই দেববালারাই গানের ভিতর দিয়ে সিদ্ধার্থের মধ্যে বৈরাগ্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে; এদের কণ্ঠে যাত্রার বিবেক-চরিত্রের সুর শোনা গেলেও, এরা নাটকীয় কাহিনীর পরিবেশেরই একজন বলে, এই গানে নাটকীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। **পঞ্চম গান** করেছে—দেব-বালারা—শূন্যে—সিদ্ধার্থের স্বপ্নভাঙার উদ্দেশ্যে। দেববালারা শূন্যে গান করলে আপত্তি করা যায় না। আপত্তি করলে দেববালাতেই আপত্তি করতে হবে। **ষষ্ঠ গানও** করেছে—দেববালাগণ,—সিদ্ধার্থকে মধ্যপন্থার নির্দেশ দেওয়ার অভিপ্রায়ে। সিদ্ধার্থের জীবন দৈব-অভিপ্রায়েরই মর্ত্য রূপ—এটুকু স্বীকার করতে পারলে দেববালার নির্দেশদানের আবশ্যকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন জাগে না। **সপ্তম গান**—গান করেছে—রাগ-অরাতি-কাম-রতি প্রভৃতি রূপকচরিত্র—অপদেবতারা। সিদ্ধার্থের ধ্যানভঙ্গ করবার জন্য এদের চেষ্টা অবশ্য-প্রদর্শনীয় এবং ধ্যানভঙ্গে গানের যোগ্যতাও অবশ্য স্বীকার্য। **অষ্টম গান** করেছেন—ঐ বিঘ্নকারিগণই এবং একই উদ্দেশ্যে। **নবম গান** করেছেন—সিদ্ধাচারগণ এবং দেবদেবীরা সিদ্ধার্থের বোধিসত্ত্বলাভের পরে—'আনন্দ-উৎসব' করতে। যার জন্য এত চেষ্টা, সেই ফল পাওয়ার পরে দেবদেবীর আনন্দ হবে, এ তো সহজেই অনুমেয়, অতএব প্রত্যাশিতও। **দশম গান** করেছে—"অপর সকলে" (বালকগণ, শিষ্যগণ, সিদ্ধার্থ, গোপা ও রাহুলকে বেষ্টন ক'রে—উপসংহার সংগীত। এও আনন্দ-সংগীত। গ্রীক-কোরাসের মত ভাগ ভাগ হ'য়ে স্ত্রীপুরুষরা গান ক'রেছে। এই গান অনপেক্ষিত ও অস্বাভাবিক নয় ব'লে অনাটকীয়ও বলা যায় না।

উপসংহারে একটি কথাই শুধু বলতে চাই—নাটকের জাতি-প্রকৃতি নিরূপণ না ক'রে, নাটকের কোন উপাদানেরই নাটকীয়ত্ব বিচার করা সম্ভব নয়—গানেরও নয়।

———

মেবার পতন

বাংলা সাহিত্যে 'রোমান্টিক ঐতিহ্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল

'রোমান্টিক ঐতিহ্য' কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজি "Romantic Tradition" কথাটারই আংশিক অনুবাদ—অর্থাৎ 'রোমান্টিক' শব্দটাকে অপরিভাষিত রেখে যতটুকু অনুবাদ সম্ভব ততটুকুই। সাহিত্যসমালোচনায় বহু ব্যবহৃত এই 'রোমান্টিক' ও 'রোমান্টিসিজম্' শব্দ দু'টি, বাংলা পরিভাষার অভাবে, অবিকৃতরূপেই বাংলায় পাংক্তেয় হয়ে গেছে—"রোমান্টিক" কবির ও কাব্যের বিশেষণ রূপে এবং "রোমান্টিসিজিম্" অন্যান্য "ইজমেরই মতো একটা সাহিত্যিক "ইজ্‌মের" নাম রূপে। কিন্তু আসল সমস্যা উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি করায় বা পাংক্তেয় করে নেওয়ায় নয়; আসল সমস্যা সেখানেই যেখানে শব্দ দু'টি বহু ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অনির্দিষ্টার্থক। রোমান্টিসিজিম ব'লতে যেমন একটিমাত্র এবং নির্দিষ্ট প্রবণতা বুঝায় না, তেমনি 'রোমান্টিক' বলতেও সুনির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য বুঝায় না। দেখা যায়, সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থে রোমান্টিসিজিমের আগে পরস্পরবিরোধী নানা বিশেষণ বসেছেঃ—যেমন national Romanticism, Reactionary Romanticism, imitative romanticism এবং 'রোমান্টিক' শব্দটিকেও নানা তাৎপর্যে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন Romantic tradition, romantic subjectiveness, romantically conceived', Romantic. Historical Romantic plays ইত্যাদি। এমনি অর্থবৈচিত্র্য দেখে জনৈক সমালোচক বলেছেন—the word has been so tumbled about, battered out of shape and generally misused that the heart sinks at the very name of it." (Psychology and Literature—F. L. Lucas)। উক্ত গ্রন্থেই সমালোচক

শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং নিজে নতুন একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত এই সংজ্ঞাগুলি তিনি উদ্ধৃত করেছেন :—

'The revolt of Emotion against Reason'—

"Romanticism is the grotesque" (Hugo)

Reawakening of the Middle ages (Heine)

addition of "strangeness" to beauty (Pater)

"a withdrawal from outer experience to concentrate on inner experience"—(Lascelles Abercombie)

এবং এই সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করে সমালোচক দেখিয়েছেন—এদের কোন-টিই অব্যাপ্তিদোষ এড়াতে পারেনি। প্রথমতঃ, বুদ্ধির উপর আবেগের প্রাধান্যকে লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করলে, প্রায় সকল কবিকেই রোমান্টিক বলতে হবে, কারণ আবেগ বেশী কম সকলের মধ্যেই আছে। দ্বিতীয়ত, গেটের কথা অর্থাৎ Romanticismকে 'deseased' ব'লে স্বীকার করলে 'Ancient Mariner' এর কী দশা হবে ? তৃতীয়তঃ "grotesque" যদি লক্ষণ হয়, তবে "La Belle Dame sans Merci" অবশ্যই বাদ পড়ে যাবে। চতুর্থতঃ 'মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ' যদি লক্ষণ হয়, তা' হ'লে 'werther' প্রভৃতিকে বাদ দিতে হয়। পঞ্চমতঃ 'সুন্দরকে রহস্যময় করে তোলা'ই যদি রোমান্টিসিজিমের লক্ষণ হয়, তাহ'লেও সব ক্ষেত্রে লক্ষণটি প্রযুক্ত হবে না। ষষ্ঠতঃ ব্রুনেতিয়ের যে রোমান্টিসিজিমকে 'সাহিত্যিক অহমিকার অন্ধ উচ্ছ্বাস' বলেছেন তাও সম্পূর্ণ মানা যায় না, কারণ Ancient Mariner-কে ঠিক 'অহমিকার উচ্ছ্বাস' বলা চলে না। সপ্তমত, এবারকোম্বি মহাশয় 'রোমান্টিসিজম'কে যেভাবে বাস্তব-বাদের বিপরীত মতবাদ ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন তাও ঠিক নয়, কারণ স্কটের অপ্রধান চরিত্রগুলির বাস্তবতা খুবই লক্ষণীয়; তারপর রোমান্টিসিজিম ও রিয়েলিজিমের অদ্ভুত সংমিশ্রণ পাওয়া যায় বালজাকে, ডিকেন্স প্রভৃতির মধ্যে।

অষ্টমতঃ সমালোচক অধ্যাপক লাভজয়ের আলোচনার অবতারণা করেছেন। অধ্যাপক এ. ও. লাভজয় [তাঁর এসেস্ ইন দি হিষ্ট্রী অফ্ আইডিয়াস গ্রন্থে (১৯৪৮)] প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—রোমান্টিসিজিম বলতে একটি মাত্র অর্থ বা প্রবণতা বুঝায় না, সুতরাং শব্দটি বর্জন করাই উচিত। ইংল্যাণ্ডে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম টেম্পল্ চৈনিক উদ্যানের “মনোহর অসামঞ্জস্যে’—মুগ্ধ হয়ে এবং ১৭৪০ খৃ বেটি ল্যাঙ্‌লে ও স্যাণ্ডারসন মিলার “গথিক স্থাপত্য” পুনঃপ্রবর্তন করতে চেষ্টা করে রোমান্টিসিজিমের যে প্রবণতা সৃষ্টি করেন, শেকস্‌পীয়রের প্রভাব থেকে আসে তা’ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবণতা, জে ওয়ার্টন যাকে বলেছেন—প্রকৃতিসুলভ বন্যতা (wildness)। অন্যদিকে জার্মাণীর রোমান্টিক এফ শ্লেগেল অন্যভাবে এগিয়েছেন। তিনি irregularity-র বা ‘wildness’-এর উপাসক নন, তাঁর মতে—প্রাচীন শিল্পকলা স্থিতিধর্মী (static) এবং সংকীর্ণ, আধুনিক শিল্প গতিধর্মী, বিবর্তনকামী, প্রগতিশীল এবং সার্বজনীনতা-অভিলাষী। মোট কথা—জটিলতার অন্ত নেই। জটিলতা আরো বেড়েছে “প্রকৃতি”-পূজা বা অনুরাগ কথাটি নিয়ে। অধ্যাপক লাভজয় “প্রকৃতি”-পূজার ৬১ রকম অর্থ বা ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। এই অর্থ-অরাজকতার মধ্যে লুকাস নতুন ব্যাখ্যা যোজনা করতে চান—বলতে চান “there is a common factor in all Romanticism”—and this factor is psychological”। তাঁর মতে অহম্ (ইগো) তিনটি শক্তির অধীন : এক —প্রবৃত্তি (id) অর্থাৎ আদিম আবেগময় সত্তা—যার মুখে শুধু ‘চাই চাই’রব ; দুই নিবৃত্তি (সুপার-ইগো বা ইগো-আইডিয়াল) অর্থাৎ বিবেক, যে শুধু পেয়েই তুষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাধর্ম বিচার করে এবং তিন—বাস্তব-বৃত্তি (রিয়েলিটি-প্রিন্‌সিপিল্)—যে আমাদের সতর্ক করে দিতে বলে—দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু মায়া—ভ্রান্তিমাত্র। লুকাস বলতে চেয়েছেন—It seems possible to suggest that in literature Realism corresponds to a dominance

of the 'reality principle', classicism, very roughly, to a dominance of the "Super-Ego", Romanticism, also very roughly, to a dominance of impulses from the "id".

লুকাসের এই সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ অব্যাপ্তিদোষমুক্ত কি না বলা শক্ত, কারণ dominance of impulses' এবং 'the revolution of Emotion against Reason'—মূলতঃ প্রায় একই কথা।

বিখ্যাত নাট্যতত্ত্বজ্ঞ এবং সমালোচক জন হাউয়ার্ড লসন মহাশয় 'রোমান্টিসিজম্' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—শব্দটি "রোমান্স" কথাটি থেকে ব্যুৎপন্ন এবং একাধিক অর্থে বা "aggregate of moods" বুঝাতে ব্যবহৃত। যেমন—

(১) যেহেতু ক্লাসিসিজিমের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রোমান্টিসিজম্ দেখা দিয়েছিল 'রোমান্টিসিজিম্ বলতে—প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—বিধিসম্মত রূপের বা গঠনের প্রতি বিরাগ—"freedom from rigid conventions", "disregard of form"—বুঝায়।

(২) আবার, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে, অর্থাৎ জটিল ও কৃত্রিম রীতির রচনা বুঝাতে—(to describe an elaborate and artificial style as opposed to a simple mode of expression—) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

(৩) তারপর, যে রচনায় কায়িক ক্রিয়ার ও অদ্ভুত ঘটনার বাহুল্য থাকে—'works' which abound in physical action and picaresque incident—সেই জাতের রচনা বুঝায়।

(৪) বাস্তব পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি—মনগড়া ভাবের সাধনা বুঝাতে ব্যবহৃত হয় (escapism turning away from physical reality, seeking after romantic llusion)

(৫) স্বাধীন কল্পনাপ্রবণতা ও সৃষ্টি-কামনা প্রভৃতি (imagination

creativeness as opposed to a pedestrian or pedantic quality)—বুঝাতে প্রযুক্ত হয়।

(৬) দার্শনিক তাৎপর্যে—পরাদর্শন-রহস্যের প্রতি প্রবণতা এবং বস্তুবাদ-বিমুখতা।

(৭) মনস্তাত্ত্বিক অর্থে—আত্মাভিমুখিতা—আত্মসংসক্ততা (subjectiveness) বুঝায়—"subjective as opposed to an objective approach" বুঝায়,—emphasis upon emotion rather than upon commonplace activity—বুঝায়।

উল্লিখিত প্রবণতাগুলি নির্ধারণ করে লসন্ বলেছেন—সমালোচকরা শব্দটির পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেননি এবং করেননি এই কারণেই যে তাঁরা ' has inherited the system of thought which constitutes romanticism" এই চিন্তাতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দুটি ; এক—ব্যক্তি-আত্মার নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস (idea of the uniqueness the individual soul, দুই—ব্যক্তিত্বের আবেগময়তায় বিশ্বাস (idea of personality as a final emotional entity.)। এই ধরণের চিন্তায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা অবশ্যই শিল্পকলাকে—"subjective and metaphysical" বলে গণ্য করবেন এবং এই বিশ্বাসেই আস্থা রাখবেন—'art is woven of the staff of imagination which is distinct from the staff of life, এবং এই সিদ্ধান্তই করবেন—art is necessarily a sublimation—seeking after illusion……free action can exist only in a dream world··· since art is irrational it must escape from conventional forms.....

অধিকন্তু, সমালোচক লসন রোমান্টিক আন্দোলনের দ্বৈত প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা' বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ক্লাসিসিজিমের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা'কে "রোমান্টিক" আখ্যা দেওয়ার কারণ এই

যে রোমান্স-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল লাতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই—"This is impostant; because it indicates the dual nature of the romantic movemant: it wished to break away from stuffy tradition to find a fuller and more natural life; it suggested comparison with the medieval poets who broke away from Latin and spoke in the language of the people. But the fact that the romantic school was based on such a comparison also shows its regressive character, it looked for it in the past. Instead of facing the problem of man in relation to his environment it turned to the metaphysical question of man in relation to the universe.—

এই দ্বৈতপ্রকৃতিকতাকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝাতে গিয়ে লসন্ যে আলোচনার অবতারণা করেছেন, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিত্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণে তা যথেষ্ট আলোকপাত করে। জার্মাণ রোমান্টিসিজমের প্রবণতা নিরূপণ করতে, তিনি লিখেছেন—একদিকে রয়েছে ব্যক্তিজীবনের পূর্ণবিকাশের আকাঙ্ক্ষা, বস্তুবিশ্বের সমস্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার কামনা; অন্যদিকে রয়েছে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা—নিত্য সনাতন চিরস্থায়ী সত্তার সন্ধান। * (Combining a desire for a richer personal life, a desire to explore the possibilities of the real world with a tendency to seek a safe refuge, to find a principle of permanence.) ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে রোমান্টিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে যেমন ছিল এই দো-টানা ভাব, তেমনি ছিল, আগেই যা' বলা হয়েছে, একটা অতীতনির্ভরতা—অতীত-মুখাপেক্ষিতা। . Georg Brandes (তাঁর Main Currents in Nineteenth Century Litera-

ture ১৯০৬) গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন যে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদের এবং রোমান্টিকতার মধ্যে অতীতনির্ভরতা ছিল। তাঁর মন্তব্য—The patriotism which in 1813 had driven the enemy out of the Country contained two radically different elements—a **historical retrospective tendency** which soon developed into romanticism, and a liberal minded progressive tendency, which developed into the **new liberalism**" অর্থাৎ তখনকার রোমান্টিকতায় দুটি প্রবণতা ছিল—একটি পুরাতন ইতিহাস স্মরণ অর্থাৎ ঐতিহ্য স্মরণ ক'রে আত্মসংবিদ জাগানোর চেষ্টা; অন্যটি—উদার-মনা প্রগতিকামিতা—নব মানবতার চেতনা।

সমালোচক জন হাউয়ার্ড লসন মহাশয়ের আলোচনার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে রোমান্টিকতার মধ্যে প্রগতিশীল উদার চিন্তাভাবনা যতই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, রোমান্টিক দৃষ্টি 'Instead of facing the problem of man in relation to his environment' মানুষের সমস্যাকে পরিবেশ-সাপেক্ষ ক'রে না দেখে, সমস্যা সমাধানে পরিবেশের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকার না ক'রে, আত্মার অনির্বচনীয় স্বরূপের মধ্যে, ব্যক্তিত্বের অনির্দেশ্য প্রকৃতির মধ্যে জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পেতে চায়। লসনের মতে প্রকৃত রিয়েলিষ্ট তিনিই যিনি মানুষের জীবন সমস্যাকে ব্যক্তির আচরণকে "in relation to his environment" রূপ দিতে চান। অন্যভাবে বললে বলা যায় যিনি মানুষের 'uniqueness of soul "আত্মার অনির্বচনীয় স্বরূপ স্বীকার করেন না, ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মহিমা স্বীকার ও প্রচার করেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সব বাস্তববাদী লেখক এসেছিলেন তাঁরাও—লসন বলেন—"did not achieve a clean break with romanticism—it was a new phase of the same system of

thought" এ কথা সত্য যে বাস্তববাদীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-পীড়িত জীবনের রূপ উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু—"they evolved no integrated Conception which would explain and solve these problems"। এমন কি বাস্তববাদীদের অগ্রণী যে ইবসেন তিনিও "Master Builder" নাটকে রোমান্টিক প্রবৃত্তির সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি। লসনের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে প্রকৃত বাস্তববাদিতা তখনই সম্ভব যখন রোমান্টিসিজমের সঙ্গে "clean break" অর্থাৎ পরিষ্কার বিচ্ছেদ ঘটে—সুসমঞ্জস বাস্তববাদী জীবন দর্শনের আলোকে জীবন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরণের প্রকৃত বাস্তববাদিতার সঙ্গে কৃত্রিম বাস্তববাদিতার অর্থাৎ সাধারণ বাস্তব-প্রবণতার লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। লুকাস যখন বলেন—"Sometimes Romantics have called in Realism as an ally against the unreal Conventions of classicism ; sometimes classicists have appealed to Realism against the fantastic dreams of Romanticism—তখন 'realism' শব্দে সাধারণ বাস্তবপ্রবণতার কথাই বলেন—বাস্তবিক রূপ দেখার বা আঁকার প্রবণতাই বুঝাতে চান।

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই এ কথাটা বুঝতে পেরেছি যে রোমান্টিসিজম্‌কে দু'এককথায় বুঝানো সম্ভব নয় এবং নানা মুনির নানা মতে এ ক্ষেত্রও কণ্টকিত। আমরা দেখলাম—মূল লক্ষণ নির্ধারণে, এফ, এল লুকাস এগিয়েছেন মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে এবং জন হাউয়ার্ড লসন ভিত্তি করেছেন—দর্শনকে। কিন্তু পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়ার দিকে আমরা যে খুব একটা এগিয়ে এসেছি এ কথা বলা চলে না। অতএব আমরা এখানে সূত্রগুলি গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

'রোমান্টিক' ও 'রোমান্টিসিজম' শব্দ দু'টি যদি 'রোমান্স' কথাটা থেকে ব্যুৎপন্ন হয়ে থাকে, তা'হলে রোমান্সের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যে 'রোমান্টিকতা'র

—বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা দরকার, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন। 'রোমান্টিক' ব'লতে, গোড়াতে নিশ্চয়ই 'রোমান্স সুলভ' বা 'রোমান্সের মতো' —এই অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে রচনার গঠনরীতি রোমান্সের মতো তাকে বলা হয়েছে—রোমান্টিক; যার ঘটনা বিন্যাস, পরিস্থিতিকল্পনা, চরিত্রের আচরণ রোমান্সের মতো তাকে বলা হয়েছে—রোমান্টিক; যার বিষয়বস্তু রোমান্সের বিষয়বস্তুর মতো তাকে বলা হয়েছে 'রোমান্টিক' এবং যে কবির মন রোমান্স-স্রষ্টার মনের মতো, তাঁকে বলা হয়েছে রোমান্টিক। প্রথমতঃ রোমান্সের গঠন-রীতি প্রাচীন গঠন-রীতি থেকে স্বতন্ত্র; রোমান্সে —"many actions of many men" উপস্থাপিত এবং প্রাচীন ঐক্য-বিধি —স্থান-কাল-কার্য-ঐক্য লঙ্ঘিত। এখানে প্রাচীন রূপ-রীতির [লাতিন ভাষা ও ঐক্যবিধি] বিরুদ্ধে লক্ষণীয় বিদ্রোহ দেখা গেছে। অতএব বিদ্রোহপ্রবনতা রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু নাইটদের প্রেমবীরত্বের কাহিনী। এই বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য থেকে রোমান্টিকতার অন্য দু'টি লক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। নাইটদের প্রেম-বীরত্বের কাহিনীতে ঘটনাবিন্যাস, পরিস্থিতিকল্পনা এবং চরিত্রের আচরণ, অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ, অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক। এই কারণে যে রচনার ঘটনাবিন্যাসে চমক সৃষ্টির চেষ্টা থাকে, পরিস্থিতি কল্পনায় অসাধারণ স্থান-কাল ব্যবহার করার ঝোঁক দেখা যায়, এবং চরিত্রের আচরণে রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষের রীতি-নীতি প্রকাশ না পেয়ে ভাবাবেগ বা আদর্শনিষ্ঠার ঐকান্তিক আতিশয প্রকাশ পায়, সেই রচনাকে—'রোমান্টিক' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার-সমালোচক—দেনিস দিদেরো 'রোমান্টিক' নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"A play is ramantic when the marvelous is caused by coincidence, if we see Gods or men too malignant, if events and characters

differ too greatly from what experience and history lead us to expect and above all if the relation of cause and effect is too complicated or extraordinary" অর্থাৎ নাটক রোমান্টিক আখ্যা পাবে তখনই যখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা দ্বারা চমৎকার সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে, দেবতাকে বা মানুষকে অতিনিষ্ঠুর দেখান হবে, ইতিহাসে এবং অভিজ্ঞতায় ঘটনা ও চরিত্রকে যেভাবে পাওয়া যায়, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চরিত্র এবং ঘটনা উপস্থাপিত করা হবে এবং ঘটনাবিন্যাসে কার্যকারণের সম্পর্ক যেখানে অতিজটিল বা অস্বাভাবিক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে—ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্র সৃষ্টিতে পরিপাটি ঔচিত্যের তথা বাস্তবতার অভাব এবং চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য আবেগাতিশয্য—যেখানে থাকে, সেখানেই সৃষ্ট 'রোমান্টিক' অর্থাৎ রোমান্সধর্মী হয়ে উঠে। রোমান্স কাহিনীর বাহ্য প্রকৃতি থেকে যেমন উপরোক্ত লক্ষণটি এসেছে, তেমনি বিষয়বস্তুর আন্তর প্রকৃতি থেকে আর একটি লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে। এই লক্ষণটিকে সংক্ষেপে বলা চলে প্রেম ও সৌন্দর্যের অনির্দেশ্য পরাদর্শের জন্য, পরম সত্তার জন্য আর্তি। প্লেটোর ভাববাদের এবং খৃষ্টধর্মের নৈতিক বিধির প্রভাবে, মধ্যযুগে নাইটদের প্রেম-বীরত্ব-গাথায়, কামগন্ধহীন প্রেমের ও সৌন্দর্যের ভাবমূর্তির আরাধনার আবেগ প্রকাশিত হয়। দান্তে পেত্রার্ক প্রভৃতির প্রেমের ও সৌন্দর্যের ভাবমূর্তি আরাধনার খাতবেয়ে তা' ক্রমে ক্রমে অনির্দেশ্য ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-সত্তার এবং পরম-সত্তার অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। ফলে অনির্দেশ্য ও অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাকে—সেই সত্তা স্বরূপে সত্য-শিব-সুন্দর বা সচ্চিদানন্দ যাইহোন না কেন,—পাওয়ার ব্যাকুলতা রোমান্টিক মনোভাব বলে গণ্য হয়। আত্মার রহস্যময় স্বরূপে—ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তজ্জনিত আবেগ, এই মনোভাবের সঙ্গে ওতপ্রেতভাবে সম্পৃক্ত বলে, উক্ত বিশ্বাস ও আবেগও রোমান্টিক নামে অভিহিত।

এইভাবে, রোমান্সের প্রকৃতি থেকে যেমন রোমান্টিকতার লক্ষণগুলি নিরূপিত করা সম্ভব, তেমনি রোমান্টিক আন্দোলনের দ্বৈতপ্রকৃতিকতাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মুক্তিকামনা অর্থাৎ স্থিতাবস্থার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বাঙ্গীন মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কামনা, রোমান্টিকের স্বাভাবিক মনোভাব বটে, কিন্তু তাই বলে সকল রোমান্টিকই যে মুক্তির আবেগে, সামনে এগিয়ে যেতে চান বর্ত্তমান অবস্থার বাধা অতিক্রম করে, উজ্জ্বল ও মুক্ত উদার ভবিষ্যতের ধ্যান করেন, তা' নয়; কোন কোন রোমান্টিক চারিদিকের পাষাণ কারা ভেঙ্গে ফেলতে অসমর্থ হয়ে, অতীত অবস্থার মধ্যে অথবা আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে মুক্তির কল্পলোক সৃষ্টি করে মুক্তির আবেগ চরিতার্থ করে থাকেন। এই ধরণের অতীতাসক্ত বা আধ্যাত্মিক-মুক্তি-বিলাসী মনোভাবকেই প্রতিক্রিয়াশীল রোমান্টিসিজম্ বলা হয়েছে। আর যে মুক্তিকামনা, জাতিগত ও ব্যক্তিগত পরাধীনতার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেই মুক্তির-আবেগকে বলা যেতে পারে "প্রগতিশীল রোমান্টিসিজম"। National Romanticism-এ প্রগতিমূলক মনোভাব অর্থাৎ জাতির মুক্তির আবেগ প্রকাশিত হয় বলে, ন্যাশনাল রোমান্টিসিজম প্রগতিশীল রোমান্টিসিজমের একটা বিশেষ রূপ।

তবে এই 'ন্যাশনাল রোমান্টিসিজম অনেক ক্ষেত্রে অতীত কীর্ত্তি কাহিনীকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে বলে কারো হয়তঃ এ কথা মনে আসতে পারে যে, যেহেতু এর মধ্যেও অতীতাসক্তি রয়েছে সেই হেতু তা' প্রতিক্রিয়াশীল। অতীতাসক্ত হওয়া এবং অতীতাশ্রয়ী হওয়া অর্থাৎ historical instrospective tendency থাকা যে এক কথা নয়, এ সত্যটা একটু তালিয়ে বুঝতে পারলেই, ঐ ধরণের কোন কথা আর মনে আসবে না। বর্তমানকে এড়িয়ে অতীতের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা নিশ্চয়ই পলায়নী মনোবৃত্তি—কিন্তু বর্ত্তমানের প্রয়োজনে অতীতকে ব্যবহার করা

—অতীত কাহিনীর মাধ্যমে বর্ত্তমানের প্রগতিকামনার চাহিদা পূরণ করা অবশ্যই প্রগতিশীল মনোভাব। "historical introspective tendency" —জাতীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। স্বাধীন জাতি অতীতকে স্মরণ করে আত্মগৌরব ঘোষনা করার উদেশ্যে—জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনাকে আরো উদ্দীপিত করার জন্য, আর পরাধীন জাতি অতীত কীর্তিকাহিনী স্মরণ করে—আত্মসংবিদ ফিরে পাওয়ার জন্য, স্বাধীনতা কামনাকে জাতির চিত্তে সঞ্চার করে দেওয়ার জন্য—জাতির মানসিক দুর্ব্বলতা দূর ক'রে, পরোক্ষভাবে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। পরাধীন জাতির চিত্তে যখন নবজাগরণের সাড়া জাগে, যখন বন্ধন অসহিষ্ণুতার চাঞ্চল্যে জাতি মুক্তির জন্য চেষ্টিত হয় অথচ সম্মুখের বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারে পারে না, তখনই জাতির মনে historical instrospective tendency বেশী করে দেখা দেয়।

"এই introspective tendency"রই অনিবার্য পরিণতি ঐতিহাসিক কাহিনীর—রোমান্টিক উপস্থাপনা। অর্থাৎ ইতিহাসের বাস্তবানুগ উপস্থাপনার . ভাববেগ-উচ্ছ্বসিত আদর্শনিয়ন্ত্রিত এবং জাতীয়চেতনাসঞ্চারী উপস্থাপনা। জাতির নব জাগরণের সঙ্গে—জাতির মুক্তি সংগ্রামের আবেগের সঙ্গে, ইতিহাস স্মরণের সম্পর্ক কি এবং ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমে ইতিহাস পুনঃস্মরণ কেন হয়, নিশ্চয়ই তা' বেশী বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। 'রোমান্টিসিজম' এবং 'রোমান্টিক' সম্বন্ধে যেটুকু সংস্কার থাকলে মেবার-পতন নাটকের রোমান্টিকত্ব এবং নাট্যকারের রোমান্টিক মনোভাব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে, আশাকরি সেটুকু সংস্কার এই আলোচনার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে।

* * * *

এবারে বাংলা সাহিত্যের 'রোমান্টিক ঐতিহ্য' এবং সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে সামান্যভাবে দু'চার কথা বলে নেওয়া যাক। বলা বাহুল্য, এই আলোচনায় আমি, বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে রোমান্টিক মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছিল সেই অভিব্যক্তিরই বিশেষ প্রকৃতি বা বিশেষ রূপটি নির্দেশ করতে চেষ্টা করব। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়—রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের—কবি-উপন্যাসিক-নাট্যকারদের রোমান্টিক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করতে চেষ্টা করব। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বাংলা—সাহিত্যে রোমান্টিকতার যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে তাকেই আমি বলছি—বংলার রোমান্টিক ঐতিহ্য এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চেষ্টা করছি এই ঐতিহ্যের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল নতুন কোন ভাব বা লক্ষণ যোগ করতে পেরেছেন কি না, পুরাতন ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন কি না, অথবা রোমান্টিক ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছেন কি না, এই সব প্রশ্ন। আগেই বলেছি এই সব প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। দিগ্‌দর্শনের জন্য যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বলা হবে।

নবম দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ ক'রে সাহিত্যিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, যে কথা বিশেষভাবে মনে জাগে, সে এই যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকে আশ্রয় করে এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির আবেগের রূপ ধরে বাংলার গণমানসে মুক্তির একটা সর্বতোমুখী প্রবল আকূতি আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু যেহেতু এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অতিজাগতিক বা অতিপ্রাকৃত সত্তার—অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ—এবং আন্দোলনের প্রকৃতিতে বৈরাগ্য সন্ন্যাস প্রভৃতি ইহবিমুখ আচরণের প্রশ্রয় ছিল, সেইহেতু ঐ মুক্তির অন্দোলন অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে পৌছতে পারেনি- এক কৃষ্ণভক্তি-সূত্রে সমস্ত জাতিকে সমস্ত

বর্ণকে গেঁথে নিয়ে সাম্য-মৈত্রী—স্বাধীনতায়পরিপূর্ণ প্রেমময় আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারেনি। তা না পারলেও—বর্ণাশ্রম ধর্মশাসিত এবং জাতিবিদ্বেষ-সংকীর্ণ সমাজে যিনি মানুষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং বিশ্বজনীন প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলে, ব্যক্তিবৈষম্যের ও জাতিবৈষমের বিরুদ্ধে, গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার আন্দোলন এবং তাঁকে ঘিরে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে প্রগতিশীল রোমান্টিকতার উপাদান ছিল—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যের এই বৈষ্ণব আন্দোলন ছাড়া, এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যেটুকু রোমান্টিকতার উপাদান পাওয়া যায়, তা' পাওয়া যায় বংলার লোক-সাহিত্যে (পূর্ববঙ্গগীতিকা—মৈসনসিংহ-গীতিকা নামক সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নানা কাহিনীর মধ্যে)। এই সকল কাহিনীর মধ্যে—জীবনকে যে রূপে ও যে রীতিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে সংক্ষেপে 'রোমান্সসুলভ' অর্থাৎ রোমান্টিকই বলা যেতে পারে। এদের নায়ক-নায়িকারা 'পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়' সেই রঙ্গেই, জীবনাবেগের তীব্র তাড়নায়, ধেয়ে চলেছে, বর্ণের বাধার—জাতির বাধার, Ego Ideal এর গণ্ডী ভেঙ্গে, তাদের হৃদয়াবেগ উদ্দাম ও স্বচ্ছন্দ গতিতে একমাত্র কামনার প্রেরণা মেনেই অন্ধবেগে ছুটে চলেছে। তাদের কাছে সমাজ সংসার মিছে সব। জীবনাবেগের সহজ প্রবৃত্তির বিধি ছাড়া মানুষের-গড়া কোন বিধিনিষেধ তারা মানতে চায় না। তারা যেন স্বচ্ছন্দচাবী মুক্ত প্রেমের—মুক্ত জীবনের—শরীরী আকাঙ্ক্ষা ; গতানুগতিক বিধিরুদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে মূর্ত বিদ্রাহ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য—সাম্য ও মৈত্রীর জন্য আন্দোলনে এবং লোকসাহিত্যের নায়ক নায়িকাদের জাতিকুলবিচারহীন প্রেমের ঐকান্তিক আবেগে—'মনের মানুষের' জন্য জাতিকুলমান—

সর্ব্বস্বত্যাগে, বন্ধন-অসহিষ্ণু জীবনের জীবনসম্ভোগেরই ঐকান্তিক আবেগ লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিক স্থিতিশীল জীবনযাত্রার মাঝখানে জীবন আবেগের দ্বীপ দুটি যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই, ইংরেজি শাসনের চাপে, ইংরেজ জীবনের তাপে এবং ইংরেজী শাস্ত্র-সাহিত্যের প্রভাবে, বাঙ্গালীর জ্ঞান-অনুভব ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে—বাংলার বুকে নবজীবনের সাড়া জাগে—জাগ্রত বাঙালীর মনে জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্কল্প জাগে—এক কথায়, জাগ্রত বাঙালী জীবনের অঙ্গনে মুক্তভাবে বিচরণ করতে চায়। কিন্তু ভিতরে-বাইবে সহস্র বন্ধনে সে তখন আবদ্ধ। বাইরে ব্রিটিশের আধিপত্য, রাজনৈতিক এবং আর্থনৈতিক পরাধীনতার বেষ্টনী; ভিতরে সহস্র সংকীর্ণ বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা অচলায়তন—কুসংস্কারের অপ্রতিহত প্রভাব। সিপাহীবিদ্রোহের অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে ভারতের সামরিক শক্তি নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো একবার দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে; ভারতবাসী মহারাণীর প্রজায় পরিণত হয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আগুন থেকে পরিবেশে যে তাপ সঞ্চারিত হয় তাতে অনেকেরই মনে তাপ সঞ্চিত হয়। এই আগুনের উত্তাপেই বাংলায় "ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমে'র সূত্রপাত হয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'—বিশেষতঃ "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বঁচিতে চায়?—গানটি, ঐ নির্বাপিত বিদ্রোহাগ্নিরই সঞ্চারিত উত্তাপে উত্তপ্ত। এখান থেকেই, historical introspective tendency-এর সূচনা—ঐতিহাসিক কাহিনীর আধারে—ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীকে মুখপাত্র ক'রে, স্বাধীনজীবনের মহিমাকে প্রচার করার চেষ্টা, পরাধীনতা-অসহিষ্ণুতার চাঞ্চল্য, আরম্ভ হয়েছে। রঙ্গলালের সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদনের জীবন এবং কাব্য সমান মাত্রায় রোমান্টিক। যেমন অদম্য তাঁর প্রাণাবেগ—জীবন সম্ভোগের বাসনা, তেমনি তীব্র ঘৃণা স্থিতিধর্মী

বদ্ধজীবনের জড়ত্বের উপরে। ঐ অস্থির অসহিষ্ণু প্রাণাবেগেরই অনিবার্য্য পরিণতি—খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ, সমাজের সীমা, দেশের সীমা লঙ্ঘন করে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ছুটে বেড়ান; যে পরশপাথরের স্পর্শে জীবন অবাধমুক্তির সোনায় পরিণত হবে, সেই পরশপাথরের জন্য ক্ষ্যাপার মতো দেশে-বিদেশে বিচরণ—এককথায় সমস্ত রকম প্রথার (সাহিত্যিক ও সামাজিক) বাধার বাঁধ ভেঙ্গে জীবনকে মুক্ত করার আবেগ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে ভাষার শৃঙ্খল মোচন করা, বিষয়-নির্বাচনে ও উপস্থাপনে প্রচলিত প্রথাকে অমান্য করে কল্পনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, মাতৃভাষার দৈন্য তথা আত্মদৈন্য, জাতীয়অবমাননা দূর করার জন্য অপূর্ব কাব্য নাটক কবিতাবলী রচনা করা, দুর্বলতা-বিরোধী বন্ধন অসহিষ্ণু ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী প্রাণাবেগেরই অভিব্যক্তি। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সংকেত আশ্রয় করে মধুসূদন নতুনজীবনাদর্শেরই অবোহন করছেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রশস্তি—এবং পরাধীনতার মনস্তাপ—"King Porus"-কে উপলক্ষ্য ক'রে অতিতীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রাজা পুরুর উদ্দেশ্যে কবি লিখেছেন—

And where the noble hearts that bled
For freedom—with the heroic glow
In patriot bosoms nourished—
Hearts eagle-like that recked not death
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou fair freedom !

... ...

The crown that once did deck thy brow
Is trampled down—and thou sunk low.
Thy pearls, thy diamond and thy mine

of glistening gold no more is thine !
Alas—each conquering tyrant's lust
Has robbed thee of thy very dust !

পরাধীনতার জন্য এই অন্তর্দাহ, কৃষ্ণকুমারী-নাটকেও হিন্দুমহিমা-স্মরণের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

দেশের স্বধীনতা রক্ষা করতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে মহত্তর গৌরব বীরের পক্ষে যে আর কিছু হতে পারে না—এ কথা, মেঘনাদবধ-কাব্যে মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে ঘোষণা করেছেন।

"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী"—

অথবা

—বীরমাতা তুমি,
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ?—প্রভৃতি উক্তির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক—

ইন্দ্রজিৎ চরিত্র পরিকল্পনার বাহ্য প্রেরণা, হেকটরের মতো একটি বীরের পতন দেখিয়ে দেবপ্রতিকূল পৌরুষের পরাজয় দেখানো হলেও, আভ্যন্তরিক প্রেরণা, কিন্তু, পৌরুষেরই তথা দেশপ্রীতিরই মহিমা প্রতিষ্ঠা করা। ইন্দ্রজিৎ ধাত্রীর মুখে সংবাদ শুনে যে ভাষায় নিজেকে ধিক্‌কার দিয়েছিল তা' লক্ষণীয়—

—হা ধিক মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ—
আমি ইন্দ্রজিৎ।
' ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।"

এই ধিক্কার মাতৃভূমির বৈরিদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য যুবশক্তিকে

উদ্দীপিত করে না কি? বিভীষণের উক্তির প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রজিতের স্মরণীয় উক্তিতেও স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক ইন্দ্রজিতের প্রদীপ্ত তেজস্বিতাই রিকিরিত হয়েছে। ইন্দ্রজিতের অভিষেকে নবজাগ্রত জাতীয় চেতনারই অভিষেক হয়েছে এবং ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় বীরত্বেরই মহিমা ঘোষিত হয়েছে। ইন্দ্রজিত মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে এসেছিল, মরণে সেই মৃত্যুহীন প্রাণকেই সে দান করে গেছে। মহৎ আদর্শের জন্য যার প্রাণ উৎসর্গীকৃত, মৃত্যু শুধু তার দেহটাকেই অধিকার করে। ইন্দ্রজিতের মধ্যে মধুসূদন এমনি একটি "মৃত্যুহীন প্রাণ"কেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে 'মৃত্যুহীন প্রাণে'র গুণেই রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে নায়ক—"turn death itself into a triumph", সেই গুণেই ইন্দ্রজিৎ মৃত্যুকে জয় করেছে। কেন মধুসূদন মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন, তা নির্দেশ করতে গিয়ে ডাঃ শীতাংশু মৈত্র মহাশয় লিখেছেন—"পৌরুষের এই অহেতুক পরাজয় মধুসূদনের চিত্ত আলোড়িত হইল, কেন না এই পরাজয় এই ব্যর্থতা শুধু মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের নয়, তৎকালীন সমাজজীবনের অন্তর্গূঢ় সত্য। এবং এই ব্যর্থতার বেদনাকে রূপ দিয়াছেন বলিয়াই মধুসূদন যুগন্ধর—যুগ-সত্যটিকে কাব্যে যথাযথ ধারণ করিয়াছেন। কবিচিত্তে হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতেই এই যুগসত্য প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং রাবণের মাধ্যমে প্রচণ্ড পৌরুষের অহেতুক বিনাশে মর্মভেদী বিলাপ করিয়াছেন।"...............

"বাঙালী মানস-মুকুল আগুনে ভাজিল। ইহারই প্রতিফলন মেঘনাদ বধে"......মেঘনাদ—"রেনেসাঁর ব্যর্থতার চিত্র।" ("যুগন্ধর মধুসূদন") মেঘনাদকে রেনেসাঁর ব্যর্থতার চিত্র না বলে—যদি শক্তি উদ্বোধনের বা রোমাণ্টিক প্রাণাবেগের প্রতীক ব'লে মনে করা যায়, 'তা'হলেই বোধ হয়, ঠিক ব্যাখ্যা করা হয়। সে যাই হোক মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে ন্যাশানাল

রোমান্টিসিজমের সব লক্ষণই বেশী কম পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায়—historical introspective tendency", তেমনি পাওয়া যায়—"liberal-minded progressive tendency which devoloped into the new liberalism"। আমরা দেখতে পাব, পরাধীন অবস্থার চাপে—historical introspective tendency" বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত চলে এসেছে এবং "liberal-minded progressive tendency"—মানবতাবোধের গভীরতা বৃদ্ধির ধারা ধরে বিশ্বমানবতাবোধে—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গভীরতর চেতনায় পরিণত হয়েছে।

রঙ্গলাল-মধুসূদনের পরে কবি বিহারীলালের মধ্যে, রোমাণ্টিক প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট আকারে দেখা যায়। (ক) "Romantic subjectiveness"—আত্মোপলব্ধিকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা—আত্মভাববিভোরতা। (খ) কল্পনাপরায়ণতা—কল্পনার পাখা মেলে, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের রাজ্যে অবাধ মানসপরিক্রমা। (গ) অপরূপ পরম সত্তার লীলা-রহস্য উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুলতা—ইহবিমুখতা বা অধ্যাত্ম-কেন্দ্রিকতা এবং অনির্বাণ অতৃপ্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে, রোমাণ্টিক প্রবৃত্তি রোমাঞ্চ-রচনায় খাত ধরে এগিয়ে, অতীত ইতিহাস আশ্রয় ক'রে, জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে প্রবণান্বিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের এবং নবীনচন্দ্রের মধ্যে প্রধানতঃ জাতির আত্মসংবিদ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় স্বাধীন মহাভারতের প্রতিষ্ঠার ধ্যানে ও সঙ্কল্পে রোমাণ্টিক আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যে, দেব-দানবের সংগ্রামের কাহিনীর রূপকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের কামনাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র বৈবতক-প্রভাস রচনার মধ্যে স্বাধীনতালাভের, জাতিধর্ম নির্বিশেষে 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার আবেগই ঐকান্তিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

হেমচন্দ্রে স্বদেশপ্রীতির আবেগোচ্ছ্বাস যেমন লক্ষণীয়, নবীনচন্দ্রে তেমনি লক্ষণীয় স্বদেশপ্রীতির ঐকান্তিকতার সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার গভীরতা, স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে বিশ্বপ্রীতির বা বিশ্বমানবতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া পাওয়া যায়—প্রথমতঃ পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে জাতিকে প্রকৃত ধর্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায়, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক কুসংস্কার বা অনাচার দুর করার চেষ্টায়, তৃতীয়তঃ ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক নাটকের সাহায্যে জাতির স্বাধীনতা কামনাকে উদ্দীপিত করার মধ্যে। জাতিকে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে জাত্যভিমান জাগ্রত করতে চেষ্টা করা, সমাজের কুসংস্কার দুর করে জাতিকে ভিতরে বাইরে সবল করার চেষ্টা করা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে যে সব বীর সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কীর্তিকাহিনী জাতির চোখের সামনে তুলে ধরা—অবশ্যই নতুন ও মুক্ত জীবনের কামনাকেই সুচিত করে। এখানেই গিরিশচন্দ্রের রোমাণ্টিকতা।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসে রোমাণ্টিক আবেগ নানা মুখে প্রবাহিত হয়েছে। বিহারীলালের আধ্যাত্মিক আকূতি ও কল্পনা কুশলতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসে আরো গভীর ও ব্যাপক হয়েছে—ভূমার অপরূপ-অনির্বচনীয় স্বরূপে অবস্থান করার আবেগ আরো ঐকান্তিক হয়েছে, রূপে রূপে অপরূপকে সাক্ষাৎকার করার আকুলতা বেড়েছে—অখণ্ড জীবনের কামনা, বাধাবন্ধহীন মুক্তির পিপাসা তীব্রতর হয়েছে, সমগ্র জগতকে—বিশ্ব-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি মানব-প্রকৃতিকে—এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তার লীলাবিলাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার তথা ব্রহ্মবিহারের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে এই ব্রহ্মবিহার—জগতের সমস্ত ক্ষয়- ক্ষতির উর্ধে, "অনন্তের আনন্দ"কে স্থাপনা করে জাগতিক দ্বন্দ্ব সংক্ষোভ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বা থাকার চেষ্টা—আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস রয়েছে; অন্যদিকে, জগতের অস্তিত্ব

স্বীকার করার ফলে এবং নতুন যুগের চিন্তার ও চাহিদার চাপে—এক কথায় জীবনের দায়েই, সমাজ সমস্যার, জীবন-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হয়েছে; সামাজিক মুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়েছে—ব্যক্তি-মুক্তির সম্ভাবনাকে সামাজিক মুক্তির অবকাশেই ধারণা করতে হয়েছে। সব কিছুই ব্রহ্মতন্ত্রের অধীন, সুতরাং ব্রহ্মবিহারেই জীবনের চরম সার্থকতা—এ কথা বললে আপাততঃ এ কথা মনে হতে পারে যে এই ধারণা 'পলায়নী মনোবৃত্তি-কে'ই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি-জীবপ্রকৃতি এবং সমাজপ্রকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ব'লে, রবীন্দ্রদর্শনে 'পলায়নী মনোবৃত্তি' সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। তাঁর মুক্তি পরিকল্পনায় সমাজ সংসার উপেক্ষা ক'রে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় ব'লে, ব্রহ্মের সঙ্গে সমাজ-সংসারও সমান গুরুত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।

তা'ই ব'লে, অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে, বস্তুবাদীর কাছে সমাজ-সংসারের যে পরিচয় বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাছেও তা' পাওয়া যাবে। মানুষের সমস্যাকে—সমাজের সমস্যাকে বস্তুবাদীরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, এবং যতখানি অতিপ্রাকৃত-নিরপেক্ষ ক'রে দেখেন, সেই দৃষ্টি-কোণ বা ততখানি অতিপ্রাকৃত নিরপেক্ষতা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে না। বস্তুবাদীরা যেখানে মানুষের আচরণে শুধু জৈবিক মনোজৈবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তির প্রেরণা স্বীকার করে ক্ষান্ত থাকবেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সামাজিক ও জৈবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা ছাড়াও আধ্যাত্মিক প্রেরণা স্বীকার করবেন। খাঁটি রিয়েলিষ্টের দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মৌলিক পার্থক্য এখানেই এবং এই কারণেই রবীন্দ্র- নাথ মূলতঃ "রোমাণ্টিক"। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সমস্যাকে অথবা সমাজ-সমস্যাকে, সমাজসাপেক্ষ করে না দেখে আধ্যাত্মিক-প্রকৃতি-সাপেক্ষ করে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার প্রেরণার বা মুক্তিলীলার পরিপ্রেক্ষণীতে দেখতে চান। এই সংস্কারের প্রাবল্য যাঁর মধ্যে থাকে,

তাঁর "ইগো"তে, লুকাসের চিন্তা অনুসরণ ক'রে বলা চলে—Reality-principle অপেক্ষা "id"-এর প্রভাব বেশী হবেই; বস্তুকে স্বরূপে না দেখে ভাবানুরঞ্জিত ক'রে প্রকাশ করতে তিনি প্রবণায়িত হবেনই।

এই ধরণের ভাবপ্রসক্তির স্বাভাবিক পরিণাম—subjectiveness-এর প্রাধান্য—রূপের বাস্তবিকতা অপেক্ষা ভাবের সংকেতনার দিকে ঝোঁক—বাস্তবানুগামিতার পরিবর্তে কল্পনানুগামিতা এবং সমাজসত্তার চেয়ে ব্যক্তি-সত্তার প্রাধান্যকে বড় করে দেখা বা দেখানো। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয়তা-মানবতা-বিশ্বমানবতার আবেগ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এ কথাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির ও সমষ্টির মুক্তির মধ্যেই আদর্শ সমাজের প্রাণকেন্দ্রটি কল্পনা করেছেন, এক কথায় রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন মুক্তির আদর্শকেই জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথের মানসে এবং দৃষ্টিতে স্বভাবগত ভাবালুতা থাকায়, তাঁর সৃষ্টিতে—শিল্পের ভাবে ও রূপে, রোমান্টিকতার মায়া জড়িয়ে আছে। জীবন সমস্যার উপস্থাপনায় ও সমাধানে বাস্তব পরিকল্পনা না ক'রে তিনি রোমান্টিক-সুলভ কল্পনা করেছেন। শুধু যে কবিতা ও কাব্য রচনাতেই 'সাবজেকটিভিটি'র মাত্রা বেশী হয়েছে তা নয়, গল্প-উপন্যাস নাটক প্রভৃতির মত শিল্পের ক্ষেত্রেও, যেখানে শিল্পীকে অধিক-মাত্রায় বিষয়নিষ্ঠ থাকতে হয়, সেখানেও আত্মানুরঞ্জনের মাত্রা—ভাবাদর্শের প্রভাব—লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মনের কেন্দ্রবিন্দুটি যে পরাদর্শনে গঠিত, তারই প্রভাবে বা আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিবিড় বাস্তবিকতার সংস্কার গড়ে উঠতে পারেনি। এবং তা' পারেনি ব'লেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যাকে বলে "clean break with Romanticism" তা' কোনকালেই সম্ভব হয়নি। বিংশশতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ পর্যন্ত এসেও, তাঁর প্রকৃতি বদলায়নি।

*নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য

নাট্যকাররাও, "ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমে"র ভরা জোয়ারের সময়েই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। জাতির চোখে তখন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নঘোর। অন্তরে বাইরে জাতি মুক্তি চাইছে ঐকান্তিক আবেগে। আত্মশক্তিকে ও প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্য জাতি তখন দিশেহারার মত পথ খুঁজছে। একদিকে প্রাচীন ভারতের উদার আধ্যাত্মিকতার এবং প্রতীচ্যের কাছ থেকে নতুন-করে-পাওয়া মানবতার ও বিশ্বমানবতার প্রেরণা, অন্যদিকে জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণশক্তির এবং জাতীয়তাবাদের উত্তেজনা। একদিকে জাতীয়তার কেন্দ্রানুগ শক্তির আকর্ষণ, অন্যদিকে বিশ্বমানবতার বা বিশ্বপ্রেমের কেন্দ্রাতিগ শক্তির আকর্ষণ—এই দুই শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতির চিত্ত আন্দোলিত। জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হ'লে জাতিকে অবশ্যই কুসংস্কার মুক্ত হতে হবে, সমাজে উদার বিধিবিধান চালু করতে হবে—জাতিকে দেহে-মনে স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে—এক কথায় আবার "মানুষ" হতে হবে। এই কারণে জাতির লুপ্ত "মনুষ্যত্ব"কে উদ্ধার করার জন্য—সর্বসংকীর্ণতামুক্ত মানবতার উদ্বোধনের জন্য মুক্তিকামীরা তখন চেষ্টিত। নাট্যকাররাও রসরূপ সৃষ্টির পথে জাতির এই মুক্তি প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছেন। হাস্যরসের করুণরসের বীররসের, যে রসের ছাঁচই তিনি গ্রহণ করুন, সকলেরই মধ্যে কিন্তু বেশী কম জাতীয় জীবনের সমালোচনার উদ্দেশ্যটি এবং সমালোচনার দ্বারা সমাজের দুর্বলতা দূর করার ইচ্ছা ও জাতির আত্মসংবিদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য রচনা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় নাট্যকার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুগের দাবী মেটাতেই তার প্রকাশ শক্তিকে প্রয়োগ করেছেন। কোথাও জাতির বা ব্যক্তির দুর্বলতার উপর ব্যঙ্গের রশ্মি নিক্ষেপ করেছেন সংশোধনের অভিপ্রায়ে, কোথাও বা জাতির অতীত মহিমাকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেষ্টা করেছেন, জাতির

মনে-প্রাণে আলো ও তাপ সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে। জাতীয়তাবাদী রোমাণ্টিকতার মধ্যে যে 'সহজ ইতিহাস-স্মরণ-প্রবণতা' (Historical introspective tendency) থাকে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাতেও সেই প্রবণতা পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারাবাই, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান চন্দ্রগুপ্ত সিংহল বিজয় প্রভৃতি নাটক রচনার মূলে আর যে প্রেরণাই থাক, এই গুলি মূলতঃ জাতীয়তাবাদী রোমা ক আবেগের প্রেরণাতেই রচিত। জাতীয়তাবোধ-জনিত উদ্দীপনার তাগিদেই নাট্যকারের মন সেই অতীত যুগে ফিরে গেছে এবং নির্বাচন করেছে সেই জীবন যেখানে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনা, প্রাণ রক্ষার চেয়ে মান রক্ষার আবেগ ঐকান্তিকতর এবং ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সমাজ স্বার্থের স্বীকৃতি। জাগ্রত চেতনা জাগ্রতকেই খুঁজে নিয়েছে, উদ্দীপিত প্রাণ উদ্দীপ্তকেই আশ্রয় করতে চেষ্টা করেছে এবং দূরাভিসারী দূরাভিযাত্রীকেই নিজের মুখপাত্র করতে উৎসুক হয়েছে। কথায় বলে 'যার যেমন মন তেমনি ধন'। প্রত্যেক নির্বাচনের মূলেই 'আন্তরঃ কোঽপি হেতুঃ' থাকে ; এ ক্ষেত্রেও আছে এবং সেই আন্তর হেতু কি তা' আগেই বলেছি। এই আন্তর হেতুর প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তার ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয়চেতনায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করার প্রেরণা—জাতির শৌর্যবীর্যকে উদ্বোধিত ক'রে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামে জাতিকে প্রস্তুত করে তোলার আবেগ। বলা বাহুল্য, এই আবেগটির মূলে স্বভাবতই 'অয়ং নিজঃ পরো বেতি' গণনা আছে। জাতীয়তা-চেতনার স্বভাবেই এই আত্মপরায়ণতার সংকীর্ণতাটুকু আছে ; কারণ ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা যে দেয়, "যোগ্যতমের উদবর্তন"-নীতি মেনে যাকে চলতে হয়, তার স্বভাবে স্বার্থপরায়ণতা এবং আনুষঙ্গিক মনোভাব অর্থাৎ ঈর্ষা, আক্রোশ, হিংসা প্রভৃতি একটু মিশে থাকবেই। 'প্রবৃত্তিরেষো ভূতানাম্'। জাতীয়তা জাতির প্রবৃত্তি

এবং প্রবৃত্তির মতোই সে স্বার্থপরায়ণ। তার প্ররোচনা শত্রুকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা, অপর জাতিকে কোণ-ঠাঁসা করা, স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখতে জাত্যভিমানকে সকলের উপরে সম্মানের আসন দেওয়া—বিজিগীষাকে ও শৌর্যকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় সকলের উপরে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দিক থেকে দেখলে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমিকতার বেশ একটু বিরোধ আছে। বিশ্বমানবতার প্রেরণা এর ঠিক বিপরীত। বিশ্বমানবতা প্ররোচনা দেয়—জাতির গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আপন ক'রে নিতে—জাত্যভিমানের উপরে মনুষ্যত্বের অভিমানকে স্থাপনা করতে, বিজিগীষাকে দমন করতে, প্রতিযোগিতা বন্ধ করে, সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে—এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে আনন্দোজ্জ্বল মুক্ত মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিশ্বমানবতাবোধের সুন্দর একটি সমন্বয় ঘটেছে। এ কথা সত্য যে জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় তিনি স্বজাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা উচ্চকণ্ঠে দাবী করেছেন এবং সে দাবীর সুরে মাঝে মাঝে অন্য জাতির প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার আমেজও ফুটে উঠেছে, কিন্তু এই সংকীর্ণতার আমেজটুকু কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বমানবত্বের মহনীয় ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে, নাট্যকার বিশ্বমানবতার ধ্রুব আদর্শকে এত প্রোজ্জ্বল রূপে ব্যক্ত করেছেন যে, তার হাতে জাতীয়তাবাদ কখনই সংকীর্ণ জাতিবিদ্বেষে পর্যবসিত হয়ে যায়নি। মহত্তর ভাবাদর্শের আকর্ষণের ফলে, পাঠকের বা দর্শকের চিত্ত কখনই সম্প্রসারণশীলতা হারিয়ে ফেলে না—জাতি-বিদ্বেষে সংকুচিত হয়ে যায় না। তবে, ভাবাদর্শের এই প্রাধান্যের ফলে নাটকের সর্বাঙ্গে লক্ষণীয়রূপে রোমাণ্টিকতা সঞ্চারিত হয়েছে—চরিত্রগুলি যত না জীবনধর্মকে অনুসরণ করেছে, তার চেয়ে বেশী অনুসরণ করেছে ভাবের আদর্শকে। যদিও সাহিত্যে

ভাবই রূপ হয়ে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ চরিত্রমাত্রেই ব্যক্তিত্বকে তথা বিশেষ বিশেষ ভাবকে ব্যক্ত করে, তবু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ভাব যেখানে আবেশে পরিণত হয়, চরিত্র যেখানে "reality principle"-এর সীমা লঙ্ঘন করে যায়, সেখানে ভাবাতিরেক-দোষ তাকে স্পর্শ করে এবং বাস্তব পরিবেশ থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, অর্থাৎ নিজের বশে না থেকে—পরিস্থিতির সঙ্গে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগে যুক্ত না থেকে, চরিত্র স্রষ্টার ভাবাবেশের তাগিদে আচরণ করে—চরিত্র "রোমান্টিক" হ'য়ে উঠে। ভাবাবেশের আতিশয্য থেকেই অবাস্তব পরিস্থিতির ও চরিত্রের পরিকল্পনা জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এই আবেশ সঞ্চারিত হয়েই সৃষ্টির প্রকৃতিকে রোমান্টিক ক'রে তোলে। **দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনা শুধু আকৃতিতেই নয়, প্রকৃতিতেও রোমান্টিক।** এই প্রসঙ্গেই **আকৃতিগত রোমান্টিকতা** সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রকৃতিগত রোমান্টিকতার স্বরূপকে যেমন "রিয়েলিজম্"-এর বিপরীত কোটিতে স্থাপনা করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে—আকৃতিগত রোমান্টিকতাকেও তেমনি ক্লাসিসিজমের বিপরীতধর্মী বলা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—ক্লাসিকাল রীতি বলতে বুঝায় সেই 'রীতিই যা' "ঐক্য"-বিধির প্রাচীন সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ স্থান-ঐক্য, কাল ঐক্য এবং ঘটনা-ঐক্য মেনে যেভাবে গ্রীসে নাটক রচনা করা হ'য়েছিল, সেইভাবে ঐক্য-বিধি মেনে চলতে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ এই রীতিতে-লেখা নাটকের বৃত্তে কোন উপধারা বা প্রাসঙ্গিক বৃত্ত (sub-plot) থাকে না।—কয়েকটি অপরিহার্য চরিত্রের সাহায্যে একটিমাত্র এবং একদিন-নিবর্ত্ত্য কার্যকে (action) নাট্যকার অনন্যমনা হয়ে উপস্থাপিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাগুলি একটিমাত্র স্থানে ঘটানোর দিকে এর ঝোঁক ঐকান্তিক। তৃতীয়তঃ বার ঘণ্টার বা চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপ্তির মধ্যে সব ঘটনাকে ঠেসেঠুসে ধরানো—এর অন্যতম

বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য। এই নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা যে রচনায় পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় "ক্লাসিকাল"-ধর্মী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে—কর্নেই-রাসিনের নাটকে এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম পাওয়া যায় ব'লে তাদের "ক্লাসিকাল" ব'লেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এবং এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের নাট্যকারদের—মার্লো, শেক্‌সপীয়র প্রভৃতির নাটকে একাধিক উপবৃত্ত সমন্বিত বৃত্ত অর্থাৎ বৃত্তের আকৃতিগত রোমা কতা থাকায় তাদের বলা হয়—রোমাণ্টিক। ঐ ধরণের রচনারীতি পাংক্তেয় বা রুচিসম্মত হয়ে যাওয়ায়, আকৃতিগত রোমাণ্টিকতা আজ আর কোন নিন্দার কথা নয়। আজ আমরা বহু দেশ-কাল-পাত্র-পাত্রী সমন্বিত নাটক (orchestration of life) দেখতে এত অভ্যস্ত যে ক্লাসিকাল-ধর্মী কোন নাটক দেখে আমাদের মন ভরতে চায় না। রোমাণ্টিক রীতিই আজ সাধারণ বা সর্বজনগ্রাহ্য রীতি এবং যেখানে সবই রোমাণ্টিক সেখানে, বলা চলে, রোমাণ্টিক ব'লে কিছু নেই। ক্লাসিকাল গঠনের নাটক থেকে নতুন নাটককে রোমাণ্টিক ব'লে পৃথক করবার প্রয়োজন আজ আর তেমন অপরিহার্য নয় এবং নয় ব'লেই নাটক-বিচারে আকৃতিগত অর্থাৎ গঠন-গত রোমাণ্টিকতার উল্লেখ আজ নিষ্প্রয়োজন। উল্লেখের প্রয়োজন হবে সেইদিন যেদিন আবার ক্লাসিকাল-ধর্মী নাটক লেখার রীতি নতুন ক'রে দেখা দেবে। পরে যাই হোক এখানে রোমাণ্টিক গঠন সম্পর্কে বিশেষ করে যা জানাবার আছে তা বলা হ'ল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির—বিশেষ ক'রে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির গঠন যে রোমাণ্টিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরোমাণ্টিক এ বিষয়ে বেশী ব্যাখ্যা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই সকলেই জানেন, আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে একাধিক প্রাসঙ্গিক বৃত্ত সংযুক্ত হওয়ার ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক "many actions of many men"-এর জটিল ও বিরাট সমারোহপূর্ণ উপস্থাপনায় পরিণত হয়েছে। শুধু যে প্রধান

কাহিনীর কার্যেই ক্রমপরিণতি দেখানো হয়েছে তা' নয়, অপ্রধান কাহিনীর কার্যকেও ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়ে উপসংহারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কথা স্বীকার্য বটে—বহুর-সংযোগে-একের যে জটিল অস্তিত্ব, তাকে দৃশ্য করতে হ'লে, বহু দেশকালের ও পাত্রপাত্রীর সংযোগ অপেক্ষিত কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য যে নাটকে "বহু"কে উপস্থাপিত করার বিশেষ উপায় এবং মাত্রা আছে। কাকে দৃশ্য করতে হবে, কাকে অদৃশ্য রাখতে হবে—সে সম্বন্ধে নাট্যকারের অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ ঘটনার বা পরিস্থিতির ভেতর থেকে, সমর্থকে নির্বাচন করে নেওয়ার এবং অসমর্থকে পরিহার করার শক্তি যাঁর নাই, তাঁর হাতে নাটক অনেকক্ষেত্রে দৃশ্যাকারে উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনাকে দৃশ্য করে তোলায়, নাটকীয় সংহতির ও একাগ্রতার স্থল উপন্যাসের বিস্তারধর্মিতার প্রকাশ পায়। আপাততঃ মনে হতে পারে নাটকের মূল উদ্দেশ্য জীবনের রূপকে দৃশ্যাকারে ব্যক্ত করা এবং সেই হিসাবে সব কিছুকে দৃশ্য করতে পারলেই তো নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করা হয়, কিন্তু তা যে হয় না এবং হয় না নাটকের ঐ দৃশ্যধর্মিতার জন্যই এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। অভিনয়কালের পরিমাণ এবং দর্শকের গ্রহণশক্তির পরিধি বা ফোকাস দ্বারা নাটকের আয়তন বা গঠন সীমাবদ্ধ বলে, নাট্যকারকে সংহত ভাবে বৃত্ত রচনা করতে হয়—রসকেন্দ্র থেকে সরে আছে যে ঘটনা, সে ঘটনাকে বাদ দিতে হয় বা অন্য কৌশল প্রয়োগ করে বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অবশ্য, দর্শকের গ্রহিষ্ণুতা তথা সহিষ্ণুতা অভিনয়কালের পরিমাণ বা প্রথা দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সুতরাং বিস্তারধর্মিতা থাকলেই যে নাটক নিন্দনীয় হবে এমন কোন কথা হ'তে পারে না। সে যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলালের এবং তদানীন্তন নাট্যকারদের নাটকের গঠনে বিস্তারধর্মিতা একটু বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায় এবং পাওয়া যায় এই কারণেই যে তখন অভিনয় চলত চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে। এই দীর্ঘ

সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই তখনকার নাট্যকাররা আবশ্যকের সঙ্গে অনেক অনাবশ্যককেও নাটকে প্রবেশ করতে দিয়েছেন; অনাবশ্যককে সর্বতোভাবে পরিহার করবার জন্য তেমন কোন তাগিদ বা চাপ বোধ করেননি। তিন বা আড়াই ঘণ্টার বাঁধা-সময়ের চাপ থাকলে অবশ্যই তাঁরা বৃত্তকে সম্প্রসারিত না ক'রে সংহত করতেন—অনেক কিছু কাটছাঁট দিয়ে যাদের না-দিলে-নয় শুধু তাদেরই উপস্থাপনা করতেন।·—এত বেশী ক'রে Orchestration of life" দেখাবার অথবা "art of gradual development" অবলম্বন করার সুযোগ পেতেন না। অন্বয়-ব্যাতিরেক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অর্থাৎ এক থাকলে অন্য থাকবেই—এমন বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ দেখাতে গেলে, মূল কার্যের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে ঘটবেই। শেক্‌সপীয়রের নাটকের আদর্শে আমাদের নাটকের গঠন পরিকল্পিত ব'লে, এবং দেশীয় নাটকের—বিশেষ করে সংস্কৃত নাটকের মেজাজের সঙ্গে ঐ আদর্শের কোন বিরোধ ঘটেনি বলে, গোড়া থেকেই আমাদের নাটকে—বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক নাটকে concentra-tion-এর পরিবর্তে orchestration-এর ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এই ঝোঁক কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং যেখানে বিশেষ কোন রস সুনিষ্পন্ন হয়নি অর্থাৎ বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের উপস্থাপনার ফলে বিশেষ একটি "ভাব" একাগ্র এবং সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠতে পারেনি, সেখানে নাটকের চেয়ে উপন্যাসের বা রোমান্সের ধর্মই বেশী ক'রে ব্যক্ত হয়েছে। তবে, এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলা দরকার এবং সে কথাটা এই যে, ক্লাসিকাল-ধর্মী নাটকের সংহত রূপের আবেদন একাগ্র ও তীব্রতর বটে, কিন্তু রোমান্টিক-ধর্মী বৃত্তের মধ্যে, বহু সম্পর্ক যুক্ত জীবনের জটিলতাকে যে পরিমাণে স্থান করে দেওয়া যায় তথা ব্যক্ত করা যায় ক্লাসিকাল-ধর্মী নাটকের বৃত্তে তা' করা যায় না। 'আধুনিক রুচি জীবনসম্পর্কের বিচিত্র ও জটিল রূপের উপস্থাপনা

আস্বাদন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বিচিত্রের সমবায়ে যে ঐক্য সেই 'ঐক্য'ই আজ সে কামনা করে, অতএব বিস্তৃত পটভূমিকায় জীবন সংগ্রামের রূপ উপস্থাপনা করবার চেষ্টা যেখানে আছে, তাকে অনাটক ব'লে উপেক্ষা করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বাংলা নাটকের বিস্তারধর্মিতা দেখে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁদের প্রথমেই ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি—নাটকের 'আদর্শ রূপ' ব'লে কোন কিছু সুনির্ধারিত ছাঁচ আছে কি না ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির মধ্যে কোনটিকে আমরা খাঁটি রূপ ব'লে মেনে নেব এবং রোমান্টিক ধর্মী গঠনকে স্বীকার করে নিলে, বিস্তাররোধকল্পে তিন-ঘণ্টা-নিষ্পাদ্য অভিনয়ের সর্ত ছাড়া আর কোন সর্ত আরোপ করা উচিত কি না। এই সব প্রশ্নের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের নাট্য রচনার রূপকল্প সম্বন্ধে সচেতন থাকলে উন্নাসিকতার মাত্রা অবশ্যই কমে যাবে।

ইতিহাস, ঐতিহাসিক নাটক ও মেবার-পতন

সাহিত্য-শিল্পের স্বতন্ত্র এলেকার চতুঃসীমা নির্দেশ করতে গিয়ে, সাহিত্য-দার্শনিকেরা, অনেক আগেই, সাহিত্যের যে সীমান্তে ইতিহাস রয়েছে সেই সীমানার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। আকর্ষণ করার হেতু এই যে ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনী-মূলক কাব্যের এমন একটা আপাত সাদৃশ্য আছে যা' দেখে অনেকেই মনে করতে পারেন যে ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে, উভয়কে পৃথক করা চলে না। আপাত সাদৃশ্য রয়েছে এখানেই যেখানে উভয়েই জীবনের ঘটনা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে—দর্শন-বিজ্ঞানের মতো সাধারণ সিদ্ধান্তের বা তত্ত্বের অবতারণা করে না। এই কারণে দর্শন-বিজ্ঞানকে যে অর্থে 'শাস্ত্র' বলা চলে, ইতিহাসকে সেই অর্থে পুরোপুরি শাস্ত্র বলা চলে না, যদিও দর্শন-বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসেরও মুখ্য উদ্দেশ্য—জ্ঞানপ্রচার করা।

জ্ঞানপ্রচারে ঐক্য থাকলেও, যেখানে দর্শন-বিজ্ঞান যোগায় তত্ত্বজ্ঞান (universal) সেখানে ইতিহাস যোগায় বিশেষ ব্যক্তির ও ঘটনার বিবরণ তথা অতীতের জ্ঞান—'particular'কে। ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের যেটুকু সাদৃশ্য তা' এখানেই—ঐ 'বিশেষ'কে প্রকাশ করাতেই—জীবন্ত মানুষের জীবনদ্বন্দ্বের—জীবনযাপনের—সুখদুঃখময় নানাবস্থার অনুলেখনে—"Concrete living"-এর রূপ প্রকাশ করাতে।

কিন্তু এই আপাতসাদৃশ্যের অন্তরালে রয়েছে—মৌলিক পার্থক্যটুকু। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যেখানে বিশেষের বিবরণ দেওয়া—যা ঘটে গেছে তার যথাযথ বিবরণ বা জ্ঞান প্রচার করা—কাব্যের উদ্দেশ্য, সেখানে বিশেষকে অবলম্বন করে অর্থাৎ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে, যা ঘটেছে শুধু তাকেই নয়, যা ঘটতে পারে অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণের সম্ভাব্য রূপটিকে ব্যক্ত করা—ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্ত সম্ভাবনা দেখানোর চেষ্টা করা—জীবনের ঘটনা নিয়ে একটা বৃত্ত (complete whole) তৈরী করা—রসরূপ সৃষ্টি করা। এক কথায় জীবনকে 'Idealize' করা, বিশেষ একটি ভাবের ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করা। এই কারণেই "art is more philosophical than history."

বাস্তবিকই, জীবনকে উপাদান ক'রে শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে, উপাদানকে রসরূপে উপাদেয় ক'রে তুলতে হবে—এ কথাটা সব সময়েই মনে রাখতে হবে। রূপমাত্রেই শিল্প নয়, শিল্প হচ্ছে রসরূপ—যে রূপ রসনীয় হয়েছে—যে রূপের সংযোগে বিশেষ কোন স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। উপাদান পুরাণ থেকেই সংগ্রহ করা হোক, বা ইতিহাস থেকেই নির্বাচন করা হোক অথবা সমসাময়িক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করা হোক। বড় কথা এবং আসল কথা—উপাদানকে উপাদেয় রসরূপ দেওয়া—উপাদানের সাহায্যে বিশেষ কোন 'ভাব'কে ব্যক্ত করা। উপাদান নিমিত্ত-মাত্র।

ব্যক্তি-রূপ, সে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক যাই হোক না কেন, ভাবের অর্জনা হওয়া পর্যন্ত, আর যাই হোক শিল্প-সুন্দর নয়। কবি-মানসের প্রবণতা অনুসারে এবং সামাজিক বাসনার চাহিদা অনুসারে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় নির্বাচিত হ'তে পারে, কিন্তু বিষয় নির্বাচনেই তো সৃষ্টির শেষ নয়। অর্থপূর্ণ বিষয় নির্বাচন অর্থাৎ যে বিষয়বস্তুর সামাজিক চাহিদা আছে—সমাজের মূল্যবোধকে যা' পরিপোষণ করে, তা নির্বাচন করা অবশ্যই প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে কৃতিত্বের কথা—মূল্যবান বিষয়কে চিত্তাকর্ষক রসরূপে পরিণত করা। শিল্পীর দক্ষতা নির্ভর ক'রে চিত্তাকর্ষ রসরূপ সৃষ্টি করার উপরেই। পৌরাণিক কাহিনীর অথবা ঐতিহাসিক কাহিনীর কৌতূহল-মূল্য যতই থাক, অর্থাৎ সামাজিকের প্রত্ন কৌতূহল বা ধর্মোদ্দীপনা মেটাবার উপযোগিতা তাদের যতই থাক, যতই তারা পুরাণের বা ইতিহাসের আনুগত্য রক্ষা করুক, যে পর্যন্ত না তারা "রস-রূপ" লাভ করে সে পর্যন্ত তারা শিল্পের মর্যাদাই পায় না। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মাণ সমালোচক গট হোল্ড এফ্রায়েম লেসিঙ যা বলেছেন তা' উদ্ধৃত করা যেতে পারে—Now, Aristotle has long ago decided how far the tragic poet need regard historical accuracy, not farther than it resembles a well-constructed fable where with he can combine his intentions. He does not make use of an event because it really happened, but because it happened in such a manner as he will scarcely be able to invent more fitly for his present purpose. If he finds this fitness in a true case, then the true case is welcome; but to search through history books does not reward his labour......"(No. 19)........In short, tragedy is not history

in dialogue. History is for tragedy nothing but a store house of names wherewith we are used to associate certain characters. If the poet finds in history circumstances that are convenient for the adornment or individualizing of his subject ; well let him use them" (No. 24). আসল কথা, ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য দৃশ্যাকারে ইতিহাস রচনা নয়, উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির রূপের মাধ্যমে জীবন-ভাষ্য রচনা করা। নাট্যকারের কাছে ইতিহাস রসসৃষ্টির উপাদান বা উপায় বিশেষ ; তার লক্ষ্য—রসসৃষ্টি, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ব্যক্তির বিচিত্র ঘটনাময় জীবন থেকে ট্র্যাজেডির বা কমেডির বিশেষ একটি রস-মূর্তিকে উদ্ধার করা। ঈসপের কাহিনী এবং নাটকের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে লেসিঙ যা বলেছেন—তা আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করবে ; তিনি বলেছেন—ঈসপের নীতিমূলক কাহিনী—"intends to bring a general moral axiom before our contemplation we are satisfied if this intention is fulfilled and it is the same to us whether this is so by means of a complete action that is in itself a rounded whole or no. The poet may conclude wherever he wills as soon as he sees his goal. It does not concern him what interest we may take in the persons through whom he works out his intention ; he does not want to interest but to instruct us ; he has to do with our reason not with our heart—this latter may or may not be satisfied so long as the other is illumined অন্যপক্ষে নাটক—"makes no claim upon a single definite axiom flowing out of its

story. It aims at passions which the course and events of its fable arouse and treat, or it aims at the pleasure accorded by a true and vivid delineation of characters and havits—যদিও—"Both require a certain integrity of action, a certain harmonious end which we do not miss in the moral tale because our attention is solely directed to the general axiom of whose especial application the story affords such an obvious instance" (No 35)। লেসিঙের আলোচনার সারমর্ম এই যে ইতিহাস ঘটনার যথাযথ বিবৃতিমাত্র ; ঘটনার সুষ্ঠুবিন্যাসের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত অর্থাৎ "a complete action that is in itself a rounded whole" রচনা করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়। নীতিমূলক কাহিনীতে বৃত্ত রচনার চেষ্টা থাকে বটে, কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশ্য—সাধারণ নীতি-সূত্র প্রচার করা—"general moral axiom" প্রচার ক'রে নীতিশিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ চরিত্র বা রসসৃষ্টি নীতিপ্রচারেরই উপায়মাত্র, সুতরাং গৌণ। নীতি-কথাটিকে লোকের মনে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধরিয়ে দিতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ, সে সন্তুষ্ট। নাটক নীতিমূলক-কাহিনী থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। ব্যক্তিজীবনের একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করায় সে ইতিহাস থেকে হয় পৃথক এবং নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য মুখ্য না থাকায়, নীতিমূলক কাহিনী থেকে হয় ভিন্ন। নাটককে এমন একটি বৃত্ত-রচনা করতে হয় যা'কে ইংরেজিতে বলা চলে—"a complete action that is in itself a rounded whole" এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জীবন্তকল্প রূপ বা জীবনালেখ্য সৃষ্টি করা তথা দর্শক-পাঠকের মনে রসের উদ্রেক করা—এক কথায় রূপ ও রস সৃষ্টি করা। এই রূপ-মূল্য এবং রস-মূল্যই সাহিত্য-শিল্পের আসল মূল্য। এই মূল্যে যা যত মূল্যবান তা' তত সার্থক সৃষ্টি। রূপের

মাধ্যমে রসসৃষ্টি—এক কথায় যাকে বলা হয় 'রস-রূপ বা রমণীয় রূপ সৃষ্টি—এই মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে যে শিল্পী যত দূরে সরে যান, শিল্প-এলেকা থেকে তিনি তত দূরে সরে যেতে থাকেন। প্রতিপাদ্য কোন তত্ত্ব (Idea) বা নীতি যেখানে রূপকে গুণীভূত করে ফেলে, সেখানে সৃষ্টি বিশুদ্ধ শিল্পের উচ্চ স্তর থেকে নেমে 'নীতিমূলক কাহিনী'র স্তরে এসে দাঁড়ায়। আবার যেখানে রূপ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত গড়ে উঠে না—রচনা এলোমেলো ঘটনাসমাবেশে—অর্থাৎ অন্বয়বিহীন রূপকল্পনায় পর্যবসিত হয়, সেখানেও বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের মান থাকে না।

শিল্পের আত্মা রস এবং রসের মূল্যেরই উপর তার আত্মিক মহিমা নির্ভর করে বটে কিন্তু 'রূপ' যেহেতু রসের আশ্রয়, রূপের সুষমা ও সার্থকতার মধ্যেই সৃষ্টির উৎকর্ষ নিহিত থাকে। সমন্বয় গুণের উৎকর্ষে শিল্পের সমগ্র রূপটি সুষমায় মণ্ডিত হয় এবং অর্থ (significance) প্রকাশের সত্যতায় প্রত্যেকটি রূপ সার্থক হয়ে উঠে। প্রথমটি আসে বিভিন্ন অংশের অঙ্গাঙ্গিযোগের ফলে, দ্বিতীয়টি দেখা দেয়—objectification বা concretization, characterisation বা individualization-এর চমৎকারিত্বের ফলে—প্রত্যেকটি রূপের পূর্ণ বিকাশের বা সৌন্দর্যের ফলে।

তবে, রসরূপ তৈরি করা শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও বিষয়ের বা উপাদানের প্রকৃতি দ্বারা শিল্পীর কল্পনাশক্তি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারে না। পৌরাণিক বিষয় বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে যখন শিল্পীকে কাজ করতে হয়, তখন যেমন রসসৃষ্টির দিকে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, তেমনি সচেতন থাকতে হয় উপযুক্ত পরিবেশ ও চরিত্র পরিকল্পনা বিষয়ে। একদিকে যুগ-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার দায়িত্ব থাকে, অন্যদিকে থাকে পুরাণ-কথিত বা ইতিহাস প্রথিত চরিত্রের বহুশ্রুত বৈশিষ্ট্য গতি ও পরিণতির প্রতি অনুগত থাকার দায়িত্ব। পৌরাণিক নাটকে যেমন আমরা পৌরাণিক যুগের পরিমণ্ডল এবং

চরিত্রের যুগোচিত আচরণ প্রত্যাশা করি, ঐতিহাসিক নাটকেও তেমনি আমরা যুগ-পরিমণ্ডল এবং চরিত্রের যুগোচিত আচরণ প্রত্যাশা করে থাকি। এই প্রত্যাশা পূরণ করার দায়িত্ব নাট্যকারকে গ্রহণ করতে হয় এবং হয় রসনিষ্পত্তির খাতিরেই। আস্বাদনে বা উপলব্ধিতে যা বাধা সৃষ্টি করে, শিল্পী তাকে পরিহার করেন। শিল্পীকে প্রথার বা সাধারণের অভিজ্ঞতার অনুবর্তন, করতে হয় এই কারণেই অর্থাৎ অবাধ রসনিষ্পত্তির জন্যই। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের মনে মোটামুটি একটা ধারণা থাকেই। নাট্যকার যদি তার সম্পূর্ণ বিপরীত কোন ধারণা আমদানী করতে চেষ্টা করেন, তখন সাধারণের সংস্কারের সঙ্গে নাট্যকারের সৃষ্ট রূপের বিরোধ ঘটে, নাট্যকারের সৃষ্ট রূপ দর্শক-পাঠকের বাস্তবতাবোধে তথা ঔচিত্যবোধে ধাক্কা দেয় এবং রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ঘটনাকে ও চরিত্রকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা নাট্যকারের আছে—এ কথা সত্য বটে কিন্তু এ কথাও সত্য, সব কিছুকে বিপরীত কল্পনা করার অধিকার নাট্যকারের নেই। রসসৃষ্টি যাঁকে করতে হবে তাঁকে লোকভাবের অনুবর্তন করতেই হবে। ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার যদি ইতিহাসের বিবরণ না মেনে চলেন গোড়াতেই তিনি দর্শকদের বিরাগভাজন হওযার ঝুঁকি মাথায় তুলে নেন এবং অবাধ রসনিষ্পত্তির পথকেও বন্ধুর করে তোলেন। এই কারণেই, পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিকত্বের এবং ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিকত্বের পরিমাণ কত কি আছে না আছে তা যাচাই করতে যাওয়ার সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। অন্য কারণেও ঐতিহাসিকত্ব যাচাই করার প্রশ্ন উঠতে পারে। ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন-কথা যেখানে প্রকাশ্য বিষয়, সেখানে প্রকাশের যাথাযথ্য বিচার করতে হ'লে ঐতিহাসিকত্বের হিসাব-নিকাশের প্রশ্ন একবার উঠবেই।

সাহিত্য কল্পনাময় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, যেমন তার রূপকল্পের বাস্তবতা

বিষয়ে প্রশ্ন উঠে থাকে অর্থাৎ কল্পিত রূপের সঙ্গে লৌকিক রূপের সাদৃশ্য যাচাই করে দেখার ইচ্ছা জেগে থাকে, তেমনি ঐতিহাসিক নাটক, স্বরূপতঃ রসরূপ হওয়া সত্ত্বেও, তার রূপের বিচার করবার সময়ে, সমালোচকরা রূপের রসোদ্দীপকতা বিচার করার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকতা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে থাকেন। ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনা বা ব্যক্তি সামান্য ঘটনা বা ব্যক্তি বটে, কিন্তু বিশেষতঃ তারা ঐতিহাসিক তথ্য। তাদের যাথাযথ্য বিচারে ঐতিহাসিকত্ব আছে কি নেই এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। বাস্তবতার বিচার যেমন রূপ 'How far true to life—এই প্রশ্নটিরই বিচার, তেমনি ঐতিহাসিকতার বিচার রূপ অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্র How far true to history এই প্রশ্নটিরই বিচার।

'মেবার-পতন' নাটকখানিতে রাজপুত-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়কে, চিরোন্নতশির মেবারের স্বাধীনতারক্ষাকল্পে প্রাণপণ সংগ্রাম এবং জাতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য মেবারের শোচনীয় পতন—উপস্থাপিত করা হয়েছে। মেবার রাজস্থানের রাজ্যমালার মধ্যমণি। মেবারের রাণা রাজপুত কুল-তিলক। মেবার শুধু একটি নাম নয়, 'মেবার' একটি প্রতীক—মরণপণ প্রতিরোধ-শক্তির ও ঐকান্তিক স্বাধীনতাকামনার প্রতীক। বাপ্পার সময় (৪৮ সম্বত) থেকে আরম্ভ করে অমর সিংহের পরাজয় ও মোগল-অধীনতা স্বীকার (১৬১৩) পর্যন্ত মেবারের ইতিহাস পরম বিস্ময়কর বীরত্বের ও জলন্ত জাত্যভিমানের ইতিহাস। অমর সিংহ, রাণা লক্ষ্মণ সিংহ, ভীম সিংহ, পদ্মিনী, চণ্ড, রাণা কুম্ভ, রাণা সঙ্গ, সংগ্রাম সিংহ, প্রতাপ সিংহ, অমর সিংহ প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের স্মরণীয় বীরত্বের ও আত্মত্যাগের মহিমায় মেবার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, তা'তে বীরত্ব, জাত্যভিমান মৃত্যুপণ-সংগ্রাম প্রভৃতি গুণগুলি 'মেবার' নামের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। পাঠান-মোগলের বার বার আক্রমণে হিন্দু-ভারতের শৌর্যবীর্য ক্রমে ক্রমে যখন নিস্তেজ ও পর্যুদস্ত হয়ে

যাচ্ছিল, রাজস্থানের রাজ্যগুলি একে একে যখন মোগলের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হচ্ছিল, তখন একমাত্র মেবারই হিন্দু-ভারতের প্রাণের শিখাটি প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। প্রাণ দিয়ে মান বাঁচাতে—মৃত্যুপণে স্বাধীনতা রক্ষা করতে মেবার ছিল কৃতসংকল্প—ছিল সুদীক্ষিত। রাজা প্রজা সকলের মন-প্রাণ এক সুরে বাঁধা। প্রাণ-বিসর্জনে বিস্ময়কর তাঁদের প্রতিস্পর্ধা। দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্-দীন খিলজি (১৩০৩) অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার বা গুজরাটের বাহাদুর শাহের নিষ্ঠুর আক্রমণ (১৫৩৪ খৃঃ) মেবারের প্রাণশক্তিকে আঘাত করেছিল, সত্য কিন্তু তাকে নষ্ট করতে পারেনি। আকবর চিতোর অধিকার করে নিষ্ঠুরতম হত্যালীলায় জিঘাংসু আলা-উদ্-দীনকেও হার মানিয়েছিলেন—"No such horrors were perpetrated by the brutal 'Ala-ud-din' (কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি-অফ ইণ্ডিয়া—৯১ পৃঃ), উদয় সিংহকে চিতোর ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন—সবই সত্য, কিন্তু এ কথাও তো অবিস্মরণীয় যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহের অতুলনীয় তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রেমের আগুনকে কিছুতেই আকবর নির্বাপিত করতে পারেননি। উদয়পুর, কমলমীর, চৌন্দ, ধর্মমতী, গোগুণ্ডা একে সব দুর্গই প্রতাপের হস্তচ্যুত হয়েছিল, প্রতাপ প্রান্তরে প্রান্তরে, অরণ্যে অরণ্যে আশ্রয় অন্বেষণ করে ফিরেছিলেন, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। আকবর সমস্ত রাজপুতবংশ কিনে নিয়ে ছিলেন, কিন্তু প্রতাপকে তিনি কিনতে পারেননি। ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করেছিল, প্রতাপ সে হাটে যাননি এবং যাননি বলেই দুর্বার প্রাণশক্তির বলে ক্রমে ক্রমে, চিতোর দুর্গ ছাড়া, মেবারের প্রায় সমস্ত স্থানই অধিকার করেছিলেন। প্রতাপের এই অতুলনীয় শৌর্যবীর্যের কীর্তি দিয়ে মেবারের গৌরব-মুকুট মণ্ডিত। মেবার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শৌর্যবীর্যেরই নামান্তর। স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমেরই অপর নাম "মেবার।"

এমন যে মেবার, সেই মেবারেরই পতন ঘটেছিল প্রতাপসিংহের পুত্র অমর সিংহের রাজত্বকালে। মৃত্যুকালে প্রতাপ নাকি ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন "আমার প্রাণোপম পুত্র অমর বিলাসিতার বশীভূত হইবে, মিবারের দুরবস্থা তাহার স্মরণ থাকিবে না। অন্তিমকালে আমি এই যে কুটীরে অবস্থান করিতেছি এ স্থানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিনির্মিত হইবে। ক্রমাগত পঞ্চবিংশতিবর্ষ কঠোর ব্রতে ব্রতী থাকিয়া আমি যে সমস্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিলাম অমর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার বোধ হইতেছে আত্মসুখের জন্য অমর চির স্বাধীনতা গৌরবে জলাঞ্জলি দিবে, (রাজস্থান) এবং সর্দ্দারগণ প্রতাপের সম্মুখে শপথও করেছিলেন—"মহারাজ! বাপ্পার পবিত্র সিংহাসনের শপথ করিয়া বলিতেছি, একজনমাত্র রাজপুত জীবিত থাকিতে মিবারভূমি তুর্কির হস্তগত হইবে না; যতদিন আমরা জীবিত থাকিব, কুমার অমরসিংহ কখনই ততদিন আপনার আদেশ লঙ্ঘনে সমর্থ হইবেন না। মিবারের পূর্ব স্বাধীনতা যতদিন পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার না হয়, শপথ করিয়া বলিতেছি ততদিন এই সকল কুটিরে বাস করিয়াই আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিব, বিলাসিতা ও সুখসম্ভোগে আমরা বঞ্চিত থাকিব। (রাজস্থান) সর্দ্দারদের এই প্রতিজ্ঞা-বচন শুনে প্রতাপ কিছুটা স্বস্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রতাপ মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন—"আমা হইতে চিতোর উদ্ধার না; জন্মভূমিকে যবন কবল হইতে উদ্ধার করা আমার পুত্র অমর সিংহেরও সাধ্য নহে।"

যবন কবল হ'তে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে অমরসিংহ পারেননি—এ ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু বিলাসিতার বা ভীরুতার জন্যই পারেননি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। যবনরা কিভাবে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড প্রয়োগ করে ভারতের প্রায় সমস্তটাই কবলিত করতে চেষ্টা করছিল প্রতাপ নিজেই তা' বুঝেছিলেন। রাজপুতদের মধ্যে তিনি একাই মাথা উঁচু

রেখেছিলেন এবং তা' রাখতে তাঁকে সব কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর বাইরের শত্রু মোগল, ভিতরের শত্রু মোগলপদানত রাজপুতরা। মোগলরা না করলেও, মোগলদাস রাজপুতরাই তাঁর উচ্চ শিরকে মোগলের কাছে অবনত করে দিতে চেষ্টা করবে। মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট অধিকারের মধ্যে, ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো যোঝাযুঝি করে মাথা উঁচু করে থাকা, মেবারের পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হবে না। হিন্দুর দুর্মতিতেই শেষ হিন্দুর দুর্গতি ঘটবে। মেবারের পতনে রাজপুতবংশের শেষ দীপশিখাটি নিভে যাবে। হিন্দুর প্রতিরোধ শক্তির শেষ সংগ্রামের অবসান ঘটবে।

যাঁর পরাজয়ে মেবারের তথা সমস্ত রাজপুতের পতন সম্পূর্ণ হয়েছিল তিনি প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ। তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে টড-রচিত রাজস্থানে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

পিতৃসিংহাসনে আরোহণের পর অমরসিংহ নূতন নূতন নিয়ম, নূতন নূতন প্রথা ও নূতন নূতন কর স্থাপন করলেন এবং সামন্তদের নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি দান করে রাজ্যকে বিলক্ষণ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃঢ় করে তুললেন। বহুদিন পর্যন্ত শান্তির ক্রোড়ে থেকে অমর আলস্যের বশীভূত হলেন। পিতার মৃত্যুকালীন আদেশ বিস্মৃত হলেন। পেশোলাতীরবর্তী পর্ণকুটীরগুলি ভেঙ্গে ফেলে, 'অমরমহল' নামে একটি বিলাসভবন নির্মাণ করালেন এবং চাটুকার পারিষদ-বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই প্রাসাদে নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করতে লাগলেন। যেখানে ভারতের প্রায় সমস্ত নরপতি দিল্লীশ্বরের অনুগত সেখানে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হ'লে যতখানি সামরিক প্রস্তুতি বা অনুশীলন ও সতর্ক দৃষ্টি অত্যাবশ্যক, অমরসিংহের তা কিছুই ছিল না। অচিরেই তাঁর সুখনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। মেবারের দর্পচূর্ণ করবার জন্য জাহাঙ্গীর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন।

অমরসিংহের স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতী ভর করলেন। তিনি বিলাস সম্ভোগ পরিত্যাগ করে অনর্থকর যুদ্ধবিভ্রাটে লিপ্ত হ'তে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। এক একবার যশোলিপ্সা মনে না জাগছিল তা' নয়, কিন্তু পরক্ষণেই বিলাসিতার মোহিনী ছায়া এসে তাঁকে আবৃত করছিল। চাটুকারেরা বার বার নিষেধ করতে লাগল; তাঁদের যুক্তি—সেনাবল নেই, অর্থবল নেই, সহায়-সম্বল নেই. ভারতের সমস্ত নরপতি মোগল সম্রাটের অনুবল—এমত অবস্থায় সন্ধিস্থাপনই বিধেয়। রাণাও যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি ক'রলেন—সন্ধিস্থাপনের সঙ্কল্প করলেন।

কিন্তু মেবারের সর্দারগণ যে প্রতাপের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন! তাঁরা চিন্তানলে সন্তপ্ত হ'তে লাগলেন। সামন্ত শিরোমণি চন্দাবৎকে পুরোবর্তী করে তাঁরা অমর মহলে উপস্থিত হ'লেন। চন্দাবৎ রাজাকে বললেন—মহারাজ, প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র আপনি; এই. সঙ্কট-কালে নিশ্চিত থাকা কি আপনার শোভা পায়? পবিত্র কুলগৌরব নষ্ট হবে বীরকেশরীর পুত্র হয়ে কিরূপে তা' প্রত্যক্ষ করবেন? প্রচণ্ড মোগল শত্রু যখন আপনার শিয়রে দণ্ডায়মান আপনি তখন হীন চাটুকারদলে পরিবেষ্টিত হয়ে কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চিন্ত রয়েছেন? যবনের হাতে মেবার রাজ্য ছারখার হবে, পবিত্র রাজপুতকুলললনার জীবন কলঙ্কিত হবে—কোন্ প্রাণে আপনি তা' সহ্য করবেন? পূর্বপুরুষগণের পবিত্র কীর্তি যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারবেন, তবে পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনার রাজ্যে ধিক. ঐশ্বর্যে ধিক, কুলগৌরবে ধিক।" সর্দারের এত তেজস্বিনী বক্তৃতাও রাণার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। সর্দার অস্থির উত্তেজনায় শিলাখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে, সভাগৃহের ভিত্তিস্থিত মুকুরে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করলেন। মুকুরখানি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। অমরসিংহের দক্ষিণ বাহু ধারণ করে চন্দাবৎ সর্দার সিংহাসন

থেকে তাঁকে নামিয়ে আনলেন এবং সর্দারদের সম্বোধন করে বললেন—'সর্দারগণ। প্রতাপের পুত্রকে কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করতে এখনই যুদ্ধযাত্রা কর।

চন্দাবতের আচরণে রাণা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁকে অপমানকারী, রাজদ্রোহী প্রভৃতি নানা কটু ভাষায় ভৎর্সনা করতে লাগলেন। চন্দাবৎ সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। সর্দারগণ পরম সন্তুষ্ট। রাণাকে নিয়ে সদলবলে তাঁরা যুদ্ধযাত্রা করলেন। জগন্নাথদেবের মন্দির পর্যন্ত গিয়েই রাণা নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ বুঝতে পারলেন এবং চন্দাবৎ কৃষ্ণের শত শত প্রশংসাবাদ করতে লাগলেন। **দেবীরক্ষেত্রের** ঘোরযুদ্ধে (১৬০৮ খৃঃ) প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়লাভ করে সগৌরবে রাজধানীতে ফিরে আসলেন। জাহাঙ্গীর পরাজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিরুৎসাহ হননি। এক বছর পরেই ১৬০৯ খৃঃ (১৬৬৬ অব্দের ফাল্গুন মাসে) তিনি সেনাপতি **আবদুল্লার** অধীনে, মেবারের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। **'রণপুর'** নামক গিরিপথে তুমুল যুদ্ধ হ'ল এবং এবারেও মোগলবাহিনী পরাজিত হল। এই যুদ্ধে দেবগড়ের দুদো সঙ্গাবৎ, নারায়ণদাস, সূর্যমল্ল, ঐশকর্ম, পূর্ণমল্ল রাঠোর হরিদাস, সদ্রিপতি ঝালা ভূপৎ, কহিরদাস কচ্ছবাহ, বৈদলার চৌহান কেশবদাস, মুকুন্দদাস রাঠোর ও জয়মলোট প্রভৃতি বীর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

দু' দু'বার পরাজিত হওয়ার পরে জাহাঙ্গীর মেবারকে জব্দ করার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করলেন। রাজপুত—কুলাঙ্গার সাগরজীকে সম্রাট চিতোরের ধ্বংসাবশেষের উপর রাণা নাম দিয়ে অভিষেক করলেন। চিতোরের ধ্বংসরাশির মধ্যে একদল মোগল সেনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে নূতন রাণা রাজত্ব করতে লাগলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর যে উদ্দেশ্যে সাগরজীকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। মেবারবাসীরা অমরসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করে সাগরের নিকট উপস্থিত হল না। বরং তার নাম শোনামাত্র

সকলে ঘৃণায় মুখভঙ্গী করত। এইভাবে সাত বৎসর অতীত হ'ল। স্বজাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষবিষ পান করে করে তাঁর দেহমন জর্জরিত। "চিন্তার বিষদংশনে তিনি প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে শান্তিসুখ নেই, হৃদয়মন অধীর হইয়া উঠে। এক একবার তিনি সমুচ্চ গগনভেদী অট্টালিকার ছাদে উত্থিত হইতেন, চিতোরের গৌরবস্তম্ভ দেখিয়া পূর্বপুরুষগণের গৌরবের কথা স্মরণ হইত অমনি নিঃসংজ্ঞের ন্যায় বসিয়া পড়িতেন, চারিদিক শূন্যময় বলিয়া বোধ হইত, জগৎসংসার তাঁহার নিকট ভীষণ নরককূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিয়া পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ প্রবেশ করিতেন। চিন্তার বিভীষিকায় প্রপীড়িত হইয়া সাগরজী ক্রমে ক্রমে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রিকালে একাকী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিনি চিন্তার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন সহসা এক ভীমকায় ভৈরবমূর্তি তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে সেই মূর্তি বলিয়া উঠিল—নরাধম! রাজপুত-কুলাঙ্গার! শীঘ্র এ পাপরাজ্য হইতে প্রস্থান কর। নতুবা তোর মঙ্গলের আশা নেই।" (রাজস্থান—বসুমতী কার্যালয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

ভৈরবের ভৈরবমূর্তি দেখেই হোক অথবা যে কারণেই হোক, সাগরজী আর চিতোরে থাকতে পারলেন না; ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে আহ্বান করে তিনি চিতোরের রাজ্যভার তাঁকে অর্পণ করলেন এবং বিজন স্কন্দপর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। শৈলশৃঙ্গেও সাগরজী শান্তি পেলেন না। পুনরায় তিনি দিল্লীশ্বরের কাছে উপস্থিত হলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের তিরস্কারবাক্যে তিনি আরো মর্মাহত হলেন এবং সভাস্থলেই বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করে আত্মহত্যা তথা প্রায়শ্চিত্ত করলেন। *(এই সাগরজীরই কুলাঙ্গার পুত্র—মহাব্বৎ খাঁ—জাহাঙ্গীরের সুপ্রসিদ্ধ দুঃসাহসী সেনাপতি)

চিতোর নগরী ফিরে পেয়ে অমরসিংহ আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। তখন মেবারের প্রায় আশীটি দুর্গ ও নগর তাঁর অধিকারে। পার্বত্য প্রদেশের দুর্গম দুর্গের উপরে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি চিতোরের প্রণষ্ট সৌন্দর্যের পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করলেন। প্রতাপসিংহের ভবিষ্যদবাণী ফলতেও দেরী হল না। সম্রাট জাহাঙ্গীর আবার মেবারের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। সংবাদ পেয়ে অমরসিংহও সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সমস্যা উপস্থিত হল সেনাদলের হিরোল চালনার (সম্মুখভাগ রক্ষণ) ক্ষমতা নিয়ে। শক্তাবৎ ও চন্দাবৎ—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল। শত্রু সৈন্য আসছে অথচ দুই·দলের মধ্যে মহাকলহ—মহাসমস্যাই বটে। সমস্যা সমাধান করতে অমরসিংহ বললেন—"সর্বাগ্রে যে দল অন্তলাদুর্গে প্রবেশ করতে পারবে, হিরোল রক্ষার ভার সেই দলেরই হস্তে অর্পিত হবে।" সুন্দরভাবে সমস্যার সমাধান ঘটল—চন্দাবৎগণ অন্তলা দুর্গ জয় করে হিরোল চালনার গৌরব অর্জন করলেন। অমরসিংহ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরাবল্লীর দ্বারস্বরূপ 'ক্ষমনর'-নামক গিরিপথে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করলেন (১৬১১ খৃঃ)। এই যুদ্ধে জাহাঙ্গীরের অন্যতম পুত্র 'পরভেজ' ছিলেন সেনানী। রাজপুতদের দুর্বার আক্রমণের মুখে মোগল সৈন্য পলায়ন করতে বাধ্য হল। পরভেজও অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন। জাহাঙ্গীরের ক্রোধের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এবার তিনি পরভেজের পুত্রকে সেনানী পদে বরণ করলেন এবং মহাবীর মহাব্বৎ খাঁকেও তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। এ যুদ্ধেও সম্রাট বাহিনী পরাজিত হল। এমনি ক'রে প্রতাপপুত্র অমরসিংহ '**সপ্তদশবার**" মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন।

কিন্তু জাহাঙ্গীর মেবারের দর্প চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। পুনরায় তিনি সমরায়োজন করলেন এবং অন্যতম পুত্র খুরমকে (পরে শাজাহান) মেবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন (১৬১৩)। বীরত্বে, সাহসে ও বিক্রমে খুরম ছিলেন

সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁর দুর্ধর্ষ আক্রমণ—মেবারের কাছে এক মহা সমস্যা রূপেই দেখা দিল।

"কোষাগার অর্থশূন্য, দুর্গ সৈন্যশূন্য, অস্ত্রাগার অস্ত্রশূন্য!" তবু মেবারের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জীবন থাকতে মেবারভূমি যবনের হাতে তুলে দেবেন না। সকলে দলে দলে এসে অমরসিংহের কাছে উপস্থিত হলেন। ক্ষমতানুসারে অর্থ সংগ্রহ করে রাজকোষে পাঠাতে লাগলেন। বীরাঙ্গনারা নিজ নিজ বসনভূষণ বিক্রয় করলেন। বণিকরা উদ্বৃত্ত অর্থরাশির অধিকাংশই রাজকোষে দান করলেন। দেখতে দেখতে রাজকোষ অর্থে পূর্ণ হয়ে উঠল। যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হ'ল। রাণা অমরসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু "যে বিজয়বৈজয়ন্তী বহুকাল পর্যন্ত গিহলোট রাজগণের মস্তকোপরি বিরাজ করিত, বীরকেশরী বাপ্পার বংশধর ভিন্ন আর কেহ কখন যে বিজয় কেতন মস্তকোপরি সমুচ্চত করিতে সমর্থ হন নাই, আজ জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান ক্ষুরমের সম্মুখে তাহা অবনত হইয়া পড়িল।" জাহাঙ্গীরের আত্ম কাহিনীতে এই পতনের কাহিনী সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। তা'তে দেখা যায়—"রাণাও অধীনতা স্বীকারে সম্মত আছেন।…… রাণা হতাশ হইয়া শূপকর্ণ ও হরিদাস ঝালা নামক দুইটি সর্দ্দারকে ক্ষুরমের নিকট প্রেরণ করেন। *সর্দ্দার দ্বয়ের মুখেই প্রকাশ পায় রাণা বৃদ্ধ, স্বয়ং আমার নিকট থাকিতে পারিবেন না, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র কর্ণ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া যথাযথ নিয়ম প্রতিপালন করিবেন……পুত্রের নিকটও বলিয়া পাঠাইলাম, রাণা সম্মানের পাত্র, কোন প্রকারে যেন তাঁহার সম্মানের ত্রুটি না হয় তাঁহার ইচ্ছানুসারেই যেন সকল বন্দোবস্ত করা হয়।" এই প্রথম মেবারের উচ্চ শির মোগলের পায়ে অবনত হ'ল।

টড-বর্ণিত এই কাহিনীকে ভিত্তি করেই নাট্যকার মেবার পতন নাটকের

বৃত্ত” রচনা করেছেন। এই কাহিনীতে যে ঐতিহাসিক তথ্য বা মর্ম (spirit of history) প্রকাশ পেয়েছে তা' এই যে (ক) অমরসিংহ প্রতাপের অন্তিম মুহূর্তের আদেশ এবং বংশগৌরবের মহিমা রক্ষা করতে ইতস্ততঃ করলেও, অটলপ্রতিজ্ঞ সর্দারদের স্বদেশপ্রীতির ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (খ) একাধিকবার তিনি মোগল শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন এবং প্রতাপসিংহের পুত্রের উপযুক্ত পরিচয় দিয়েছিলেন (গ) সগরসিংহকে চিতোরের রাণার পদে অধিষ্ঠিত করে এবং মেবারে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কৌশল প্রয়োগে জাহাঙ্গীর সিদ্ধকাম হননি। সগরসিংহ মেবারবাসীর কাছে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাননি। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। (ঘ) মোগল সম্রাট মেবারের যত বড শত্রু ছিলেন, মেবারের তার চেয়েও বড় শত্রু ছিল সেই সব রাজপুত বংশ যারা আগেই মোগলের কাছে মস্তক ও বংশ গৌরব দুটোই বিক্রয় করেছিল; এমন কি কন্যা দান করে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং সেই সব প্রসাদলোভী ধর্ম-ত্যাগীর দল যারা রাজপুত অভিমানকে—হিন্দু অভিমানকে—সমূলে বিনাশ করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। গজসিংহ, মহাব্বৎ খাঁ প্রভৃতি তাদেরই প্রতিনিধি। গজসিংহ মারবারের অধিপতি এবং জাতিতে হিন্দু হয়েও পাঁতিতে মুসলমান আর মহাব্বৎ খাঁ ছিল (টডের মতে)—সগরসিংহের ধর্মত্যাগী সন্তান। জাতিতে রাজপুত হয়েও ধর্মে মুসলমান। (ঙ) শেষ সংগ্রামে মেবারের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোক—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে—যথাসাধ্য অর্থ ও শ্রম দান করেছিল।

এই মূল তথ্য সম্বন্ধে পরবর্তী ইতিহাসে নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ পাওয়া যায়—মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন-কৃত “হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া” (১৮৮৯ খৃঃ) গ্রন্থে

পাওয়া যায়—"Mahabat Khan, when first sent on that service had gained a victory over the Rana, but was unable to do anything decisive from the strength of the country into which he, as usual, retreated. The same fortune attended Abdullah Khan afterwards appointed to succeed Mohavat; but Prince Khurram who was sent with an army of 20,000 men, evinced so much spirit in his attack on the Rajput troops......that the rana was at last induced to sue for peace; and his offer being readily accepted, he waited on shahjehan in person, made offerings in token of submission, and sent his son to accompany the prince to Delhi......" এখানে দেখা যাচ্ছে—প্রথমবার মহাবৎ খাঁ, দ্বিতীয় বার আবদুল্লা খাঁ এবং তৃতীয় বার খুরম (শাহজাহান) যেবার আক্রমণের অধিনায়ক ছিলেন এবং খুরমের কাছেই রাণা পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। "কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া"র মোগল পর্বে এ বিষয়ে যে বিবরণ লেখা আছে তার সার কথা এই:—"Before his accession jahangir had been deputed by his father to complete the conquest of Mewar, but had proceeded no farther than Fathpur sikri. Early in his reign he sent his son **Parviz** with a large force commanded by **Asaf Khan** and accompanied by **Raja Jagnnnath** of Amber or Jaipur. Their plan was to instal, as Rana, Sagar, an uncle of the real chief Amar Singh and thus create internal feuds. Amar Sing, who had succeeded his father in 1597 had devoted himself to

internal reforms, but had to some extent lost the martial vigour which had marked the rulers of chitor. *Spurred by his nobles he roused himself, and though the forces sent against him were able to occupy several places and left sagar in possession of chitor, they were withdrawn when Khasrau rebelled.........Jahangir on his return from Kabul to Agra despatched a new force under Mahavat Khan......After a year a fresh commander, **Abdullah Khan** who like Mahavat Khan had risen from the lowest rank, was appointed and had more success.........The Punjabi Raja Basu who had replaced Abdullah Khan in the Mewar Campaign had not been successful in it...Jahangir now felt that he could leave the capital and be nearer the the control of the campaign in Mewar......The Khan Azam......had been transferred to Mewar, and at his request Jahangir also deputed his own son Khurram, Raja Basu having died.........This arrangement was not congenial to Khurram..........Jahangir...removed Khan Azam from the Command.........Relieved of the presence of one whom he believed to be his enemy Khurram pressed on the occupation of Mewar, establishing posts in a number of places.........And though losses were severe......the injury to the defenders were greater. The families of many Rajputs nobles were captured, and the fortitude of Rana

himself......was gradually sapped. *He sent overtures to Khurram offering to recognise Mughal supremacy, but begging that he might be excused attendance at Court owing to his age.......It was decided that chitor should never again be fortified, but no matrimonial alliance was enforced........" (পৃঃ ৬১) এই বৃত্তান্ত থেকেও জানা যায়—(ক) মেবার একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছিল (খ) পরভেজ, মহাবৎ খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, রাজা বসু, খুরম প্রভৃতির অধীনে বার বার অভিযান চালনা করা হয়েছিল (গ) অমরসিংহ অমাত্য বা সর্দারদের প্ররোচনাতেই যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। (ঘ) খুরমের হস্তে রাণা পরাজিত হয়েছিলেন এবং সম্মানজনক সর্তে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। (ঙ) মেবার আক্রমণে অন্যান্য রাজপুত বংশের রাজাদের কেউ কেউ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকতেন। (চ) গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীর প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সাগরসিংহকে চিতোরের রাণা পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

সুতরাং বলা যেতে পারে—'মেবার পতন' নাটকে ইতিহাসের মূল কাঠামো বা মর্ম প্রায় ঠিকই আছে। সামন্তপতি চন্দাবৎ-এর স্থলে শালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ "একখানি পিত্তল খণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুড়িয়া" মারলে এবং রাণাকে হাত ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনলে, অথবা সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনস্থ কর্মচারীদের নাম একটু এদিক-ওদিক হ'লে, অথবা টড-অনুসরণে মহাবৎ খাঁকে সাগরসিংহের পুত্র ব'লে এবং গোবিন্দ-সিংহের জামাতা ব'লে কল্পনা করলে ইতিহাসের মর্মে তেমন মারাত্মক আঘাত লাগে না। অবশ্য, গোবিন্দসিংহের কন্যা "কল্যাণী", অমরসিংহের কন্যা "মানসী" এবং সগরসিংহের কন্যা "সত্যবতী" অস্তিত্বের দিক থেকে আপত্তিকর

না হ'লেও এবং ভাবের প্রতিনিধি হিসাবে গুরুত্বময় হ'লেও, বাস্তব চরিত্র হিসাবে লঘু হ'য়ে পড়ায়, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের প্রত্যাশিত বাস্তবতাকে তথা গুরুত্বকে আপত্তিকর মাত্রায় হ্রাস ক'রে দিয়েছে। কল্যাণীকে পতিব্রতা করা মানসীকে বিশ্বপ্রেমে-আত্মহারা করা এবং সত্যবতীকে স্বদেশপ্রেমে-সর্বস্বত্যাগী করার স্বাধীনতা নাট্যকারের অবশ্যই আছে, কিন্তু স্বাধীনতা যেখানে অসংযমে পরিণত হয় সেখানেই ক্ষতিকর; ব্যক্তি সৃষ্টি করতে নিছক ভাবের প্রতীক সৃষ্টি করলে—অর্থাৎ দেশকাল নিরপেক্ষ ও মাত্রাহীন চরিত্র সৃষ্টি করলে সৃষ্টির সামগ্রিক ঔচিত্য ব্যাহত হয়। তা'ই ব'লে কল্পনামাত্রই দোষের নয়—বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। গোবিন্দসিংহের মত জাত্যভিমানী চরিত্র, যিনি স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ করেছেন—তিনি যদি মেবারের পতনের আগে মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে মহাবতের শিবিরে উপস্থিত হন এবং রাজপুত-কুলাঙ্গার কোন গজসিংহের গুলিতে নিহত হন তা'হলে ইতিহাসের মর্ম আহত না হ'য়ে, বেশী ক'রেই প্রকাশিত হয়। তেমনি প্রকাশিত হয় যখন রাণা অমরসিংহ মহাবৎ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং যে মহাবৎ খাঁয়ের দল মেবার ধ্বংস করেছে তাঁর হাতে তরবারি তুলে দিয়ে বলেন—"এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—দেখো যেন তার অপমান না হয়।" আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হয়ে যাক।" এবং শেষ পর্যন্ত মহাবৎ খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন এই দু'টি ঘটনা ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করেনি, বরং ইতিহাসের মর্মটিকে উদ্‌ঘাটিতই করেছে—ইতিহাস যা' আভাষে বলেছে, নাট্যকার তা' উচ্চ ভাষায় বলেছেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মেবারের যুদ্ধ মোগলেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে, মেবারের যুদ্ধ রাজপুতের বিরুদ্ধে রাজপুতদেরই যুদ্ধ—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবৎ খাঁরই

যুদ্ধ। খুরম-চালিত বিশ হাজার সৈন্যের অভিযান, মেবারের পতনের শেষ নিমিত্ত কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ—মোগল-পদানত রাজপুত রাজাদের কুটিল চক্রান্ত, মহাবৎ খাঁর মত মহাবীর যোদ্ধার উদ্ধত আক্রমণ। এই তো ইতিহাসের মর্ম বা আত্মা। নাট্যকার এই মর্মকেই ব্যক্ত করেছেন—ইতিহাসের সূক্ষ্ম দেহটিকে প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই—"সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে সম্রাটকে পত্র লিখেছিলেন তাই সাহাজাদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন"—এই কল্পনা এবং গোবিন্দ-সিংহের এবং অমরসিংহের শেষ আচরণ ইতিহাসের প্রতিকূল কল্পনা হয়নি। তবে, তিন সিংহের তিন কন্যা ভাবাবেগে এবং আচরণে আর একটু সংযত হ'লে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধি তথা বাস্তবতার গুরুত্ব যে আরো বৃদ্ধি পেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বৃত্ত-পরিকল্পনা

মেবার-পতন নাটকের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যে প্রেরণা কাজ করেছিল, সে সম্বন্ধে আগেই সামান্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হ'লেও, এই নাটকের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—মেবার-পতন উপলক্ষ্য ক'রে জাতীয় দুর্ব্বলতার এবং পরাধীনতার মূল কারণ বিশ্লেষণ করা—জাতিকে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত করা,—জাতির ক্ষুদ্রতা, বর্ব্বরতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ—প্রাণহীন আচারের কঙ্কাল উপাসনা প্রভৃতি মনুষ্যত্ববিরোধী দোষগুলির অর্থাৎ পতনের কারণগুলির উপর

আলোকপাত করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির কাছে পুনরুজ্জীবনের ও প্রকৃত মুক্তির পথ—'হতাশাময় বর্তমান' থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করা। মেবার-পতনে নাট্যকার একাধারে মেবারের মত একটা মহাজাতির পতনের কারণ এবং উত্থানের উপায় উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয় চেতনার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জাতির অসহিষ্ণুতা যখন মুক্তির উপায় হিসাবে বিজাতি বিদ্বেষের ও হিংসার সহজ পথ খুঁজে নেওয়ার দিকে ঝুঁকেছিল—আত্মশুদ্ধির দুঃসাধ্য সাধনার প্রকৃত পথে না এগিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার চেষ্টা করছিল, তখন নাট্যকার এবং সমসাময়িক বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি জাতির কাছে আত্ম-সমালোচনার এবং আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন—"জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়······জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে·········নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হয়ে'··········· স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে ধরে চিরজীবন হাহাকার করলেও কিছু হবে না।" তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন—কোন জাতির পতন হঠাৎ এবং একদিনে হয় না, জাতির পতন আরম্ভ হয় সেদিন থেকেই, যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলে, যেদিন থেকে সে স্বাধীন চিন্তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, জাতির জীবন-স্রোত বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই বদ্ধজলায় নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি কীট বংশ বিস্তার করতে থাকে—ধর্মের আসনে প্রাণহীন আচারের কঙ্কাল তথা পাপকে বসিয়ে পুজা করে। তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন— যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষেই যায়—······· যখন জাত নির্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে আর—বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।"—এই দোষ থেকে জাতিকে মুক্ত না ক'রলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করা অসম্ভব। যেখানে ব্যক্তির মন সাম্প্রদায়িক চেতনার উর্ধ্বে

উঠে, জাতীয়-চেতনার উদার আকাশে এক হতে পারে না, ধর্মীয় আচার-বিচারকে মনুষ্যত্বের উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সংকল্প শূন্যে সৌধ নির্মাণেরই সমান। যেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, সেখানে সেই অধম জাতিকে রক্ষা করবে কে? যেখানে একজন বিধর্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না, যেখানে ধর্ম ও জাতিকে এক ক'রে দেখা হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক জাতি গঠন—বা জাতীয় সংহতি হবে কি করে? ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না—হবেও না। এই মহাব্যাধির প্রতিকারকল্পে এঁরা যে বিধান দিয়েছিলেন—তা' আমূল

আরোগ্য বিধান—নবধর্মের বিধান—বিশ্বপ্রেমের বিধান—বিশ্বমানবতা বোধের বিধান—তার সারমর্ম আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে।" মনুষ্যত্ব জাগলে আর তাদের নিজের কিছুই করতে হবে না। ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে।" যেদিন "এ জাতি আবার মানুষ হবে—যেদিন "তারা এই অপর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে, যেদিন তারা যা উচিত কর্তব্য বিবেচনা কর্বে ই নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।" সেদিন পরাধীনতার নগপাশ আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে, উজ্জ্বল ভবিষ্যত কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই দিক থেকে হিসাব করে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের প্রয়োজন এঁরা এত বেশী করে উপলব্ধি করেছিলেন যে মনুষ্যত্বকেই ধর্মের আসনে বসিয়ে পূজা দিতে বিধান দিয়েছিলেন। এমন কি আপাত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করতেও ইতস্তত: করেননি। যে স্বাধীনতালাভের ব্যাকুলতায় এত কথা, জাতীয় চেতনা উদ্দীপিত করার এত প্রয়াস, সেই বহুকাম্য স্বাধীনতা বা জাতীয়ত্বকে

পর্য্যন্ত ধিকার দিতে কুণ্ঠিত হননি—বলতে চেয়েছিলেন "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক। দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।" এই নিরপেক্ষ মনুষ্যত্ব-চর্চার এই আবেগ। জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে কতখানি সঙ্গত বা অসঙ্গত সে বিচারে এখানে প্রবেশ করে লাভ নেই, এখানে এটাই লক্ষণীয় যে তখন মনুষ্যত্বের মহত্তর আদর্শকেই শরণ্য বলে—মুক্তির যথার্থ উপায় হিসাবে, গ্রহণ করবার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তাঁদের শেষ আবেদন—"স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক, আবার তোরা মানুষ হ"। তাঁদের কাছে মুক্তির বা স্বাধীনতা লাভের সমস্যা শেষ পর্যন্ত 'মানুষ হওয়ার' সমস্যা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল—তাঁরা মনে করেছিলেন 'মানুষ' হ'লেই—"শত্রু মিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে, বিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত ক'রে দিয়ে"—মানুষ হতে পারলেই, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এই ধারণাগুলি নাট্যকারের মনে ছিল এবং প্রকাশ পাওয়ার জন্ত সুযোগের অপেক্ষা করছিল। 'মেবার-পতন' কাহিণীটিকে তিনি উপযুক্ত 'মাধ্যম' বা বিষয় (Objective Co-relative) বলে মনে করেছিলেন এবং নির্বাচন করেছিলেন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে একাধিক উপবৃত্তসমন্বিত বৃত্তের পরিকল্পনা করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল একাধারে মেবারের পতনের কারণ এবং পুনরুত্থানের উপায় নির্দেশ করা; আর এ কথাও বলেছি যে পতনের কারণ নাট্যকারের মতে—ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃবিরোধ, জাতিবিদ্বেষ—ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ (হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ) এক কথায় "মানুষ হওয়া"। একদিকে মনুষ্যত্বহীন হ'য়েই যেমন বহু রাজপুত মোগলের দাস হয়ে, বংশমানের বিনিময়ে, স্বাধীনতার বিনিময়ে, প্রাণটুকু রক্ষা,

করতে চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে মনুষ্যত্বহীনতার জন্যই, ধর্মান্ধতার জন্যই মেবার তার বীর সন্তানদের অনেককে জাতিচ্যুত করে, ঘৃণা ও অবজ্ঞা দিয়ে শত্রুপক্ষে ঠেলে দিয়েছিল—ধর্মত্যাগীকে জাতিচ্যুত করে শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। নাট্যকারের ধারণা—এই দোষেই রাজপুত জাতির পতন ঘটেছিল—"যখন একটা জাতি যায় সে নিজের দোষে যায়" এবং "যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা সে জাতিকে ঈশ্বর রক্ষা করতে পারেন না. মানুষ তো ছার"—যখন "ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, আর কে রক্ষা করে? নাট্যকারে মতে—মনুষ্যত্বহীনতাই সব কিছুর মূল কারণ, জাতি "মানুষ" হ'লেই আবার তার উত্থান ঘটবে এবং স্বার্থের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড়, জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব আরো বড়। মোগলপদানত রাজপুতের মনুষ্যত্বহীনতা দেখানোব জন্য নাট্যকার সগর সিংহ গজসিংহ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, ধর্মত্যাগী রাজপুতের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড় করেছেন মহাবৎখাঁকে—এবং তাকে দিয়ে "হিন্দুর... জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে' মেবার আক্রমণ করিয়েছেন, 'ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের—'ধর্মে ধর্মে যুদ্ধের কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করেছেন। যে প্রতিপাদ্যকে তিনি এদের আলম্বন করে উপস্থাপিত করেছেন তা' রাণার মুখেই ব্যক্ত হয়েছে—"ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ আর শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ আর গজসিংহকে।"......যখন জাত নির্জ্জীব হয়ে পড়ে যখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম "বিভীষণ" তার ঘরে ঘরে জন্মায়"। এদের মধ্যে গজসিংহ একনম্বরের বিভীষণ—তার হৃদয়ে একটি তারও উচু সুরে বাঁধা নেই। মহাবৎ খাঁ এবং সগরসিংহ স্বার্থের নির্মোকে আবৃত হ'লেও তাদের হৃদয়ে উচ্চ প্রবৃত্তির দু'একটি তার উচু সুরে বাঁধা আছে—হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে জাতি-অভিমানের ফল্গুধারা প্রবাহিত রয়েছে। মহাবৎ খাঁর মধ্যে জাতি-অভিমান একেবারে

করে নি, রাজপুতের গৌরবে সে গৌরব অনুভব করে, গৌরব করে বলে—"আমি ধর্মে মুসলমান হলেও আমি জাতিতে এই রাজপুত"। মহাবৎ খাঁকে দিয়ে নাট্যকার এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মত্যাগী মহাবৎকে নাট্যকার ক্ষমা করতে পারেন নি এবং—অনেককে দিয়ে অনেক কড়া কথা শুনিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁকে দিয়েই তিনি নতুন জাতিবোধের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-চেতনার ধারণা প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন, হিন্দুর সংকীর্ণ ধর্মভিত্তিক জাতি-চেতনার অর্থাৎ অনুদার সমাজবিধির সমালোচনা করেছেন। ধর্মত্যাগীকে যতদূর অপদস্থ করতে হয় বা ভৎর্সনা করা দরকার নাট্যকার তা' করেছেন, কিন্তু ধর্মত্যাগীকে বা বিধর্মীকে যারা বিজাতি ব'লে ঘৃণা করে এবং উপেক্ষার আঘাতে জাতির শত্রু ক'রে তোলে তাদের তিনি সমালোচনা করেছেন—মহাবতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়েছেন। একাধারে পতনের কারণ এবং উত্থানের উপায় নির্দেশ করার চেষ্টা ছিল বলেই মহাবৎখাঁ সম্বন্ধে নাট্যকারের দোমনাভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং ইতিহাসসম্মত উপসংহার যেখানে হওয়ার কথা সেখানে না হ'য়ে, অমর সিংহ ও মহাবতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে, বাকযুদ্ধে, অসি-আস্ফালনে এবং শেষপর্যন্ত পারস্পরিক ক্ষমা প্রার্থনায় হয়েছে। মেবারের হিন্দু ও মুসলমান জাতি-অভিমানে আবার এক হয়েছে—আবার মানুষ হতে চেয়েছে। এই উপসংহার দেখে সহজেই মনে হ'তে পারে যে—নাটকের root-action অমরসিংহ মহাবৎ খাঁর বিবাদ পরিহার করা তথা বিশ্বপ্রেমে বা মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং মেবার-পতন নাটকের root-idea হয়ে দাঁড়িয়েছে—"স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক—আবার তোরা মানুষ হ॥" এই "root-idea' এবং 'root-action'—কে প্রতিপাদিত করার জন্য নাট্যকার দু'টি পক্ষের বা শিবিরের অধীনে ঘটনা সাজিয়ে বৃত্ত রচনা করছেন এবং পক্ষের বা শিবিরের মধ্যে এক বা একাধিক উপবৃত্ত কল্পনা করেছেন।

পক্ষ দুটি এখানে মোগল সাম্রাজ্য ও মেবার; মোগলের প্রতিনিধি সম্রাট জাঁহাঙ্গীর এবং মেবারের প্রতিনিধি রাণা অমরসিংহ। মোগল পক্ষে আছে সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষগণ আর আছে—রাজপুত কুলাঙ্গার গজসিংহ ও সগরসিংহ এবং সগরসিংহের পুত্র মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। অন্যদিকে মেবারের পক্ষে আছে—গোবিন্দ সিংহ, সগর সিংহের কন্যা সত্যবতী, শঙ্কর, জয়সিংহ, কেশব প্রভৃতি রাজপুত সামন্তরা। আগেই বলেছি, জাতির ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা দেখানোর জন্য নাট্যকার রাজপুতদের একাংশকে মোগলের দাস রূপে উপস্থাপিত করেছেন, একাংশকে ভীরু ও সন্ধিকামী করেছেন এবং একাংশকে অটলপ্রতিজ্ঞ দেশৈকপ্রাণ করে গড়েছেন! মেবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিচ্ছেদের রূপটি তুলে ধরবার জন্য নাট্যকার সগরসিংহের পরিবারটিকে বেছে নিয়েছেন। সগরসিংহ মোগলের কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন, তাঁর পুত্রটি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে—মহাবৎখাঁ হয়ে মোগল সেনাপতি হয়েছে। অথচ সেই সগরসিংহেরই কন্যা সত্যবতী দেশের জন্য সন্ন্যাসিনী—চারণদের অধিনায়িকা। নাট্যকার এই পরিবারটিকে মেবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেন নি। ষোলআনা-রাজপুত গোবিন্দ সিংহের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সংযুক্ত করে রেখেছেন, গোবিন্দ সিংহের কন্যা 'কল্যাণী'কে মহাবতের পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন। এই কল্পনা শুধু কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টির জন্যই করেছেন তা নয় এই কল্পনাদ্বারা নাটকের "root idea"—কে পরিপোষণ করেছেন। জাতি-ধর্মের সংকীর্ণতার উচ্চে প্রেমের আসন, এই তত্ত্বটিকে কল্যাণীর স্বামীর জন্য আনন্দময় আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। হৃদয়ের মিলনকে জাতি-ধর্মের বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে যারা চায় তারা মনুষ্যত্ব-বিরোধী কাজ করে, হৃদয়ের সহজযোগে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হোক—সামাজিক মিলন ক্ষেত্র থেকে ধর্মের বাধা দূর হোক—এই বাণীটিই কল্যাণীর

জীবন দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন—প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করতে—বিশ্বপ্রেমে পরিণত করতে, তথা জাতি-ধর্মের গণ্ডীর উর্দ্ধে হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র রচনা করতে। মনুষ্যত্বের বা বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পাঠ বা প্রচার করবার জন্য নাট্যকার উত্তরসাধিকাও সৃষ্টি করছেন; সে মানসী—রাণা অমরসিংহের কন্যা। সে মনুষ্যত্বের ধ্যানে সমাহিতা, বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা। নাটকের ধ্রুবা গীতি মানসীকে নাট্যকার অমরসিংহের পরিবারের মধ্যেই বা রাজপুরীতেই আবদ্ধা করে রাখে নি। আদর্শগতপ্রাণা হ'য়েও মানসী –গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়সিংহকে ভালবেসেছে—অজ্ঞাতসারে প্রাণ দিয়েছে। এইভাবে নাট্যকার তিনটি সিংহ-পরিবার সম্বন্ধ-সূত্রে দিয়ে সংযুক্ত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি চরিত্রকে মূলকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সম্বদ্ধ করেছেন। কল্যাণী শুধুমাত্র পতিপ্রেমের আদর্শই নয় কল্যাণী মহাবৎ খাঁয়ের মেবার অভিযানের অন্যতম প্রেরণা হয়েছে। মানসী শুধু বিশ্বপ্রেমেরই চারণী নয়, মানসী নাটকের উপসংহারকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। অমরসিংহ ও মহাবৎখাঁর উন্মুক্ত তরবারির মধ্যে উপস্থিত হয়ে, বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে উভয়ের আক্রোশ প্রশমিত করেছে—ধর্মে পৃথক হয়েও জাতিতে যাঁরা এক—সেই মুসলমান মহাবতকে ও হিন্দু অমরসিংহকে "আলিঙ্গনাবদ্ধ" করেছে। মানসীর কণ্ঠেই নাট্যকার শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন—জাতীয় পরাধীনতা-শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা—আবার মানুষ হওয়া।"

যে মূল ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য এরূপ বৃত্ত পরিকল্পিত হয়েছে তা সবিস্তারেই বলা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে এই কারণেই মেবার-পতন ব্যাপারটির উপসংহার যেখানে প্রত্যাশিত ছিল সেখানে না হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হয়েছে এবং তার জন্য ইতিহাসকেও একটু বেঁকিয়ে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ মোগলের কাছে অমরসিংহের আত্মসমর্পণে নাটকের উপসংহার না ঘটিয়ে, পতনের পরিশিষ্ট রচনা করে উত্থানের উপায়ের দিকে

অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে—মহাবৎখাঁর সঙ্গে অমর সিংহের সাক্ষাৎকার ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের উদ্যম এবং শেষপর্যন্ত উভয়ের ক্ষমা প্রার্থনা দেখানো হয়েছে। এই পরিশিষ্ট পরিকল্পনায় বৃত্তের একাগ্রতা তথা রসনিষ্পত্তি ব্যাহত হয়েছে কি না তা' অবশ্যই বিচার্য বিষয়। এখানে শুধু বৃত্তের একাগ্রতা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে—রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে রসবিচারঅধ্যায়ে। বৃত্তের একাগ্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে সেখানেই যেখানে root-idea বা premise হয় সুস্পষ্ট এবং উপযুক্ত root action-এ নাটকের উপসংহার (লসনের মতে—climax) ঘটে। সুতরাং একাগ্রতা আছে কি নেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে, প্রথমেই স্থির করতে হবে নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্যটি। এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি তা' নাটকের নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে, নাটকের মধ্যেও পাত্রপাত্রীদের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। সিদ্ধান্তবাক্যের আকারে বললে বলতে হবে—যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা—ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যে জাতি মনুষ্যত্ব হারিয়ে সংকীর্ণ স্বার্থে মগ্ন, সেই জাতির পতন অনিবার্য। এই প্রতিপাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই যে স্বাধীন রাজপুত জাতির শেষ প্রতিনিধি মেবার, রাজপুত রাজাদের ক্ষুদ্রতা ও অন্তর্বিরোধের ফলেই—মনুষ্যত্বহীনতার জন্যই, মোগলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে তথা মাথা নত করতে, স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। রাজপুত রাজাদের মনুষ্যত্বহীনতা ও অন্তর্বিরোধের ফলে, রাজপুত জাতির স্বাধীনতা এবং তার শেষপ্রতিনিধি মেবারের প্রতিরোধশক্তি ও স্বাধীনতা-গর্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যকে ব্যক্ত করাই নাটকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু অমরসিংহের পরাজয় ও মোগল-অধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে মেবার-পতন ব্যাপারটি শেষ না হওয়ায় অর্থাৎ কার্যকে আরও খানিকটা টেনে নিয়ে যাওয়ায় —দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেওয়ার অপমান (মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা) বরণ করতে অমরসিংহের অসম্মতি, পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য

ত্যাগ ক'রে বনবাসে যাওয়ার সঙ্কল্প—মহাবৎখাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, মেবারের সঙ্গে সঙ্গে মেবারের রাণাকে শেষ করতে আহ্বান জানানো—শেষ পর্যন্ত শোকে ক্ষোভে মহাবৎখাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এবং মানসীর অনুপ্রেরণায় উভয়েরই (মহাবৎ-অমরসিংহ) অস্ত্রত্যাগ ও ক্ষমা প্রার্থণা প্রভৃতি ব্যাপারে নাটকের উপসংহার ঘটায়, এবং বিশেষ ক'রে নতুন একটা ভাবের দিকে লক্ষ্মণীয় ঝোঁক পড়ায়—যে দেশপ্রীতির অভাবের জন্য রাজপুত জাতির তথা মেবারের পতন সেই দেশপ্রেম-জাতিপ্রেমকে ডুবিয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রেম বা মনুষ্যত্বকে ভজনা করার জন্য আবেদন করায় ("স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক আবার তোরা মানুষ হ") এ কথা অবশ্যই মনে হতে পারে যে বৃত্তের একাগ্রতা ব্যাহত হয়েছে, নাট্যকার তাঁর মূলভাব বা প্রতিপাদ্য থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, মূলভাবের সুরের সঙ্গে অন্যভাবের সুর মিশলেও মূলভাব আচ্ছন্ন হয়নি এবং বৃত্তের একাগ্রতাও নষ্ট হ'য়ে যায় নি 'স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক আবার তোরা মানুষ হ" বা "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ"—মেবার-পতন জনিত মহাশোকের সান্ত্বনা বাক্য মাত্র। সান্ত্বনায় শোকের উপশম হয়, শোকের কারণ নষ্ট হয় না; এখানেও তা হয়নি। মানসীর সান্ত্বনা বাক্যে অমরসিংহ মহাবৎ খাঁ 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' হয়েছে বটে, কিন্তু যে মেবারের শব স্কন্ধে করে শোকক্ষিপ্ত অমরসিংহ' মহাবৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তাঁদের আলিঙ্গনের ফলে সেই শব পুনর্জীবিত হয়ে উঠে নি। মেবার তাঁর হারানো স্বাধীনতা ফিরে পায় নি বা ভাইয়ে ভাইয়ে যেখানে বিবাদ সে জাতিকে কে রক্ষা করে?—এ প্রশ্নের গুরুত্বও নষ্ট হয়ে যায় নি বরং এই কথাটাই বেশী করে মনে হয় এই 'আলিঙ্গন' যুদ্ধের আগে হলে মেবারের এই শোচনীয় পতন ঘটত না। মেবারের শবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে উভয়ের ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ের অপরাধকেই বড় করে তোলে।

এই সম্পর্কেই আর একটা কথা—মেবার পতন, বৃত্তের পরিণতি সম্বন্ধে একটি

কথা বলতে চাই। আগে একাধিকবার বলেছি, মেবার-পতনের, প্রত্যাশিত উপসংহার বা root-action মেবারের পরাজয়ে—অবরসিংহের আত্মসমর্পণে সন্ধিপ্রস্তাবে (সন্ধি যত সম্মানজনক হোক, সোণার শিকলের মতেই বন্ধন মাত্র) কিন্তু এই নাটকে মেবার-পতনে বৃত্তের পরিণতি সেখানে হয় নি, কারণ বৃত্তের পরিকল্পনা সে ভাবে করা হয় নি। মেবার-পতনের বৃত্তে মহাবৎখাঁই মেবার-পতনের প্রধান নিমিত্ত কারণ। মেবারকে ধ্বংস ক'রেছে—মেবারের প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট করেছে মহাবৎখাঁই—ক্ষুরম এসে শুধু উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ করেছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের পরিণতিই—মেবার-পতন। তাই তো দেখা যায় (পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে)—মেবার পতনের পরেই যুদ্ধক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে অমরসিংহ "মহাবৎখাঁ—গজসিংহ" বলে বার বার চীৎকার করেছিলেন তাঁদের ডেকেছিলেন পরাজিত মেবারের রাণাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য—যারা মেবারকে ধ্বংস করেছে তাদেরই হাতে মরবার জন্য। মেবারের শেষ বীর গোবিন্দসিংহও এই একই কারণে মহাবৎখাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন, "রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে, দেখবার আগে মরতে চেয়েছেন এবং চেয়েছেন তার হাতেই যে জামাই হয়েও পুত্রহন্তা—দেশের সন্তান হয়েও যে পরের গোলাম (নিজের) ধর্মের হয়েও যে মুসললান—রাজার ভাই হয়েও যে তার শত্রু।" গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু কামনা চরিতার্থ হয়েছে। অমরসিংহও মৃত্যু চান—দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মাণ নেওয়া,—এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল। নাট্যকার এই অপমানের অপমৃত্যু থেকে অমরসিংহকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন—ফর্মাণ নেওয়ার আগেই রাজ্যভার ত্যাগ করিয়েছেন বটে কিন্তু সম্ভাবিতস্য চাকীতির্মরণাদতিরিচ্যতে—"wounded spirit who can bear"" —রাণাও ডেকে পাঠিয়েছেন মহাবৎখাঁকে—সম্পূর্ণ ধ্বংসকার্যকে সম্পূর্ণ করতে মেবারের সঙ্গে মেবারের রাণাকেও শেষ করতে। এই পরিকল্পনা

মেবার-পতন-বৃত্তেরই অতিস্বাভাবিক পরিণতি—সম্ভাব্য উপসংহার (Resolution)। অতএব এই পরিশিষ্ট কল্পনায় বৃত্তের একাগ্রতা ব্যাহত হওয়া বলতে যা বুঝায় তা হয় নি। অর্থাৎ মানসীর দার্শনিক উচ্ছাসের ধাক্কায় নাটক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় নি।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে—নাটকের মূল কার্য ধারার অর্থাৎ রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে, সামাজিক ও দার্শনিক-তত্ত্ব-বাহী উপধারা জুড়ে দিয়ে নাট্যকার একদিকে যেমন বৃত্তের জটিলতা ও আয়তন বৃদ্ধি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নাটকের ভাব বা মনন মূল্য বৃদ্ধি করেছেন; কিন্তু তত্ত্বকে বহন করার জন্য যে সব পাত্রপাত্রী নির্বাচন বা নির্মাণ করেছেন তাদের অতিরোমান্টিক অবাস্তব আচরণে বৃত্তের গুরুত্ব হানি ঘটেছে। যদিও বৃত্ত-পরিকল্পনা আসলে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, ঘটনাকে নানা সন্ধিতে বা পর্বে গুছিয়ে একটা কার্যকে উপস্থাপিত করা—আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত একটা ঘটনা—বৃত্ত বা কাহিনী তৈরি করা, তবু এ কথাও মনে রাখতে হবে যেন তেন প্রকারেণ একটা কাহিনী গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয়, বৃত্তের সামগ্রিক গুরুত্ব প্রত্যেকটি পরিস্থিতির, পাত্রপাত্রীর প্রতিটি আচরণের ঔচিত্যের উপর নির্ভর করে এবং উপবৃত্তের দুর্ব্বলতায় প্রধান বৃত্তের গুরুত্ব হ্রাস পায়, পারিপার্শ্বিক লঘুতা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের উপর ছায়া ফেলে—গুরুত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। ভাবের বা তত্ত্বের দার্শনিক গুরুত্ব যতই থাক, অনুচিত চরিত্রের মুখে তা, ছোট মুখে বড় কথা'রই মতো হেয় হয়ে পড়ে। ভাবকে সুন্দর প্রতিরূপে ব্যক্ত করায় কল্পনাশক্তির মহিমা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু যে পরিকল্পনাশক্তির বলে রূপদক্ষ জীবস্বরূপ সৃষ্টি করেন, সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নাটকের বৃত্ত-পরিকল্পনায় নাট্যকার অনবদ্য নির্মাণকৌশল দেখাতে পারেন নি—ঐতিহাসিক নাটকে যে পরিমাণ বাস্তবিকতার মায়া থাকা উচিত সেই পরিমাণ মায়া (illusion of reality) সৃষ্টি করতে পারেন নি। ঘটনাবিন্যাস ও

চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ করলেই এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বুঝতে পারা যাবে।

ঘটনাবিন্যাস বিশ্লেষণ :

নাটকের মূল কার্য—মেবারের বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী কর্তৃক উপর্যুপরি আক্রমণ, মেবারের প্রতিরোধ এবং শেষ যুদ্ধে মেবারের পতন ও পতনের প্রতিক্রিয়া। মূলকার্য যেখানে মেবারের পতন, সেখানে নাটকের আরম্ভ (exposition) অবশ্যই আক্রমণের সূচনা দিয়েই হবে এবং নাটকের উপসংহার ঘটবে মেবার-পতনের প্রতিক্রিয়ায়। এই মূল কার্য্যধারাটিকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করে নিয়েছেন। **প্রথম অঙ্কের** উপস্থাপিত কার্য :— ক) মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করতে এসেছে (খ) রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা—যুদ্ধে অনিচ্ছা (গ) সন্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের প্রতিক্রিয়া (ঘ) গোবিন্দ সিংহের প্ররোচনায় রাণার যুদ্ধযাত্রা ও দেবার যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়গর্বে উদয়পুরে প্রবেশ। **দ্বিতীয় অঙ্কের কার্য :—** (ক) মেবার আক্রমণ করার জন্য নূতন মোগল সৈন্য এসেছে (খ) রাণার নৈরাশ্য ও যুদ্ধে অনিচ্ছা—সন্ধির সঙ্কল্প (গ) সত্যবতীর দেশভক্তির উদ্দীপনায় রাণার সঙ্কল্প পরিবর্তিত—রাণার যুদ্ধপ্রস্তুতি। (ঘ) মোগল সেনার পরাজয় (ঙ) পরাজয়ের পরে, আবার সাহাজাদা পরভেজের অধীনে মেবারে সৈন্য প্রেরণ। **তৃতীয় অঙ্কের কার্য :—**(ক) সামন্তদের বিজয়োল্লাস (খ) চিতোর দুর্গ অধিকার (বাহুবলে নয়, সগর সিংহের দানে) (গ) মহাবৎখাঁর রাজপুত জাতি উচ্ছেদ করার, হিন্দুত্ব ধ্বংস করার সঙ্কল্প (ঘ) পরভেজের পরাজয়ে জাহাঙ্গীরের উত্তেজনা (ঙ) আত্মহত্যা করে সগর সিংহের প্রায়শ্চিত্তবিধান। **চতুর্থ অঙ্কের কার্য :—**(ক) মহাবৎ খাঁ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে এসেছেন নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছেন। (খ) প্রতিশোধের জন্য অমর সিংহের ও গোবিন্দ সিংহের শেষ সঙ্কল্প (গ) অন্যান্য সামন্তদের নিষেধ সত্ত্বেও রাণার যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধে পরাজয়।

পঞ্চম অঙ্কের কার্য :—(ক) পরাজিত অমরসিংহের উন্মত্তকল্প প্রতিক্রিয়া—মৃত্যুবরণের ঐকান্তিক আকুলতা (খ) স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে গোবিন্দসিংহও মরতে চান এবং চান বলেই মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানান (গ) দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের 'ফর্মান' নিতে হবে ব'লে রাণা পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন (ঘ) রাণা অমরসিংহ মহাবৎ খাঁকে ডেকে পাঠান এবং মেবারের সঙ্গে মেবারের রাণাকেও শেষ করবার জন্য অনুরোধ করেন—অনুরোধ রক্ষা না করায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন—(ঙ) মানসী এসে দু'জনকে নিরস্ত করে এবং উভয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' হয়। নাটকের মূল কার্য এইটুকুই। বলা বাহুল্য, শুধু এই কার্য উপস্থাপনা করার জন্য যে বৃত্ত আবশ্যক তার খুব একটা বড় বা জটিল হাওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু নাট্যকার মূল কার্যের সমান্তরালে একাধিক উপধারা সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে নাটকের কাহিনীতে অদ্ভুত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, প্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে 'কল্যাণী'কে, দেশপ্রেমের মহিমা দেখাতে 'সত্যবতী'কে এবং প্রেমের বিশ্বপ্রেমের ও সেবাধর্মের মহিমা প্রচার করতে 'মানসী'কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থাপনা করতে গিয়ে নাট্যকার কল্যাণীকে গোবিন্দসিংহের কন্যারূপে এবং মহাবৎ খাঁর পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন, সত্যবতীকে সগরসিংহের কন্যারূপে এবং মানসীকে অমরসিংহের কন্যারূপে এবং অজয়সিংহের প্রণয়িণীরূপে কল্পনা করেছেন। এইভাবে নাটকের বৃত্তটির মধ্যে একাধিক উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে। 'কল্যাণী-মহাবৎ খাঁ', 'মানসী-অজয়' সত্যবতী ও সগরসিংহকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত রচিত হয়েছে। এই সব প্রাসঙ্গিক বৃত্তের কার্য উপস্থাপিত করতে এক একটি অঙ্কের মধ্যে একাধিক দৃশ্য কল্পনা করতে হয়েছে। প্রথম অঙ্কে রয়েছে ৮ দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে—৭ দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে ৫ দৃশ্য চতুর্থ অঙ্কে—৬ দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে—

৮ দৃশ্য ; মোট ৩৪ দৃশ্যে নাট্যকার সমগ্র কার্যটি উপস্থাপিত করেছেন। **কল্যাণী** মহাবৎ খাঁকে এখনও স্বামী ব'লে মনে মনে পূজা করে ; পিতৃগৃহে থাকলেও, এমন একদিন আসে যেদিন সে পিতা বুঝে না, জাতি বুঝে না, ধর্ম বুঝে না, পতিকেই সে একমাত্র ধর্ম ব'লে বুঝে ; পতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে ঘরের আশ্রয় ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়ে। মহাবতের সঙ্গে তার পথেই দেখা হয়, কিন্তু মিলন হয় না। ভ্রাতার মৃতদেহ ও দেশবাসীর রক্তস্রোত মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানসীর প্রেরণায় সে তার ব্যর্থ প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করে সুখী হতে চেষ্টা করে।—এই সব ঘটনা নিয়ে কল্যাণী-উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে। **মানসী-অজয়** উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে নিম্নলিখিত ঘটনা নিয়ে :—মানসী রাজকন্যা। গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়কে সে ভালবাসে, ভালবাসতে চায় সে প্রত্যেক মানুষকে। সমবেদনায় তার অন্তর পূর্ণ। সে বিবাহ করতে চায় না—বিবাহের চেয়েও মহৎ কাজ করতে চায়। অতিথিশালা খুলে দীন দুঃখীকে সেবা করে ! 'যুদ্ধে যেতে চায়—আহতদের সেবা করতে। যুদ্ধে যায়ও এবং আহতদের সেবাও করে। অজয় তার আচরণে মুগ্ধ হয়—বিস্মিত হয়। কুষ্ঠাশ্রম খুলেছে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতে। পিতার সঙ্গে সে জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে এবং পিতার মায়াবাদী ভ্রান্ত চিন্তা খণ্ডন করে। অজয়ের মৃত্যু মানসীর 'প্রেমভিখারিণী দুর্বলা রমণী' রূপটি ব্যক্ত করে দেয় —মানসীর শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনা ছাপিয়ে উঠে। কিন্তু এই ঝড়ের পরে মানসী আবার তার কর্তব্য পথ বেছে নেয়—মনুষ্যের কল্যাণে সে জীবন উৎসর্গ করতে সঙ্কল্প করে। **'সগরসিংহ-সত্যবতী-মহাবৎ'কে** ঘিরে যে উপ-বৃত্ত রচিত হয়েছে তাতে রয়েছে :—সগরসিংহ রাণা প্রতাপের ভাই হওয়া সত্ত্বেও মোগলদাস হয়ে আগ্রায় আছেন, সঙ্গে আছে তাঁর দৌহিত্র অরুণ—সত্যবতীর পুত্র। তিনি নামেই রাজপুত ও হিন্দু ; যুদ্ধ তার কাছে আতঙ্ক ; হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোন পরিচয়ই নেই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদ্দেশ্যেই সম্রাট

তাঁকে রাণা পদে অভিষিক্ত করে চিতোরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কালক্রমে সগরসিংহের মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। সত্যবতীর ভৎর্সনায় তাঁর চোখ ফোটে, আকে তিনি চিনতে পারেন। চিতোর দুর্গ ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী হন—মহাবতের সঙ্গে দেখা করেন, পুত্রকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আহ্বান করেন। জাহাঙ্গীরের সামনে গিয়ে তিনি নির্ভীক চিত্তে সত্য ভাষণ করেন এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করেন।

এই সব প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ঘটনাকে স্থান দিতে নাট্যকারকে অনেকখানি অবকাশ সৃষ্টি করতে হয়েছে। দৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করলেই কে কতখানি স্থান নিয়েছেন পরিষ্কার বুঝা যাবে।

***প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য**—গোবিন্দসিংহের কুটিরে, গোবিন্দসিংহ অজয়সিংহের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে প্রধান কার্যধারার বীজস্থাপনা করা হয়েছে—জানানো হয়েছে—মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করতে এসেছে (২) রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা (৩) রাণা অমরসিংহ বিলাসী ও আরামপ্রিয়, যুদ্ধবিমুখ হয়েছেন। এই দৃশ্যেই 'কল্যাণী'কে দেখানো হয়েছে—বটে, কিন্তু কল্যাণী তাঁর শেষ উক্তির মতোই—অস্ফুট। কল্যাণীর কান্নার অর্থ গোবিন্দসিংহ বুঝতে পারেননি; দর্শকরাও পারেন না। "যদি জানতে বাবা। যদি বুঝতে!—শুধু এইটুকুই বুঝায় যে কল্যাণী ভয়ে কাঁদেনি, কেঁদেছে অন্য কোন কারণে। কল্যাণী যে মহাবৎ খার পত্নী তা' আমরা জানিনে এবং জানিনে ব'লেই 'কারণ'টিও বুঝতে পারিনে, অবশ্য কল্যাণী সম্বন্ধে একটু কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য—উদয়পুরের পথ।

এই দৃশ্যে চারণী সত্যবতীকে প্রথম উপস্থাপিত করা হয়েছে। এবং তার চরিত্রের বীজটিও স্থাপনা করা হয়েছে। সত্যবতীকে রাজসভায় নেওয়ার আগেই দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে।

*[চরিত্রটি চূড়ান্ত রোমান্টিক—এক কথায় দেশপ্রেমের মূর্ত আবেগ। একদিন সকালে 'মেবার মেবার' বলে চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর মেবারে এসে—গ্রামে উপত্যকায় মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছে। এর অধিক পরিচয় কেউ জানে না, নিজেও সে কোন পরিচয় দেয়নি। অতএব দর্শকের কৌতূহলও অমার্জনীয়। তাই অজয় বা অমরসিংহ কেউ তাকে চেনে না]

তৃতীয় দৃশ্য—উদয়পুরের রাজসভা। (মন্ত্রণা সভা বলাই ঠিক) যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাণার যুক্তি—জয়সিংহ-কেশব-কৃষ্ণদাস শঙ্কর প্রমুখ সামন্তদের সেই যুক্তি খণ্ডন। গোবিন্দসিংহের উদ্দীপনাময় ভাষণ। তা' সত্ত্বেও রাণার সন্ধিস্থাপনের সঙ্কল্প—সন্ধিপ্রস্তাব জানাতে মোগল দূতকে আহ্বান। সেই মুহূর্তে 'বেগে সত্যবতীর প্রবেশ' সন্ধিপ্রস্তাবে বাধা সৃষ্টি—সত্যবতীর অনমনীয় সঙ্কল্পে শেষ পর্যন্ত রাণার যুদ্ধযাত্রা। (আধিকারিক বৃত্তের কার্য)।

চতুর্থ দৃশ্য—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ

সেনাপতি মহাবৎ খাঁ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল্লার কথোপকথনের ভিতর দিয়ে একদিকে প্রথম যুদ্ধের সেনাপতি হেদায়েৎ আলি খাঁর ভীরু প্রকৃতিটি অন্যদিকে মহাবৎ খাঁর পরিচয় ও প্রকৃতি সূচিত করা হয়েছে। মহাবৎ খাঁকে উপস্থাপিত বা প্রকাশিত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

পঞ্চম দৃশ্য—মোগল-শিবির। শিবির প্রান্তে খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ ও অধীনস্থ কর্মচারী হুসেনের আলাপ-আলোচনা। যুদ্ধ আসন্ন এই সংবাদটুকু দেওয়ার জন্য এবং হেদায়েৎকে দিয়ে লঘু পরিহাস সৃষ্টি করবার জন্যই দৃশ্যটি পরিকল্পিত।

ষষ্ঠ দৃশ্য—উদয়সাগরের তীর। মানসী-অজয় উপবৃত্তের ভিত্তি এখানে স্থাপিত হয়েছে। 'মানসী' অজয়কে ভালবাসে শুধু অজয়কেই নয়, মানসী ভালবাসে মানুষকেই—তার উদার হৃদয়ের মধ্যে সে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করতে চায়। মনে প্রাণে সে যুদ্ধের বিরোধী। যুদ্ধ যদি অনিবার্যই

হয়, হত্যালীলা সে যদি বন্ধ নাই করতে পারে, তাহলে সে আহতদের শুশ্রূষা করতে তো পারে। সেবাব্রত সে গ্রহণ করে।

আধিকারিক বৃত্ত স্পর্শ করে থাকলেও এই দৃশ্যটির একাংশে আছে অজয়-মানসী উপবৃত্তের কার্য, অন্য অংশে আছে—অমরসিংহের পারিবারিক বৃত্তের ব্যাপার—বিশেষ ক'রে রাণী-চরিত্রের বীজস্থাপনা।

সপ্তম দৃশ্য—মেবার-যুদ্ধক্ষেত্র। শিবিরাভ্যন্তরে হেদায়েৎ হুসেনের কথোপকথন। সেনাপতি হেদায়েৎকে দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির এবং মোঘল শক্তির পরাজয়ের সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা। [সেনাপতিকে এত লঘু বা ভাঁড়ে পরিণত করায়, ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে যুদ্ধের যতখানি গুরুত্ব প্রত্যাশিত তা পাওয়া যায় না ।]

দৃশ্যান্তর—যুদ্ধক্ষেত্র। সেবাব্রতচারিণী মানসী অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে—আহতদের শুশ্রূষা করবার জন্য ; হত্যালীলার মধ্যে অমৃতবর্তিকার মত। এখানে অজয় এসেছে 'সসৈন্যে' এবং মানসীর মুখে অপূর্ব 'জ্যোতি' দেখে বিস্মিত হয়েছে।

[ভাবের নিরপেক্ষ প্রকাশ হিসাবে—মানসী সত্যই "একটা সৌন্দর্য্য। একটা গরিমা। একটা বিস্ময়।" কিন্তু মানসীর এই আচরণ কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট—অতি অবাস্তব কল্পনা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের মতো রাজকন্যার যুদ্ধক্ষেত্র শুশ্রূষা করতে যাওয়া, বিশেষতঃ এই যুদ্ধে—অতিশায়ী ভাবালুতারই নিদর্শন]

অষ্টম দৃশ্য—উদয়পুরের রাজপথ। গীতসহ বিজয় শোভাযাত্রা।

* [প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অঙ্কের কার্য শেষ।]

* **দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য**—"আগ্রায় রাজা সমরসিংহের গৃহকক্ষ" সগরসিংহ ও অরুণসিংহের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে—আধিকারিক

বৃত্তের সঙ্গে অপরিহার্য যোগেযুক্ত সগরসিংহের উপস্থাপনা করা হয়েছে—তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সত্যবতীর বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে—হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির ও সঙ্কীর্ণতার সমালোচনা করা হয়েছে। মূল কার্যের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে এই—দেবারযুদ্ধের পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর সগরসিংহকে রাণার পদে অভিষিক্ত করে মেবারে পাঠাবার সঙ্কল্প করেছেন। [সগরসিংহের আত্মবিস্মৃত হিন্দুর দৃষ্টান্ত করতে গিয়ে নাট্যকার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এখানে বাল্মীকির বা রামায়ণের নাম না শুনলেও মহাবৎকে ভৎর্সনা করার সময় (৩য়-৪র্থ দৃশ্য) ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির নাম ও ধর্মের মূলতত্ত্ব গড় গড় করে বলে গেছেন। এই সমস্যার সমাধান করতে বলা যেতে পারে—সন্ন্যাস নেওয়ার পরেই ও সব নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তা না বললে বলতে হবে এই যে অরুণের সঙ্গে যে কথোপকথন তা "পরিহাসবিজল্পিত"।

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য—উদয়পুরের রাজ অন্তঃপুর। মানসী অজয়ের আলাপ-আলোচনা—মানসীর বিশ্বপ্রেমের আবেগে অজয়ের হতাশা—রাণীর প্রবেশে উভয়ের প্রেমালাপে বাধা—রাণীর আদেশে মানসীর প্রস্থান—অজয়ের উপর রাণীর নিষেধাজ্ঞা—অজয়ের প্রস্থান। রাণার প্রবেশ—মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা বলতে রাণীকে নির্দেশ—রাণীর প্রস্থান। এই পর্য্যন্ত মানসীর ব্যাপার অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ঘটনা।

শেষাংশে আধিকারিক বৃত্তের কার্য :—রাণার মায়াবাদী ভাবুকতা দিয়ে সূচনা—গোবিন্দসিংহের প্রবেশ ও নতুন আক্রমণের সংবাদ জ্ঞাপন। রাণার হতাশা ও দৈন্য—সত্যবতীর রাণার যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা—রাণাকে মৃত্যুপণে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য প্রেরণা ও আত্মপরিচয় দান—সত্যবতীর আত্মোৎসর্গ দেখে রাণার উদ্দীপনা—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশদান।

* [অজয়ের সঙ্গে এক হয়ে আমরাও মানসী সম্বন্ধে বলতে পারি—"তুমি

এ জগতের নও তুমি শরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। কিন্তু যে মানসী রাত্রিকালে যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষা করতে গিয়েছে, যে মা'র সঙ্গে বিবাহ-ব্যাপারে কথাকাটাকাটি করতে লজ্জিত হয়নি, সে রাণীর আদেশ পাওয়ামাত্রই বিনা কথায় প্রস্থান করবে—একটু অপ্রত্যাশিতই বটে, মানসীকে নিয়ে শুধু অজয়ই ভাবে গদগদ হয়নি, রাণা অমরসিংহও বেশ বড়াবাড়ি করে ফেলেছেন "ও কোথা থেকে এসেছে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না" "স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে মর্ত্তে নেমে এসেছে"—"অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হতাশ প্রকাশ" করবারই মতো কথা। তারপর রাজ-অন্তঃপুরে সত্যবতীর প্রবেশ যদিও বা সমর্থন করা যায়, গোবিন্দসিংহের প্রবেশ সম্বন্ধে আপত্তি না উঠে পারে না। গেবিন্দসিংহ যত বৃদ্ধই হোন আর যত একপরিবারভুক্তই হোন, রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচনা করতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন না।]

তৃতীয় দৃশ্য—মেবারে সায়েদ আবদুল্লার শিবির। আবদুল্লা, হুসেন ও হেদায়েতের লঘু কথোপকথন। রাজপুতরা আক্রমণ করেছে—এই সংবাদটুকু দিয়েই দৃশ্যটি শেষ এবং ঐ সংবাদটুকুর ক্ষীণ সূত্রে দৃশ্যটি নাটকের মূল কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

চতুর্থ দৃশ্য—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর। সগরসিংহের প্রতিক্রিয়া অন্তর্বিক্ষোভ—আত্মধিক্কার। উন্মত্ত মস্তিষ্কের যবনিকার উপরে ভীমসিংহ জয়মল প্রতাপ-সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দর্শন—চিতোরদুর্গ পরিত্যাগের সংকল্প। (পরিস্থিতির গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে সগরসিংহের রসিকতাবাতিকে ব্যাহত হয়েছে।)

পঞ্চম দৃশ্য—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। মানসী ও কল্যাণীর কথোপকথনে প্রকাশ—মানসী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন ক'রে পরকে সুখী করে প্রকৃত সুখ পেতে চেষ্টা করেছে—অজয়কে সে ভালবাসে—অজয়কে বড়ই দেখতে ইচ্ছে করে।

এই দৃশ্যেই, আগ্রাবাসিনী এক ছবি ওয়ালাকে প্রবেশ করিয়ে মহাবৎ খাঁর

ছবির সাহায্যে কল্যাণীর প্রেমাগ্নিতে ইন্ধন যোগানোর আযোজন করা হয়েছে এবং মানসীর মুখে ধর্মতত্ত্ব-আলোচনার ও প্রেমতত্ত্ব প্রচারের সুযোগ করে নেওয়া হয়েছে। মানসী বলেছে—"যেনন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম সেই এক ধর্মের সন্তান"—আর "প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই। প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না।" শুধু বলেই মানসী ক্ষান্ত হয় নি—প্রেমতত্ত্বমূলক একটি গানও করেছে।

গানের শেষে প্রবেশ করেছেন—রাণী। সাধারণ নারীর মতোই তিনি কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করতে চান। কিন্তু মানসী পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করে রাখতে অনিচ্ছুক; তার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়। মানসীর কথা শুনে রাণীর ঠিকই মনে হয়—মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল না কি? মানসীর আচরণ নিয়ে রাণা ও রাণীর মধ্যে আলোচনা চলে, রাণী মন্তব্য করতে বাধ্য হন—'মানসীর এ ক্ষেপামি পৈত্রিক।'

ষষ্ঠদৃশ্য—গোবিন্দ সিংহের গৃহের অন্তঃপুর। দৃশ্যটির মুখ্য উদ্দেশ্য—কল্যাণীকে 'স্বামীর জন্য মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বামীর জন্য—পিতার সঙ্গে কল্যাণীর বিরোধ, পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে পতি-সন্দর্শনে যাত্রা। আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে এর যোগ অতি সামান্যই। ঘটনার মাঝখানে—গোবিন্দসিংহ-অজয়সিংহের কথোপকথনের সাহায্যে মুলঘটনার অগ্রগতি ঘটানো হয়েছে—অর্থাৎ সংবাদ দেওয়া হয়েছে ঃ—মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে, সেনাপতি সাহাজাদা পরভেজ, সৈন্য—প্রায় লক্ষ। বাকী সমস্তটাই কল্যণীর পতিপ্রেমের উচ্ছ্বাসে ভর্তি। এখানে মানসীর দীক্ষার ফল ফলেছে। কল্যাণী ও অজয় প্রেমের পূজারী হয়ে উঠেছে। কল্যাণীর কাছে—"যার পতিভক্তি সর্ব্বকালে সর্ব্ব-অবস্থায় বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ—সেই সাধ্বী স্ত্রী।" কল্যাণীর দৃপ্ত ঘোষণা—"আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি

না, ধর্ম বুঝি না আমার ধর্ম পতি',............মহাবৎ খাঁ। হিন্দু হোন মুসলমান হোন নাস্তিক হোন, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তাঁর সঙ্গে এর জন্য যদি নরকে যেতে হয় তাই আমি যেতে প্রস্তুত।" অজয়ও কল্যাণীর আবেগ সমর্থন করে—তার কাছেও—যেখানে প্রেমের পুণ্যলোক সেইখানেই স্বর্গ। কিন্তু গোবিন্দসিংহের কাছে একমাত্র ধর্ম—দেশ। যে অন্তরে দেশের শত্রু তাঁর গৃহে তাঁর স্থান নেই। কল্যাণীকে তিনি বহিষ্কৃত করেন। অজয় স্বেচ্ছায় ভগিনীর জন্য গৃহত্যাগ করে তার সঙ্গী হয়।

[এই বহিষ্কার-ব্যাপারটিকে নাট্যকার পরবর্তী দৃশ্যে আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কল্যাণীকে বিতাড়িত করা হয়েছে—এই সংবাদ শুনে মহাবৎ গোবিন্দসিংহের মুসলমানবিদ্বেষ চূর্ণ করতে—মেবার ধ্বংস করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।]

সপ্তম দৃশ্য—চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য। প্রথমাংশে সগরসিংহ-অরুণ সিংহের কথোপকথন—অরুণের অতীতস্মৃতিসম্ভোগ প্রবণতা দেখে সগরসিংহ আতঙ্কিত—অরুণ যত বড় হচ্ছে তত মায়ের আকার ধারণ করছে। অরুণকে তিনি আগ্রায় নিয়ে যেতে চান কিন্তু অরুণ চিতোর ছেড়ে যাবে না। কারণ তার কাছে—মোগলের পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে দীনা জননীর কোলে বসে শাকান্ন খাওয়া ভাল।..................পরের দত্ত স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়েও নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটাও মিষ্টি।" শেষাংশে সত্যবতীর প্রবেশ। অরুণের কথা শুনে সত্যবতীর আনন্দ, পুত্রকে কোলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ—পিতাকে তীব্রতম ভর্ৎসনা—ভর্ৎসনার ফলে সগরসিংহের চৈতন্যোদয়—মা'কে চিনতে পারা—দেশের সঙ্গে দুঃখ দারিদ্র্য অনশন বেছে নেওয়া—সত্যবতী এক মুহূর্ত্তে পুত্র ও পিতাকে ফিরে পেয়ে মহা আনন্দিত।

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য—উদয়পুরের সভাগৃহ। পরভেজের পরাজয়ে সামন্তদের উল্লাস। সভাকবি কিশোর দাসের 'বিজয়গীতি'। রাণার নৈরাশ্য

জনিত "হিউমার"—সত্যবতীর প্রবেশ—দেশপ্রেমের ভাবাবেশে সে মুখর। তবে রাণার 'নিরানন্দ চাউনি' 'নিরস আনন' তার দৃষ্টি এড়ায় না—মেবারের গৌরবময় দিনে রাণাকে প্রাণ থেকে নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু রাণা মেবারের গৌরবময় দিনটিকে, যারা গৌরব করছে তাদের গৌরবময় দিন বলে মেনে নিতে পারছেন না—যারা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তাদের তিনি ভুলতে পারছেন না। স্পষ্টভাষায় সত্যবতীকে বলেছেন—"প্রকৃত যুদ্ধজয় তারা করে না সত্যবতী যারা নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে যুদ্ধ হতে ফেরে, আসল যুদ্ধ জয় করে তারা—যারা সেই যুদ্ধে মরে।"

রাণার এই যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব বা বিষাদ খুবই অল্পকালস্থায়ী। সত্যবতী শুভ সংবাদ অর্থাৎ রাণা সগরসিংহ রাণার হস্তে চিতোরদুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন এই সংবাদ, দিতেই রাণা উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হয়ে উঠেন এবং আদেশ দেন—"দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—গ্রাম্যপথপার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর। কল্যাণীও অজয়ের সঙ্গে পথে সগরসিংহের আকস্মিকভাবে দেখা ও পরিচয়। (সগরসিংহের মুখেই মহাবৎ খাঁ কল্যাণীর সংবাদ পায়)

তৃতীয় দৃশ্য—যোধপুরের মহারাজ গজাসিংহের কক্ষ। গজাসিংহ ও দূতবেশী অরুণ সিংহের সংলাপের সাহায্যে গজাসিংহের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে। গজসিংহের কাছে যা "বিদ্রোহ" অরুণসিংহের কাছে তাই "স্বাধীনতা রক্ষা করবার চেষ্টা"। অরুণকে এবং অমরকে মুখপাত্র ক'রে নাট্যকার এখানে গজসিংহশ্রেণীর নীচমনা দেশদ্রোহীদের ভর্ৎসনা করেছেন। গজসিংহের পুত্র অমরসিংহও পিতার অন্যায় আচরণের (দূতকে বন্দী করা) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে—এবং অতি অপ্রিয় সত্য

বলে দিয়েছে—"মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সিংহাসনে বসবার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই"। রাজপুত রক্তেরই কথা বটে!

চতুর্থ দৃশ্য :—মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ। মাহাবৎ খাঁ কল্যাণীর ঐকান্তিক প্রেমের প্রত্যাখ্যান ক'রে অনুতপ্ত; কল্যাণীর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইতেও প্রস্তুত। "কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক" গজসিংহ সম্রাটের আমন্ত্রণ জানাতে প্রবেশ করে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বগ্রস্ত মহাবৎ খাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করে———মেবার জন্মের মত পতিত্যাগ করেছেন। আপনি সে ধর্ম ত্যাগ করেছেন, মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থি আপনি মুসলমান হয়ে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন?

বহু যুক্তি দিয়ে গজসিংহ বুঝাতে তথা প্ররোচিত করতে—মহবৎ খাঁর মনটাকে মেবার-বিরোধী করতে, চেষ্টা করে।

সন্ন্যাসী বেশে সগরসিংহ প্রবেশ করেন। মহাবৎ পিতার ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হন। পিতা-পুত্রে দেশ-জাতি-ধর্ম নিয়ে তীব্র কথা কাটাকাটি চলে। প্রসঙ্গত কল্যাণীর কথা উঠে—এবং কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন এই কথা শুনে মহাবৎ সনাতন হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করে এবং হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষ চূর্ণ করবার জন্য, হিন্দুত্ব ধ্বংস করবার জন্য, নতুন করে সঙ্কল্প গ্রহণ করে। (মহাবতের স্মৃতিতে কল্যাণী এতখানি স্থান জুড়ে আছে—না দেখলে কে বুঝবে?)

[এই দৃশ্যে নাট্যকার একদিকে দেশ-জাতি-ধর্মের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরেছেন, বিজাতির-করুণাকণার-ভিখারী-হওয়াকে ধিক্কার দিয়েছেন, হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন; অন্যদিকে হিন্দু সমাজ-বিধানের গোঁড়ামির সংকীর্ণতাকেও অক্রমণ করেছেন। নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য—'মুসলমান ধর্ম আর যাইহোক, তার এই মহত্ত্বটুকু আছে, সে যে- কোন বিধর্মীকে নিজের

বুকে করে আপনার করে নিতে পারে। আর হিন্দুধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী—শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না।" এই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটলে হিন্দুর উন্নতির আশা নেই, হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাবের সম্ভাবনা নেই—জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিরও কোন আশা নেই।]

পঞ্চম দৃশ্য :—জাহাঙ্গীরের সভা।

প্রথমাংশে—পরভেজের পরাজয় সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর ও হেদায়েৎ আলি খাঁর আলাপ-আলোচনা। (সম্রাটের সঙ্গে হেদায়েৎ আলির রসিকতা, বিশেষতঃ সভাগৃহে, অশোভন ও অনুচিত)। দ্বিতীয়াংশে জাহাঙ্গীর-সগর সিংহের বাক-দ্বন্দ্ব—এবং দেশপ্রেমকে স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থাপিত ক'রে সগর সিংহের আত্ম-বলিদান বা প্রায়শ্চিত্ত—ত্যাগের রাজ্যের নাগরিকত্ব লাভ। [সগর সিংহের উপবৃত্ত এখানেই শেষ হ'য়েছে।]

চতুর্থ অঙ্ক :—প্রথম দৃশ্য—উদয়সাগরের তীর—কাল জ্যোৎস্না রাত্রি। দৃশ্যটির বিভাব রোমান্টিক ভাবের বা মায়াবাদী চিন্তারই উপযুক্ত এবং রাণা অমর সিংহের মানসিক অবস্থাও মায়াবাদী চিন্তার উপযুক্ত জন্মভূমি। তাঁর কাছে অর্থাৎ যিনি সংসারকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে পারছেন না, যাঁর মনের গভীরে নৈরাশ্য বাসা বেঁধে আছে—অবশ্যই "সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা" বলেই মনে হবে। সংসার ত্যাগ করবার বাসনা খুবই স্বাভাবিক। মানসী আসতেই, উভয়ের মধ্যে গভীর দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হয়। মায়াবাদীরা সংসারকে যত হেয় দৃষ্টিতে দেখে মানসী "সংসারকে অত খারাপ" ভাবতে পারে না। সংসার তার কাছে "মনোহর মায়া"। বহিঃপ্রকৃতি সুন্দর বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিবর্তন তো সেখানেই থেমে থাকেনি। একদিকে রয়েছে বহিঃ প্রকৃতি, অন্যদিকে আছে "মানুষের চিন্তাজগত"—চিত্তলোক বা মনের জগত। প্রকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি, মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্য আছে। তবে একথাও ঠিক—মানুষের লোভ আছে, ঈর্ষা আছে দ্বেষ আছে মানসিক ব্যাধি আছে। এখানেই মানুষ বড় দুঃখী, বড় দীন। মানসীর আবেদন—

"মানুষ বড় দুঃখী, তার দুঃখ মোচন করতে হবে। সংসার বড় দীন, তাকে টেনে তুলতে হবে।" মানসী প্রস্থান করে বটে কিন্তু রাণার সৌন্দর্যাবেগ বা মোহ কিছুতেই কাটতে চায় না—তাঁর বোধহয়—অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য অনুভব করে। তিনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন—সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে থাকা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখাই বটে। রাণীর অতিবাস্তব সাংসারিক কথার ধাক্কায় তাঁর মোহ ভেঙ্গে যায়—"দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির কর্কশ-ঘর্ঘর শব্দ, ঘটনার নিষ্পেষণ"-এর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। প্রথমাংশে মানসীর বিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কথান্তর হয় এবং আলাপের শেষাংশে, রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে মোড় ঘুরে যায়। দৃশ্যটির সমাপ্তি হয়—অজয়ের বিরহে মানসীর কাতরোক্তিতে ও গানে। (মানসীর উক্তিতে এই কথাই প্রকাশিত হয়েছে—যে মানসীর মধ্যে রক্তমাংসের মানুষও একজন আছে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য :—মেবারে মহাবৎ খাঁর শিবির।

এই দৃশ্যের উদ্দেশ্য—(ক) মহাবৎ খাঁর সেনাপতিত্বেই মেবার অভিযান হয়েছে, এই ঘটনাটি উপস্থাপিত করা। (খ) হিন্দুই হিন্দুর বড় শত্রু—স্বজাতির উপর পীড়ন করে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয় এবং (গ) আসলে "এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে"। পরোক্ষতঃ সমাজ সমালোচনা করা।

তৃতীয় দৃশ্য :—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ। প্রথমাংশে—রাণা ও সত্যবতীর কথোপকথন—মহাবৎ খাঁ ও গজ সিংহ যুদ্ধে এসেছেন শুনে রাণার প্রতিক্রিয়া—অনিবার্য পরিণতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনাকে প্রলাপ দিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। যে মূল কারণে মেবারের পতন, সেই কারণ সক্রিয় হয়েছে—ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই সুরু হয়েছে এখানেই তো আসল যুদ্ধের আরম্ভ। গজ সিংহ না আসলে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে না, সেও এসেছে। রাণার

উক্তির ভিতর দিয়ে জাতীয় দুর্বলতার ক্ষত স্থানটি অনাবৃত করতে চেষ্টা করেছেন (ক) "ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান·········বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না।" (খ) যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষে যায়········· বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।"] দ্বিতীয়াংশে—গোবিন্দ সিংহের সঙ্গে রাণার কথপোকথন—প্রায় একই ধরণের মানসিক প্রতিক্রিয়া। যুদ্ধের জন্ম রাণার দুর্নিবার আগ্রহ—মেবারের জন্য প্রাণ দেওয়ার সঙ্কল্প।

তৃতীয়াংশে—রাণীর সঙ্গে রাণার প্রলাপ-বচন। (রাণীর কোন পরিবর্ত্তন নেই—তার ধারণা "সমস্ত পরিবারটা ক্ষেপে গেল।" এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে রাণীর লঘু আচরণ অনুচিত।) শেষাংশে মানসীর মুখে ধিক্কার বচন উচ্চারিত হয়েছে—"হারে অধম জাত। তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ—আর কে রক্ষা করে।"

চতুর্থ দৃশ্য ঃ—মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ।

(প্রথমাংশে)—সত্যবতী-অরুণ গ্রামবাসীদের ডাকবার জন্য গ্রাম-পরিক্রমায় বেরিয়েছে। (পল্লীর শাসকরা বা সর্দাররা কোথায়?)

(দ্বিতীয়াংশে)—গ্রামবাসীদের অসাড় ঔদাসীন্য—কোনরকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা।

(শেষাংশে)—শত্রুর প্রতিরোধ করতে অজয়-কল্যাণীর গ্রামবাসীদের আহ্বান—গ্রামবাসীদের পলায়ন—যুদ্ধে অজয়ের প্রাণদান। যার আদেশে এই হত্যা, গৃহদাহ, সেই সেনাপতি মহাবৎ খাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সৈনিকদের সঙ্গে কল্যাণীর গমন।

পঞ্চম দৃশ্য ঃ—উদয়পুরের রাজসভা।

মেবারের অগণিত লোকক্ষয় হয়েছে—সৈন্য সংখ্যা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। সামন্তদের কেউ কেউ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন কিন্তু রাণা ও

গোবিন্দ সিংহ অটল। রাণা যেচে মোগলের বন্ধুত্ব নিতে পারেন না ; গোবিন্দ সিংহ প্রাণ দেবেন তবু মান দেবেন না।

ষষ্ঠ দৃশ্য—মহাবৎ খাঁর শিবির।

প্রথমাংশে—মহাবৎ খাঁ-গজসিংহের কথোপকথন। রাণা অমরসিংহের বীরত্বে, রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যে মহাবৎ খাঁ গর্ব অনুভব করছেন ; ধর্ম্মে মুসলমান হলেও জাতিতে তিনি রাজপুত। তিনি সেই রাজপুতদেরই একজন যাদের নির্ভীকতার ও স্বদেশপ্রাণতার কোন তুলনা নেই। এ আবহাওয়ায় গজসিংহের মত পতিত রাজপুতের বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়—সে প্রস্থান করে স্বস্তি পায়।

দ্বিতীয়াংশে—সৈন্য চতুষ্টয়ের সঙ্গে কল্যাণীর প্রবেশ এবং স্বামী-সাক্ষাৎকার। যে সঙ্কল্প ও আদর্শ নিয়ে কল্যাণী পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছিল, সেই আদর্শে অবিচলিত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁর আরাধ্য দেবতার আসনে সে দেখে একজন ঘাতককে, একজন মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিস্বার্থ সর্ব্বস্ব গর্ব্বী মহাবৎ খাঁকে। তার মোহ ভেঙ্গে যায়। অজয়ের মৃত্যু এবং স্বদেশের রক্তের ঢেউ উভয়ের মিলনের মধ্যে সমুদ্র-ব্যবধান সৃষ্টি ক'রেছে।

কল্যাণী 'এক ক্ষেপে স্বামী আর ভাই' দুই হারিয়ে ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়—এবং 'নির্মম দেশদ্রোহী রক্তপিপাসু জল্লাদ'—'নীচ হিংস্র ভ্রাতৃহন্তাদের··· দু'মুঠো উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালদের'—অভিশাপ দিয়ে প্রস্থান করে।

*[কল্যাণীর আচরণের সাহায্যে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন—(ক) নির্বিচার আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ দোষগুণ বিচার নিরপেক্ষ ভালবাসা কথার কথা (খ) ধর্ম্মত্যাগ করলেই ব্যক্তি পতিত হয় না ; প্রকৃত পাতিত্য ঘটে তখনই যখন ব্যক্তি হৃদয় হারিয়ে ফেলে—ব্যক্তিগত অভিমান চরিতার্থ করবার জন্য, মনুষ্যত্বকে বলি দেয়—অন্যায় নিষ্ঠুর কাজ করতে দ্বিধা ক'রে না। আসল পাতিত্য চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের হীনতা। কল্যাণী স্বামীর সঙ্গে

নরকে যেতে প্রস্তুত থেকেও, মহাবতের সঙ্গে মিলতে পারেনি এই কারণেই—মহাবৎ খাঁর পাতিত্যই মিলনের আসল বাধা।]

পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর

(ক) মানসী একাকী, গান গেয়ে মনের খেদ প্রকাশ করছে—'কত ভালবাসি তার—বলা হোলো না।'

(খ) উদভ্রান্ত রাণার প্রবেশ। রাণার মূর্তি ও প্রলাপের সাহায্যে মেবারের পতন ও তার শোচনা ব্যক্ত করা হয়েছে। সমগ্র মেবারের আর্তনাদ অমর সিংহের প্রলাপোক্তি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

*[উদভ্রান্ত উক্তির ভিতর দিয়ে যুদ্ধের রূপ, তার ভীষণতা পরাজয়ের আর্তনাদ, মেবারের শোচনীয় অবস্থা অতিদক্ষতার সঙ্গে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ণনাকে প্রত্যক্ষের স্থলাভিষিক্ত করতে পারা অবশ্যই শক্তিমত্তার নিদর্শন। তবে, রাণার আচরণে দু' একস্থলে বেশ বাড়াবাড়ি আছে। আর রাণীর আচরণ—যদিও সামান্য—দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ।]

পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য :—মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ। দুইজন পরিচারিকার কথোপকথনের সাহায্যে, অজয়ের মৃতদেহ গোবিন্দ সিংহের বাড়ীতে আনা হয়েছে—এই তথ্যটি জানানো হয়েছে এবং মানসীর আক্ষেপোক্তির তথা স্বীকারোক্তির সাহায্যে দেখানো হয়েছে—মানসী মুখ ফুটে না বললেও, অজয়কে সে ভালবেসেছে। দৃশ্যটিকে তৃতীয় দৃশ্যের প্রস্তুতি বলা চলে।

তৃতীয় দৃশ্য :—গোবিন্দ সিংহের গৃহাঙ্গন। অজয়ের মৃত্যুতে গোবিন্দ সিংহের শোক—সত্যবতীর সান্ত্বনা প্রদান, কল্যাণীর আগমনে গোবিন্দ সিংহের প্রতিক্রিয়া, কল্যাণীর আত্মধিকার, গোবিন্দ সিংহের অনুতাপ, মাতৃহীনা অভাগিনী কন্যাকে বক্ষে গ্রহণ। শেষাংশে—আলুলায়িত কেশা স্রস্তবসনা মানসীর প্রবেশ, অজয়কে স্বামী ব'লে সম্বোধন, সকলের সম্মুখে ঘোষণা—

"অজয় সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারেনি—আমি নিজে জান্তে পারিনি।" মানসীর শোক প্রকাশ, কল্যাণীর মূর্চ্ছা। গোবিন্দ সিংহের শোকের মাত্রা পূর্ণ। পুত্র, কন্যা, মেবার সব হারিয়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য :—মেবারের পর্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। গজ সিংহ ও মহাবৎ খাঁর কথোপকথনে গজ সিংহের নীচতা এবং মহাবতের রাজপুত অভিমান এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মধ্বজীদের উপর আক্রোশ ব্যক্ত হয়েছে।

মহাবৎ খাঁ জানিয়েছেন—"আমি মোগল সৈন্য নিয়ে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ করতে চাই না।" এখানেই গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ। গোবিন্দ সিংহ মহাবৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। তাঁকে বধ না করা পর্যন্ত উদয়পুর দুর্গে তিনি মোগলকে প্রবেশ করতে দেবেন না, তিনি মরতে চান। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা—"আমার স্বাধীন মোগলকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে আমি মরতে চাই। রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখবার আগে আমি মরতে চাই……" মহাবৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করলে, গজসিংহ এসে গোবিন্দ সিংহে গুলি করল। মেবারের শেষ প্রতিরোধ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। [গোবিন্দ সিংহের উপধারার এখানে উপসংহার হল।]

পঞ্চম দৃশ্য :—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ। দুর্গরক্ষক রাজপুত সৈনিক ও পুরবাসীর কথোপকথনের সাহায্যে—'সাহাজাদা খুরম্ এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদূত সাহাজাদার কাছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগল দূত ফিরে গেলে রাণা—আজ প্রত্যূষে উঠে ঘোড়ায় চড়ে সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন।" —এই সংবাদটুকু জ্ঞাপন করা হয়েছে। শেষাংশে রাণা অমরসিংহ মোগল কুকুর গজসিংহকে পদাঘাত করে অতিথি সৎকার করেছেন।

ষষ্ঠ দৃশ্যঃ—মেবারে গিরিপথ। সত্যবতী ও তাঁহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ। পতিত মেবারের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে মাতৃভুমির জন্য গানের ভিতর দিয়ে আর্তনাদ করছে। হেদায়েৎ বিদ্রোহের গান গাইতে দেবে না সত্যবতী ও অরুণ 'আইন অমান্য' করে গান গায়। হেদায়েৎ সত্যবতীকে বন্দী করতে গেলে অরুণ বাধা দেয়। সৈন্তরা অরুণকে আক্রমণ করে, অরুণ বীরের মত যুদ্ধ করে। এমন সময় প্রবেশ করেন মহাবৎ। ভাই-বোনের মধ্যে নানা অভিমানের দ্বন্দ্ব চলে—মহাবৎ স্বীকার করেন—তিনি পাপ করেছেন—নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছেন এবং পৈশাচিক উল্লাসে তার ধুমরাশি দেখছেন। তবে মুসলমান হওয়া—বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম গ্রহণ করা—কোন পাপ কাজ এ কথা মহাবৎ স্বীকার করেন না। আর ধর্মান্তর গ্রহণ যদি পাপও হয় মহাবৎ জিজ্ঞাসা করেন—" সে পাপ কি এত ভয়ানক যে সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে ?...আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর যে এই নারীর হৃদয়কেও পাষাণ করে দিতে পারে ? সমাজসম্পর্কের উপরে হৃদয়-সম্পর্ক জয়ী হয়। সত্যবতী মহাবৎকে—ছোট ভাই মহীপৎকে—ভাই বলে গ্রহণ করেন।

কিন্তু হেদায়েৎ 'আইন-অমান্য কারিণা'কে বন্দী করতে উদ্যত। মহাবৎ বাধা দিলে হেদায়েৎ মহাবৎকে সেনাপতি বলে স্বীকারই করে না। সাজাহান এসে হেদায়েৎকে শান্ত করেন—বুঝিয়ে দেন গানটি বিদ্রোহের গান নয়, গানটি "হতাশাময় গভীর দুঃখের গান"। অস্বাভাবিক উদারতাবশে সাজাহান ঘোষণা করেন—মোগলসম্রাট কখন কোন সঙ্গত ন্যায়োচিত ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় বাধা দিবে না। তার জন্ম যদি তার এ সাম্রাজ্য দিতে হয়—দিবে।' শুধু এইটুকু বলেই সাজাহান ক্ষান্ত হন না। তিনি নিজে গানে যোগ দেন এবং হেদায়েৎকে পর্যন্ত যোগ দিতে আদেশ করেন।

[সত্যবতীর মুখে—"মোগরের জয় হোক...মোগলের সঙ্গে আর আমাদের

৬

বিবাদ নাই…"এই সংলাপ দেওয়া ঠিক হয়নি। সত্যবতী 'আইন অমান্য করে জেলে যাবে, কিন্তু প্রাণ থাকতে ও কথা বলবে না। হেদায়েৎ আলিকে "রাজপুরুষ" বলে বেশ চেনা যায় বটে কিন্তু সাহাজাদের মতিগতি এক কথায় "অদ্ভুত"। 'মোগল' সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত— হ'লেও, সাজাহান ভারতবর্ষের সন্তানদের মায়ের নাম গাইতে উৎসাহিত করবেন এবং চারণীদের সঙ্গে গানে যোগ দেবেন—রোমাঞ্চকর কল্পনাই বটে। মায়ের নাম গানে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই করুন আর মুসলমান সাজাহানকে উদার প্রতিপন্ন করার জন্য তথা মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই করুন, এই কল্পনা আপত্তিকর মাত্রায় অনুচিত। [আর একটা কথাও বক্তব্য—হিন্দু-মুসলমান সমস্যার যত সহজ সমাধান এখানে করা হয়েছে, সমাধান তত সহজ নয়। জাতি-পরিচয়ে ও সমাজ-সম্পর্কে ধর্মের যে প্রভাব বা প্রতিপত্তি রয়েছে তা' মুখের কথায় বা নিছক ভাবাবেগে তিরোহিত হতে পারে না।

জাতিধর্ম নিরপেক্ষ হৃদয়ধর্মের প্রশস্তি যতই করা হোক, ধর্মনিরপেক্ষ জাতি তৈরি করতে হলে ধর্মবিধি থেকে সমাজবিধিকে পৃথক করে যেরূপ বিধি-ব্যবস্থা আবশ্যক তা' প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের সমবায়ে জাতি বা সমাজগঠনের সঙ্কল্প দিবা স্বপ্নের স্তরেই থেকে যাবে।* এখনও রাষ্ট্রনায়করা রোমান্টিক সমাধানের অধিক কিছু করতে পারেননি।]

সপ্তম দৃশ্য :—উদয় সাগরের তীর। মানসী দেখতে পেয়েছে—জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে কর্তব্যপথ বহুদূরে প্রসারিত। দুঃখকে সে বশীভূত করেছে—দুঃখকে বিপরিণত করে মনুষ্য-কল্যাণের আবেগে রূপান্তরিত করেছে। কল্যাণীকেও দুঃখকে কল্যণব্রতে উর্ধ্বায়িত করে সুখী হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

সত্যবতী প্রবেশ ক'রে ঘটনাকে মূল কার্যধারায় ফিরিয়ে এনেছে। মানসী ও সত্যবতীর সংলাপে জানানো হয়েছে—সাহাজাদা চান যে রাণা দুর্গের

বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেন এবং প্রতাপসিংহের পুত্রের পক্ষে তা মৃত্যুর অধিক। তাই রাণা পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন। রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন। সত্যবতী বলে—'আজ মেবারের পতন হল মানসী।' মানসী বলে—পতন বহুদিন পূর্বে হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র। মানসী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়—কবে এবং কেন পতন হয়েছে। *[এখানেই মানসীকে মুখপাত্র করে নাট্যকার প্রাণভরে নিজের কথা বলে নিয়েছেন। নাট্যকারের মতে জাতির পতন আরম্ভ হয় সেদিন "থেকেই যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে, যেদিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে।" জাতির জীবন স্রোত বন্ধ হ'য়ে গেলেই বদ্ধ জলার মতো জাতির দেহেও নীচ স্বার্থ ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃবিরোধ, বিজাতি বিদ্বেষ জন্মে। ধর্ম হারিয়ে কোন জাতি বড় হ'তে পারে না। নৈতিক বল যার নেই তার পতন হবেই। ধর্মকে জীবনের ধ্রুবতারা না করলে জাতির মুক্তি কোনকালেই হবে না। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক। এ জাতি আচার মানুষ হবে—"যেদিন তারা এই অথর্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে, যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে, যেদিন তারা যা উচিত কর্তব্য বিবেচনা কার্যে নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দেবে এবং ধর্মকে বরণ কর্বে। সেই নবধর্ম ভালবাসা—আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তারপরে আর—তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না। *জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়—জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে॥

অষ্টম দৃশ্য—উদয়সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। (মেবার-পতনের শোক প্রকাশের উপযুক্ত বিভাব)। রাণা অমর সিংহ আর্তনাদ করছেন—"আমার হাতে আমার মেবার, রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হল" ওঃ। এমন সময় প্রবেশ করেন—মহাবৎ খাঁ। কারণ রাণা একবার তাঁর সাক্ষাৎ চেয়েছেন। চেয়েছেন এই কথাই বলতে—"তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয়নি তার সঙ্গে মেবারের রাণাকেও শেষ কর।" মহাবৎ অস্বীকার করলে রাণা তাঁকে 'ভীরু…ম্লেচ্ছ…কুলাঙ্গার ব'লে ভৎসনা তথা যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করেন। উত্তেজিত মহাবৎ অগত্যা তরবারি নিষ্কাসিত করেন।

এই উদ্যত তরবারির সামনে এসে দাঁড়ান মানসী। তার মুখে এক কথা—শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা আবার মানুষ হওয়া। উভয়েই মানসীর বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনে শান্ত হন। চারণীদের গানে উভয়ের চোখ খুলে যায়। একে অন্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' হন। এখানেই বৃত্তের উপসংহার—রীতিমত রোমান্টিক উপসংহার।

এই বৃত্ত-পরিকল্পনা, সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে—বৃত্তটি রোমান্সধর্মী অর্থাৎ বহু লোকের বহু কাজকে বৃত্তে দৃশ্য করবার চেষ্টা করা হয়েছে; ফলে এক একটি অঙ্কে পাঁচ সাতটি কোন কোনটিতে আটটি দৃশ্য যোজনা ক'রতে হয়েছে। সুতরাং বৃত্তে নাটকীয় সংহতির স্থলে উপন্যাসের বিস্তৃতি দেখা দিয়েছে এবং ঘটনার অগ্রসরণে (progression) উপন্যাসের slow বা gradual development'—প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বৃত্ত-রচনা যেহেতু ঘটনাবলীর বিন্যাস, বৃত্ত-বিচারে অবশ্যই ঘটনা-বিন্যাসের দোষ-গুণের কথা বলা দরকার। দৃশ্য-কল্পনার বিবরণ দিতে গিয়ে আমি ঘটনাবিন্যাসের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং অনুচিত ঘটনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

অঙ্গী-রসবিচার ও জাতি-বিচার

বৃত্ত-পরিকল্পনার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি তত্ত্বগত একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি এবং সেই প্রশ্নটি এই—নাটকে যে বৃত্ত রচনা করা হয়েছে তা'তে প্রতিপাদ্য (premise) অতিরিক্ত কিছু ব্যক্ত হয়েছে কিনা—মূল প্রতিপাদ্য থেকে দৃষ্টি সরে গেছে কি না এবং তার ফলে নাটকের রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে কি না? এই প্রশ্নটির আংশিক উত্তর সেখানেই দিয়েছি; এখানে আলোচনা করছি—রসনিষ্পত্তি ব্যাহত হয়েছে কি না? নাট্যকার ট্র্যাজেডি লিখতে কমেডি লিখে ফেলেছেন কি না অথবা নাটকখানি মেলোড্রামা শ্রেণীর হেয় নাটকে পরিণত হয়েছে কি না?

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে প্রত্যেক বড় সৃষ্টির মধ্যেই বড় 'ভাব' (idea) প্রতিপাদ্য হিসাবে থাকে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য যে শুধু 'ভাব' (concept or idea) থাকলেই বড় রস-সাহিত্য হয় না; ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য যে রূপকল্পনা করা হয় তাকে রসাত্মক করে তুলতে হয় এবং তবেই তা' রসরূপে পরিণত হয়। রূপকে রসাত্মক ক'রে তোলার অর্থ—রূপকে ভাবের (আবেগের) বাহনে পরিণত করা—অর্থাৎ রূপের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ 'ভাব'কে এবং নানা ভাবের ভিতর থেকে একটি বিশেষ ভাবকে প্রধান ও স্থায়ী ক'রে তুলতে পারা। এই স্থায়ীভাবের ভিত্তিতেই রচনাকে নানা রসে ভাগ করা হয়ে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ,—রৌদ্র-বীর-ভয়ানক বীভৎস-অদ্ভুত ইত্যাদি রসের নির্ধারণ ভাবের ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রে ভাব-সংবেদনার (sensations) ভিত্তিতে যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে তা'র এক মেরুতে রয়েছে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি অর্থাৎ তীব্র বেদনাত্মক পরিণামের 'রচনা', অন্য মেরুতে আছে—লঘু বা স্থূল কমেডি বা 'প্রহসন'। পরিভাষার কচকচি বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি-কমেডি শ্রেণী বিভাগের ধারণা করতে গেলে, বেদনা বা আনন্দ সংবেদনার ভিত্তিতেই করতে

হবে। সেই ভাবে করাও হয়েছে। যে রচনার ঘটনা বেদনাজনক অর্থাৎ যা' 'arousing pity and fear' তাই ট্র্যাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত, আর যার ঘটনা আনন্দজনক বা হাস্যজনক তাই কমেডি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানেই প্রশ্ন উঠে থাকে—বেদনা-পরিণাম রচনামাত্রকেই আমরা 'ট্র্যাজেডি' পদবাচ্য করতে পারি কি না? বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নের পরিপাটি বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ এখানে নেই, তবু অতি সংক্ষেপে এবং সিদ্ধান্তের আকারে বলে নেওয়া দরকার—"প্যাথেটিক' ও 'ট্র্যাজিকে'র মধ্যে সীমারেখা টানার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে সীমারেখা সুস্পষ্ট বা অবিসংবাদিত হয়নি। গ্রীক ট্র্যাজেডি থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত যত ট্র্যাজেডি লেখা হয়েছে, তাদের বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এই বিষয়টি স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হবে যে, প্রত্যেক ট্র্যাজেডি লেখক তার নায়কের জন্য 'pity' জাগানোর এবং নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় যে "unmerited suffering"—এই ধারণা জাগানোর চেষ্টা করেছেন। যে বিশেষ বিশেষ বোধের সঙ্গে যুক্ত থেকে বেদনা 'ট্র্যাজেডি পদবাচ্য হয়, সেই বোধের সম্পূর্ণ তালিকা এখনও তৈরি হয়নি বটে, কিন্তু যা' হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে ট্র্যাজেডি মূলতঃ শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের ও তীব্র বেদনার দৃশ্য—এক কথায়, করুণ রসাত্মক রচনা। অবশ্য করুণরসাত্মক একটি আক্ষেপ বা বিলাপকে ট্র্যাজেডি বলতে হবে, এ কথা বলছিনে কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয় ও দুর্নিবার শক্তির প্রভাবে অথবা পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে গিয়ে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের জীবন শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের আবর্তে তলিয়ে যায় এবং সেই বিপর্যয় আমাদের মনে শোচনার উদ্রেক করে সেখানে আমাদের মধ্যে ট্র্যাজেডি-বোধই জাগে। করুণ রসাত্মক মাত্রই ট্র্যাজেডি—এ সিদ্ধান্ত যদিও বা না করা যায়, ট্র্যাজেডি মাত্রই যে করুণ রসাত্মক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেবার-পতন নাটকের অঙ্গীরস বা জাতি

বিচার করতে চেষ্টা করা যাক। নাটকখানি সার্থক ট্র্যাজেডি হয়েছে কি হয়নি বা মেলোড্রামা হয়েছে কি না, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে, চেষ্টা না করেও, যে কথাটা আপাতদৃষ্টিতে এবং নাটকের নাম দেখেই বলা যায় সে এই যে নাটকখানি লঘু আমোদ প্রমোদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি—ট্র্যাজেডির ছাঁচে ঘটনার বিন্যাস করা হয়েছে—মেবার-পতনের মতো একটি বেদনাদায়ক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এবার আপাতদৃষ্টির স্তর অতিক্রম করে—নাটকের স্থায়িভাব (dominaut impression) বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, ট্র্যাজেডির ছাঁচে ঘটনা ঢালাই করলেও নাট্যকার ট্র্যাজেডি-সংবেদনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন কি না অর্থাৎ ট্রাজেডি সংবেদনার জন্য যে ধরণের বোধ ও যে পরিমাণ বেদনা জাগা দরকার তা' এখানে জেগেছে কি না, অন্যকোন আগন্তুক বিরোধী ভাব এসে রসনায় বাধা সৃষ্টি করেছে কি না! প্রথমতঃ বোধের কথাই বলা যাক। মেবার-পতন নাটকের ঘটনা যে শোচনীয় এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা এ কথা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রশ্ন—কার ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘটনা? অমরসিংহের? না মেবারের? নাট্যকারের উত্তর যদি নামকরণের মধ্যেই নিহিত থেকে থাকে তবে তিনি বলতে চান—মেবারের পতন বা ভাগ্য-বিপর্যয়ের ঘটনা। অর্থাৎ শৌর্য-বীর্য-স্বাধীনতার বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী যে মেবার, সেই মেবারের ভাগ্য বিপর্যয় উপস্থাপনা করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু মেবার তো একটি দেশ বা জাতির সংকেতমাত্র। দেশ বা জাতির ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় দেশবাসীরই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে। যেহেতু ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিই দেশের প্রতিনিধি কোন দেশের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে তার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টিরই ভাগ্য বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে। অমরসিংহের পরাজয়ই মেবারের শোচনীয় পতনের নিমিত্ত কারণ। অমরসিংহ তাই নিমিত্তমাত্র। তাঁর পতন বা পরাজয় আমাদের কাছে ট্র্যাজিক সংবেদনা জাগায় এই কারণেই যে

তার পরাজয়েই অপরাজেয় মেবার পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছে—তার হাতে রাণা প্রতাপের মেবার মোগলের দাসত্ব স্বীকার করেছে—তার চিরোন্নত শির অবনত ক'রেছে। সুতরাং অমর সিংহের নায়কোচিত যোগ্যতা আছে কি নেই এ প্রশ্নের বিচারের চেয়েও বড় কাজ, মেবারের পতনে অমর সিংহের ভূমিকা কি, অমর সিংহের ট্র্যাজেডি অথবা মেবারের ট্র্যাজেডি দেখানো নাট্যকারের উদ্দেশ্য এই সব প্রশ্ন সম্যকভাবে বিচার ক'রে দেখা। আমি মনে করি—এই নাটকে মেবার একটি জীবন্ত ব্যক্তি-সত্তায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যক্তির আসন কীর্তি-খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত। সে অপরাজেয় ও চিরস্বাধীন। শৌর্যে-বীর্যে সে অতুলনীয়। বহু রাণার জলন্ত দেশপ্রীতি দিয়ে—বিশেষতঃ রাণা প্রতাপের প্রতাপ ও বীর্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে। সকলের শির যেখানে অবনত, তার শির সেখানে উন্নত। এ হেন মেবারকে দুর্নিবার শক্তি নিয়ে মোগল-সম্রাট পরিবেষ্টন করেছে তার স্বাধীন ও উন্নত শিরকে অবনত করবার জন্য। আক্রমণকারী মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে মেবার ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত ও হীনবল। বড় দুর্বলতা তার অন্তর্বিরোধ—মোগলপদানত রাজপুতদের এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণকারী মেবারীদের চক্রান্ত ও ঈর্ষা। অমরসিংহ যেন মেবারের যুদ্ধক্লান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় সত্তারই প্রতিনিধি। এই সত্তাটিতে সঙ্কল্পের শৈথিল্য পরিস্ফুট। অন্যপক্ষে গোবিন্দ সিংহ মেবারের অটুট সঙ্কল্পের প্রতিনিধি। সংকট মুহূর্তে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বে মেবারেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্ত হয়েছে এবং গোবিন্দ সিংহের জয়ে মেবারের স্বাধীনতচেতা অপরাজেয় সত্তারই জয় হয়েছে। কিন্তু অমরসিংহ—গোবিন্দসিংহকে এক কথায় মেবারকে, আসল সংগ্রাম করতে হয়েছে—বাইরে মোগলের বিরুদ্ধে এবং ভিতরে স্বজাতিদ্রোহী রাজপুতদের সঙ্গে। এই দ্বন্দ্বই মেবারের প্রকৃত অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেই মেবার হীনবল হ'য়েছে বেশী। মেবারের ব্যক্তিত্বই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সগর সিংহ

মহাবৎ খাঁ, গজ সিংহ মেবারের জাতি-দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুশিবিরে যোগ দিয়েছে। ভিতরকার এই দুর্বলতা নিয়ে শুধু দেশপ্রীতি সম্বল ক'রে তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে মেবার বাইরের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে—তার স্বাধীনতা ও অপরাজেয়ত্বের খ্যাতি রক্ষা করবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু শোচনার ব্যাপার এই যে মেবারকে তার চিরোন্নতশির মোগলের কাছে অবনত করতে হয়েছে—বহুবীরত্বের-ঐতিহ্যে-মণ্ডিত রক্ত পতাকাকে তার দুর্গচুড়া থেকে নামিয়ে নিতে হয়েছে—মেবার সৌভাগ্যের শিখরদেশ থেকে দুর্ভাগ্যের গভীর গহ্বরে পতিত হয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে—মেবার-পতন কোন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি নয়, স্বাধীনতাসর্বস্ব একটা জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের ট্র্যাজেডি—যে জাতি সব কিছুর উর্ধ্বে দেশের স্বাধীনতাকে স্থান দিয়েছে, কোনরূপ সুখ ঐশ্বর্যের বিনিময়ে এবং শত বিপাকেও স্বাধীনতা বিক্রয় করেনি, প্রাণের চেয়ে মানকে যে জাতি বড় বলে মেনে এসেছে, তেমন একটি জাতির স্বাধীনতা হারানোর ট্র্যাজেডি।

এই নাটকের সার্বজনীন আবেদনের কেন্দ্র এখানেই। যে পরিমাণে মেবার চিরোন্নতশির স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতীক হ'য়ে উঠেছে, সেই পরিমাণেই মেবার-পতনের বেদনা সর্বকালের ও সর্বজনের চিত্তকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে। একটা স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হারানোর আর্তনাদ ও অন্তর্দাহের মধ্যে "terrible suffering" রূপ যে পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে, সেই পরিমাণেই নাটকের আবেদন সার্বজনীন হয়েছে।

অমরসিংহ এই বিরাট অতীত ঐতিহ্য সম্পন্ন মেবারের রাণা বা অধিনায়ক। তাঁর আচরণেই মেবারের আচরণ—তাঁর দ্বিধায় মেবারের দ্বিধা, তাঁর সঙ্কল্পে মেবারের সঙ্কল্প; তাঁর জয়ে মেবারের জয় এবং তাঁর পরাজয়েই মেবারের পরাজয়। অমরসিংহ মেবারের প্রতিভূ এবং তাতেই নাটকে তার ঔপচারিক নায়কত্ব। অমরসিংহের ট্র্যাজেডি এই যে তাঁকেই মেবার-পতনের নিমিত্ত

হ'তে হয়েছে।—তার হাতেই মেবারের—প্রতাপের মেবারের—পতন ঘটেছে। তাঁর দুর্ভাগ্য—তাঁর শাসনাধিকারেই জাতীয় জীবনের তেমন এক মহাসংকট দেখা দিয়েছে যা'তে জাতির বহুকালসঞ্চিত কীর্তি ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে নিয়তির মতো এক অনিবার্য পরিণতির বিরুদ্ধে নিঃসহায় তথা নিষ্ফল সংগ্রাম ক'রে ধনে-প্রাণে-মানে নিঃস্ব হ'তে হয়েছে। মরণের অধিক যে পরাধীনতা সেই পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে।

অমরসিংহ যে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা' মোগল-সাম্রাজ্যের বিরাট ও সংহত সামরিক শক্তি। এই শক্তি একদিকে পুষ্ট হয়েছে সমগ্র সাম্রাজ্যের ধনবল ও জনবল দ্বারা, অন্যদিকে পুষ্ট হয়েছে মোগলপদানত রাজপুতদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা দ্বারা। সপ্তরথীর ব্যূহের মধ্যে নিঃসহায় অভিমন্যুর নিরুপায় সংগ্রামের মতোই বিরাট মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে অমরসিংহের সংগ্রাম—অনিবার্য নিয়তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামের মতোই শোচনীয়। অমরসিংহের মধ্যে বিলাসপ্রবণতা সংগ্রাম বিমুখতা এবং সন্ধির মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সব মনোবৃত্তি কখনই জয়ী হ'তে পারেনি এবং পারেনি ব'লেই প্রতিবারেই অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্রেরউপযুক্ত বীর্যবত্তারই পরিচয় দিয়েছেন। একাধিকবার মোগলের বিরাট বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং তিনি যে ভীরু বা সমরকাতর নন তার প্রমাণ দিয়েছেন। শৌর্য-বীর্যের নানা প্রমাণ থাকাতেই অমরসিংহের ক্ষণিক দ্বিধা বা যুদ্ধ বিমুখতা তাঁর চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক হ'য়ে উঠেনি। বিনা যুদ্ধে তিনি যদি বশ্যতা স্বীকার করতেন বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতেন তবেই আমরা তাঁকে অযোগ্য বলতে পারতাম। বলতে পারতাম—অমরসিংহের ভীরুতার জন্যই মেবারের পতন ঘটেছে এবং অযোগ্যের ভাগ্যবিপর্যয়ে শোচনা জাগতে পারে না। কিন্তু অমরসিংহকে সেই হিসাবে অযোগ্য বলা চলে না। তাঁর মধ্যে যে দ্বিধা দেখা যায় তা' নিছক কাপুরুষের মৃত্যুভয় নয়, অনিবার্য

সর্ব্বনাশের সম্মুখে নিরুপায় ব্যর্থ প্রয়াসের যে দ্বিধা এ সেই দ্বিধা। এই দ্বিধাকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় বলা যেতে পারে "ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য"। কার্যকালে এই দৌর্বল্য তিনি ত্যাগ করেছেন; বার বার যুদ্ধে গেছেন, মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং একাধিকবার যুদ্ধে জয়লাভও করেছেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি সেখানেই যেখানে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেও মেবারের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে মোগলের অসংখ্য সেনার প্রচণ্ড শক্তিকে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি। তাঁর শৌর্যের অভাবে মেবারের পতন ঘটেনি, মেবারের পতন ঘটেছে এমন কয়েকটি শক্তির চাপে যার বিরুদ্ধে নিস্ফল সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারেননি। মেবার-পতনে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁর বক্ষ থেকে হৃদয়ভেদী আর্তনাদ উঠেছে—"আমার হাতে আমার মেবার, রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল। ওঃ!" মেবারের আকাশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে ভৎ র্সনা করেছে, মেবার পাহাড়ের লজ্জিত মুখ তাকে কশাঘাত করেছে, মেবারের কুলদেবতারা রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে ধিক্কার দিয়েছেন—মৃত দেশমাতার শব স্কন্ধে করে তিনি উন্মত্তের মত হাহাকার করেছেন। বিজয়া মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান ক'রে মৃত্যু বরণ করতে ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন। তাঁর অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ অবশ্যই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মেবারের রাণা জানু পেতে মোগল সম্রাটের ফর্মাণ গ্রহণ করবেন—এ যেমন মেবারের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি রাণা প্রতাপের পুত্র হ'য়ে অমরসিংহ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধির কাছে মস্তক অবনত করবেন, সেও কম মর্মান্তিক ব্যাপার নয়। যদিও অমরসিংহের ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয় এখানে গৌণ, মেবারের পতনই মুখ্য, তবু অমরসিংহের ভাগ্যের সহিত মেবারের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব'লে অমরসিংহের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটা পর্যন্ত মেবারের ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হ'তে পারেনি। মেবার একটি দেশ বা জাতি হিসাবে—বিদেশী

(abstract) অমরসিংহই তার প্রতিনিধি বা শরীরী অভিব্যক্তি। সুতরাং এই নাটকের অশরীরী নায়ক মেবার (spirit of Mewar) বটে, কিন্তু শরীরী নায়ক—অমরসিংহ।

... ...

আগেই বলেছি ট্র্যাজেডির রসাদর্শে নাটকখানি লেখা। এখন প্রশ্ন—আদর্শটি যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি না? বাহ্যতঃ যে রসেরই আদর্শ ফুটে উঠুক, আদর্শকে মর্মতঃ ব্যক্ত করতে পারাই বড় কথা। অর্থাৎ শুধু রূপে ট্র্যাজেডিকল্পই হওয়াই যথেষ্ট নয়, রসে ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না সেইটিই বড় বিচার্য। প্রধানতঃ দুই কারণে ট্র্যাজেডি রসাদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। এক—ভাবশবলতা অর্থাৎ নানাভাবের সংমিশ্রণে স্থায়িভাবের গুণীভাব, দুই ঘটনা ও চরিত্রের অসম্ভবতা ও কৃত্রিমতা অর্থাৎ মেলোড্রামাসুলভ অবাস্তবতার লঘুতা। অন্যভাবের সংমিশ্রণে স্থায়িভাব গুণীভূত হ'লে অথবা তিরোহিত হ'লে সংবেদন যেমন ব্যাহত অথবা অন্যরূপ হ'য়ে যায়, তেমনি আবার ঘটনা ও চরিত্রের বাস্তবতা না থাকলে উপস্থাপ্য বিষয়ের অর্থ-গুরুত্ব হ্রাস পায়, বিষয়টি হেয় বা তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায় এবং রসনিষ্পত্তি যথেষ্টমাত্রায় ঘটে না। এই নাটকের শেষ অংশে নতুন একটি ভাবকে অধিকমাত্রায় মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভাব-শবলতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—এ কথা ঠিক, কিন্তু নতুন ভাবটি স্থায়িভাবকে সামান্য মাত্রায় আচ্ছন্ন করলেও, সম্পূর্ণ তিরোহিত করেনি এ কথাও অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে নাটকের শেষ দিকে নাট্যকার পতনের বেদনা সঞ্চার করার চেয়ে পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার দিকেই একটু বেশী ঝুঁকে পড়েছেন, জাতিপ্রীতির উপরে মানবতা প্রীতির উচ্চতর আদর্শের মহিমাকে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন এবং মহাবৎ খাঁ ও অমরসিংহ দুই মেবারীকেই মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে অনুতপ্ত ও 'আলিঙ্গনাবদ্ধ'

করেছেন। ফলে মেবার-পতন জনিত বেদনা অবাধে ব্যক্ত বা সঞ্চারিত হ'তে পারেনি। মনে রাখা দরকার—দেশ বা জাতি প্রেমের গৌরব অধিক বলেই তো মেবারের পতন এত শোচনীয়। জাতিপ্রেমের বা দেশপ্রেমের গৌরব যে অনুপাতে ক্ষুণ্ণ করা হবে, সেই অনুপাতেই মেবার-পতনের শোচনীয়ত্ব কমে যাবে। জাতিপ্রেমের বা দেশপ্রেমের ভাববন্ধকে নিরপেক্ষ মর্যাদা না দিলে পরাধীনতার বেদনাকে কিছুতেই তীব্রসংবাদী ক'রে তোলা যাবে না। নাটকের শেষাংশে নাট্যকারের মুখপাত্র "মানসী" মনুষ্যত্বের মহিমাকে বড় করতে গিয়ে যে ভাবে 'স্বজন দেশ' ডুবিয়ে দিয়েছেন, তা'তে দর্শক পাঠকের মনে শোচনার ও মনুষ্যত্ব-প্রীতির আবেগের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব না এসে যায় না এবং তা'তে মেবার পতনজনিত শোচনার বেগও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন আবেগের স্তিমিত হওয়া এক কথা, তিরোহিত বা মারাত্মক মাত্রায় আচ্ছন্ন হওয়া ভিন্ন কথা। মানসীর মনুষ্যত্বপ্রেমের উচ্ছ্বাস মেবার-পতনের শোকাবেগকে স্তিমিত করেছে বটে, কিন্তু তিরোহিত করতে পারেনি। গোবিন্দসিংহের এবং অমরসিংহের অন্তর্দাহ ও আর্তনাদ এবং শোকক্ষিপ্ত চিত্তের উদভ্রান্ত আচরণে মেবার-পতনজনিত শোচনা যথেষ্টমাত্রায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এমন কি মহাবৎ খাঁ অমরসিংহের পারস্পরিক ক্ষমা প্রার্থনায় এবং আলিঙ্গনে মনুষ্যত্বপ্রীতির জয় সূচিত হ'লেও এবং হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে একজাতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সংকল্প সংকেতিত হ'লেও, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে কমেডির আবহাওয়া চোখে পড়লেও, মেবার-পতনের অপূরণীয় ক্ষতির বেদনা অবিরাম বাজতেই থাকে এবং থাকে বলেই নাটকটির পরিণাম বেদনাত্মক। অতএব পরিণামের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, নাটকখানিকে বেদনাত্মকই অর্থাৎ ট্র্যাজেডিই বলতে হবে।

এবার অন্য একটি প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। স্বীকার করা যাক—নাটকখানির ঘটনা-বিন্যাস করা হয়েছে ট্র্যাজেডির আদর্শেই (pattern).

এবং নাটকখানির উপসংহারও বেদনাত্মক হয়েছে ; কিন্তু প্রশ্ন এই—ঘটনার প্রকৃতিতে এবং চরিত্রের আচরণে ট্র্যাজেডির গুরুগাম্ভীর্য অক্ষুন্ন রয়েছে কি না। যে মনোভাব (attitude) নিয়ে বিশিষ্ট রসিকরা ট্র্যাজেডিকে গ্রহণ করে থাকেন সেই মনোভাব এখানে থাকে কি না। আরো স্পষ্ট করে এবং নাটক-বিচারের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়—নাটকখানি ট্র্যাজেডির গভীরতা ও গাম্ভীর্য হারিয়ে মেলোড্রামার মতো রোমাঞ্চকর-ঘটনাসর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে কি না। এই প্রশ্নটির আলোচনা করবার সময় প্রথমতঃ এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঔচিত্য ও বাস্তবতা—নাটকের প্রাণস্বরূপ হলেও ঔচিত্যবোধ ও বাস্তবতাবোধ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ তথা আপেক্ষিক—যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাদেরও পরিবর্তন ঘটে। বলা বাহুল্য অতীতে এবং রোমান্টিক যুগে যে সমস্ত নাটকাদি লেখা হয়েছে, তাদের ঘটনা ও চরিত্রকে আজকের 'logic and reality'-র মান দিয়ে বিচার করলে অনেক অসঙ্গতি বেরিয়ে পড়বে—বহুক্ষেত্রেই "মেলোড্রামাটিক" মনে হবে। এলিজাবেথের যুগের রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলেই দেখা যাবে—ঘটনার ও চরিত্রের আচরণগত ঔচিত্য তথা বাস্তবতা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুন্ন হয়ে গেছে। তাই সমালোচকরা রোমান্টিক" আখ্যা দিয়ে এদের স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থান করে দিয়ে থাকেন এবং কোন কোন বিষয়ে 'লাইসেন্স' দিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। আমি বলতে চাই—ইয়োরোপীয়, রোমান্টিক ট্র্যাজেডি'কে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে আমাদের রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলিকে তা' থেকে বঞ্চিত করা সঙ্গত কাজ হবে না। অবশ্য তা'ই বলে কেউ যেন মনে না করেন—স্বদেশের কুকুরকেও ঠাকুর বলতে হবে—বাংলাভাষায় সব মেলোড্রামাকেই ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান দিতে হবে, আমি সেই কথাই বলছি। আমি বলছি এই যে রোমান্টিক নাটকে ঘটনার চমৎকারিত্বের এবং ভাবোচ্ছাসের দিকে যেটুকু বেশী ঝোক

থাকে তাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের রোমাণ্টিক নাটকগুলি বিচার করতে হবে। দ্বিতীয়ত মনে রাখা দরকার কোন কোন ঘটনায় বা চরিত্রের আচরণে মেলোড্রামা-সুলভ কৃত্রিমতা ও রোমাঞ্চকরতা থাকলেই নাটককে মেলোড্রামা আখ্যা দেওয়া অশাস্ত্রীয় কাজ। মেবার-পতন নাটকের একাধিক চরিত্রে মেলোড্রামাটিক আতিশয্য (গ্রাম্য প্রয়োগে-আধিখ্যেতা) আছে এবং তা' ঐতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব-গাম্ভীর্যের পক্ষে অপকর্ষকও বটে, কিন্তু মেলোড্রামা বলার আগে বিচার করতে হবে সেই দোষ-ত্রুটি এত মারাত্মক হয়ে উঠেছে কি না যাত বলা যেতে পারে—বিষয়-বস্তুর গুরুত্বকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়ে, সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টিতে—লঘু ও নিরর্থক ঘটনা চমৎকারে—পরিণত করেছে, ঘটনা-চমৎকারেই নাটকের আবেদন শেষ হয়ে যায় এবং আমাদের জ্ঞানে-অনুভবে-বাসনায় নাটকখানি কোনরূপ স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করে না। আগেই বলা হয়েছে—রচনাটি 'মেবার-পতন'-রূপ ঐতিহাসিক ঘটনার (হিন্দু-অভিমানের কাছে অবশ্যই শোচনীয় ঘটনা) রোমাণ্টিক উপস্থাপনা এবং এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে একাধিক চরিত্রের আচরণে মেলোড্রামা-সুলভ এমন উচ্ছ্বাস ও অনৌচিত্য বা অবাস্তবতা রয়েছে যাতে আধুনিকরুচি অর্থাৎ অবাস্তবতা-অসহিষ্ণু সমালোচক নাটকখানির উপস্থাপনাকে 'রোমাণ্টিক' না বলে মেলোড্রামাটিক বলতেই বেশী ঝোঁক দিতে পারেন। তা' পারেন এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি এ কথাও উপেক্ষণীয় নয় যে উপস্থাপনায় মেলোড্রামার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া এবং সমগ্র সৃষ্টির মেলোড্রামায় পর্যবসিত হওয়া এক কথা নয়। যতখানি গুরুত্ব থাকলে নাটকের ট্র্যাজেডি-মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে, ততখানি গুরুত্ব যদি থেকে থাকে তা' হলে নাটককে মেলোড্রামা না ব'লে ট্র্যাজেডি বলাই যুক্তিযুক্ত।

দেখা যাক এই গুরুত্ব আছে কি নেই। বহা বাহুল্য— এই গুরুত্বের বিচার শুধু

মস্তিষ্কের নৈয়ায়িক বুদ্ধির উপরে নয়, হৃদয়ের গ্রহণশক্তির উপরেও নির্ভর করে। লঘু-গুরু-বোধ বোধ ও অনুভবের সংযোগে তৈরি একটি মানসিক অবস্থা বিশেষ। গৃহীত বিষয় যেখানে বিষয়ীর জ্ঞান-অনুভব-বাসনাত্মক মানস সত্তায় আবেদন ক'রে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যা বিষয়ীর চেতনাবন্ধকে তীব্রভাবে উত্তেজিত ক'রে তোলে, সেই অবস্থাতেই বিষয়ী বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ (serious) ব'লে স্বীকার করে থাকে। গ্রাহ্য—'বিষয় এবং গ্রহীতা বিষয়ী', উভয়ের প্রকৃতির দ্বারা বোধসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মেবার-পতন নাটকের বিষয়-বস্তুর প্রকৃতি (রাজপুত জাতির বা হিন্দুশক্তির আত্মরক্ষার সংগ্রাম—বা সংকট—অর্থাৎ একটা জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম—এবং শোচনীয় পরাজয়) উচ্চগ্রামীন ভাবাদর্শে-অনুপ্রাণিত পাত্র-পাত্রীদের আচরণে, জীবনের তীব্র-গভীর আবেগের প্রকাশ, সূক্ষ্ম অনুভূতির অভিব্যক্তি এবং মহত্তম আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাকুলতা—সামাজিকের চেতনা-বন্ধে ও বেদনাবন্ধে গুরুত্ব-বোধক আবেদনই সৃষ্টি করে থাকে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদন [(Pleasure-Value + influence Value), (Beauty-Value + Social Utility)] শুধুমাত্র কাহিনী কৌতুহলের সংকীর্ণ সীমাতে পৌঁছেই শেষ হয়ে যায় না—চেতনাকে ও বেদনাকে যথেষ্টমাত্রায় নাড়া দেয়। নাটকের শেষ বিচার যে আদালতে হয় সেই অভিনয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অভিনয়ে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদনের যে মাত্রা ধরা পড়েছে এবং এখনও পড়ে, তা'তে এই সিদ্ধান্তই করা উচিত—নাটকখানির উপস্থাপনা অতিরোমান্টিক—হ'লেও নাটকখানিকে মেলোড্রামা" বলা চলে না। উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির পংক্তিতে এর কোন স্থান নেই এ কথা যত সত্য, তত সত্য এই কথাটিও যে ট্র্যাজেডির গণ্ডীর বাইরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার বা একেবারে অপাংক্তেয় করার মতও নয়।

নাটকের অঙ্গী-রস বিচার এখানেই শেষ।

যা' হোক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল মেবার-পতন নাটকের 'অঙ্গী-রস' করুন বা 'ট্র্যাজিক' এবং দেশরতিকে আশ্রয় ক'রেই ধর্মাঘাতজনিত এবং শোককৃত করুণ নিষ্পন্ন হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েই অমরসিংহ ও গোবিন্দসিংহ শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের আবর্তে তলিয়ে গেছেন, দেশপ্রাণা সত্যবতীর স্বপ্নের ঘোর ভেঙ্গে গেছে, জীবনবীণার তার ছিঁড়ে গেছে, পরাধীন মেবারের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে ভগ্নপ্রাণে সত্যবতী আর্তনাদ করেছে। জীবন-ব্যাপী দেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে সগরসিংহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে দেশপ্রীতির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এমনকি জাতিতে-রাজপুত হ'য়েও যে ধর্মে-মুসলমান সেই মহাবৎ খাঁ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত দেশপ্রীতির, জাতিপ্রীতির প্রেরণাতেই, অনুতাপ প্রকাশ করেছে, স্বাকার করেছে—নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া, পৈশাচিক উল্লাসে তার উত্থিত ধূমরাশি দেখা—মহাপাপ এবং সেই মহাপাপ সে করেছে। তার মধ্যে অবদমিত দেশরতি ও জাতিপ্রীতির সঙ্গে অন্যান্য প্রবৃত্তির বা অভিমানের দ্বন্দ্ব ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশরতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। মোট কথা দেশরতি বা জাতিপ্রীতিই এই নাটকের মূলভাব এবং উল্লিখিত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য এই ভাবটির সদ্ভাবের এবং অভাবের মাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অমরসিংহের মধ্যে দেশরতির সদ্ভাব আছে বটে, কিন্তু পরিস্থিতি চেতনা ও অন্যান্য চিন্তাও আছে অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার চেতনাও কম প্রবল নয়। ফলে, তার আচরণে দেশরতির নিরপেক্ষ, ঐকান্তিক এবং অবাধ প্রকাশ পাওয়া যায় না; বাস্তব পরিস্থিতি চেতনা এসে বারে বারে দেশরতির অবাধ স্ফূর্তিকে বাধা দিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত দেশরতিই প্রাধান্য লাভ করেছে।

গোবিন্দসিংহ দেশরতির নিরপেক্ষ ও ঐকান্তিক অভিব্যক্তি। পুত্র-কন্যা স্বার্থ, প্রাণ সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর দেশ। দেশরতির ঐকান্তিক ও উন্মত্তপ্রায় আবেগ দিয়েই গোবিন্দসিংহের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত গঠিত। কোন

ভয়ংকর বাস্তব পরিস্থিতি এসে ার আবেগকে স্তিমিত করতে পারে না। অনিবার্য মৃত্যু সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েও তাঁর চিত্তে দ্বিধা জাগাতে পারে না। সত্যবতী গোবিন্দসিংহেরই ভিন্ন মূর্তি, চারণী-মূর্তি, সঞ্চারিণী মূর্তিমতী "দেশরতি"। সত্যবতীর কাছেও পিতা নেই, পুত্র নেই, ভ্রাতা নেই, আছে শুধু "দেশ"। পিতা তখনই পিতা যখন পিতা দেশভক্ত, পুত্র তখনই পুত্র যখন সে দেশকে ভালবাসে, ভ্রাতা তখনই ভ্রাতা যখন দেশের জন্য তার প্রাণ কাঁদে। দেশের গৌরবই তার প্রাণ এবং সেই গৌরবহানিতেই তার মহতী বিনষ্টি। সগরসিংহের চরিত্রে দেশরতিরই অভাবাত্মক প্রকৃতিটি ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশরতিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সাধনা দ্বারা অবদমিত করার ফলে সগরসিংহের মধ্যে দেশরতি অসৎকল্প হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল; সগরসিংহ বিকৃত জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু যা সৎ তার অভাব অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভাব সম্ভব নয় এবং তা' নয় বলেই অবস্থাচক্রে একদিন দেশরতি মুক্ত হ'ল—আপন গতিবেগে স্বার্থের সব সঞ্চয় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রাণ দেওয়ার শক্তি হারিয়ে প্রাণের ভয়েই যিনি সঙ্কুচিত হ'য়েছিলেন, প্রাণের বিনিময়ে মান বিক্রয় করেছিলেন, নিজের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েই তিনি মানের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরলেন। সগরসিংহের ইচ্ছা-শক্তি বিকৃত হয়েছিল, ইচ্ছার মজ্জাটিতে পচনও ধরেছিল বটে, কিন্তু যাকে বলে গোড়া পঁচে যাওয়া তেমন কিছু হয়নি। গোড়া পঁচে গিয়েছিল গজসিংহের। গজসিংহ দেশরতির অভাবের নিদর্শন—অতি-কোটিক নিদর্শন—হাস্যোদ্দীপক বিকৃতি। মহৎ কাম্য এবং মহামূল্য দেশপ্রীতির বিপরীত ভাবকে হাস্যস্পদ করবার জন্যই গজসিংহের সৃষ্টি। কিন্তু মহাবৎ খাঁ দেশরতির অভাবের নিদর্শন হ'লেও, তার চরিত্র সগরসিংহের বা গজসিংহের চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র এবং শতগুণে জটিল। এই জটিলতার কারণ তার বিশেষ পরিস্থিতি—তার দ্বিধাবিভক্ত সত্তাটি। মহাবৎ জাতিতে রাজপুত, কিন্তু ধর্মে মুসলমান। অতএব, যে যুগে ধর্ম ও জাতি এক, এবং ধর্মত্যাগের অর্থই জাতি-

চ্যুতি সেই যুগে মহাবৎ খাঁর জীবনে সংকট অনিবার্য। একদিকে বিবেকসম্মত ধর্ম ত্যাগ করলে বিবেক বিসর্জন দিতে হয়, অন্যদিকে জাতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে হ'লে জাত্যভিমানে আঘাত লাগে, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের বিরুদ্ধে, নিজের হৃদয়েরই বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব করতে হয়—আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। মহাবৎ অবস্থাচক্রে এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করেছে যা' মোগল সম্রাটের ধর্ম এবং যা' গ্রহণ করায় সে রাজপুত ব'লে পরিচয় দেওয়ার অধিকার হারিয়ে মোগল সম্রাটের সেবা করতে বাধ্য হয়েছে এবং মোগল বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হয়ে স্বদেশ মেবারেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। দেশরতি বা জাতিপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও তাকে এমন কাজ করতে হয়েছে যা' উৎকট দেশদ্রোহিতারই পরিচায়ক, যা'—মহাবৎ খাঁর নিজেরই ভাষায়—নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া। স্বজাতির সংকীর্ণতায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে গর্বী মহাবৎ অভিমান চরিতার্থ করতে অথবা স্বজাতিকে চরম শিক্ষা দিতে যা' ক'রেছে তাকে দেশদ্রোহিতার নিদর্শন অর্থাৎ দেশরতির অভাবের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ঘর পরিষ্কার করতে ঘরে আগুন দেওয়া যে ধরণের বিকার, মহাবতের আচরণেও তেমনি বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবতের বিকৃতি সমীক্ষণ করে এ কথা বলা যায় যে ধর্ম ও জাত্যভিমানের সামঞ্জস্য ঘটতে পারেনি ব'লেই জাতি-প্রীতির আবেগ অবদমিত হয়েছে এবং হ'তে হ'তে জাতিরই বিরুদ্ধে 'আক্রোশ'-ভাববন্ধে পরিণত হয়েছে এবং মারাত্মক নিষ্ঠুর আক্রমণের রূপে সেই আক্রোশ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বাইরের সমস্ত নিষ্ঠুর আচরণের অন্তরালে রয়েছে সেই রাজপুতটি যে কল্যাণীকে গ্রহণ করতে চায় সঙ্গিনী রূপে, সত্যবতীর হৃদয়ের স্নেহ পেতে চায় ছোট ভাই মহীপৎ রূপে, মেবারের রাণা অমরসিংহকে যে ভাই ব'লে গর্ব-বোধ করে—আলিঙ্গন করতে চায় এবং যে মনেপ্রাণে মেবারের রাণার জয় কামনা করে। অথচ তার ট্র্যাজেডি, সকলেই বাইরে থেকে দেখে মহাবৎখাঁকে,

সকলেই তাকে ঘৃণা ক'রে বিধর্মী ও দেশদ্রোহী ব'লে ; কিন্তু ভিতরকার ঐ রাজপুত টিকে কেউই দেখে না, কেউই ভালবাসে না—ভালবাসতে পারে না। কেউ তলিয়ে দেখতে যায় না যে মহাবৎ যে আজ শত্রুশিবিরে সে শুধু মহাবতেরই একার দোষে নয়, যে বাহু রাজপুত সৈন্যের বাহুর সঙ্গে যুক্ত হ'লে মেবার কোনদিনই পতিত হ'ত না সেই বাহুকে ঘৃণা ও উপেক্ষা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে মেবার নিজেই।

যা' হোক মহাবৎ শত্রুশিবিরে যোগ দিয়ে আক্রোশবশে নিজের ঘরে নিজের হাতে আগুন দিয়েছে—এ পাপের জন্য সে অবশ্যই দায়ী এবং পাপ বা অন্যায় ব'লে স্বীকারও করেছে সে। অমরসিংহের কাছে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও সে করেছে। কিন্তু মেবারও কম অপরাধী নয়। মেবারের পক্ষ থেকে অমরসিংহ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মেবারের ট্র্যাজেডি এই যে অমর-সিংহ-মহাবতের ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে—পতিত মেবারের শবের পাশে দাঁড়িয়ে—শ্মশানে এসে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে—মেবারের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলে, যে জীবনগুলি ট্র্যাজেডির আবর্তে তলিয়ে গেছে বা আবর্তিত হ'তে হ'তে, সংঘাতে সংঘাতে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তাদের তালিকায় মহাবতেরও নাম অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে অমরসিংহ গোবিন্দ-সিংহের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছে তা' যতখানি 'ট্র্যাজিক' পদবাচ্য, সত্যবতীর এবং মহাবতের মনস্তাপ ততখানি 'ট্র্যাজিক'-পরিণতি লাভ করেনি। মহাবতের চরিত্র বা প্রকৃতির সব দিক যতখানি পরিস্ফুট হ'লে, তার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ তীব্রতর ও শোচনীয় আকারে ব্যক্ত হ'তে পারত তা' এখানে হয়নি এবং হয়নি বলেই মহাবতের জীবনের ট্র্যাজেডি অনেকটা অনুমানগম্য হয়ে আছে। যে ধরণের বিপত্তি ঘটলে পরিণামকে যথার্থ ট্র্যাজিক বলা যায় তা' ঠিক ঘটেনি। তবে তাই ব'লে তাকে কমেডির আলম্বনও বলা চলে না—তাকে 'সুখী ব্যক্তি' ব'লে গণ্য করা যায় না। বৃত্তিসমূহের যে সামঞ্জস্যে

'সুখের' উদয় হয় সে সামঞ্জস্য তার চরিত্রে ঘটেনি। যেমন তা ঘটেনি কল্যাণীর এবং মানসীর জীবনে।

কল্যাণীর জীবনে প্রেমের দাবী খুবই ঐকান্তিক। কিন্তু সেই দাবী অপূর্ণই রয়ে গেছে অর্থাৎ কল্যাণীর জীবন তার আসল অর্থই হারিয়ে ফেলেছে। যদিও মানসীর প্রেরণায়, মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ ক'রে কল্যাণী ব্যর্থ-প্রেমকে পূর্ণ করতে চেয়েছে, উচ্চতর ভাবের ভূমিতে সার্থকতা লাভের চেষ্টা করেছে, তবু তার জীবনকে কিছুতেই সুখী জীবন বলা যায় না। এ কথা কিছুতেই বলা চলে না—কল্যাণীর জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ, সমস্ত দুঃখ দ্বন্দ্বের শেষে নিরুদ্বেগ আনন্দের বা সন্তোষের জীবনে পরিণত হয়েছে। মানসী সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যায়। যদিও মানসীর জীবনে উচ্চতর ভাব-রতির আধিক্য বা প্রাধান্য রয়েছে, যদিও মানসী পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে বেশী সুখ অনুভব করে এবং যদিও সে দেখেছে—তার কর্তব্যপথ জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রসারিত, অর্থাৎ যদিও মানসী মহত্তর ভাবের দাবী মেটানোর মধ্যে "আপনাকে" অর্থাৎ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে সচেষ্ট, তবু শত মুখের কথা বা ঘোষণা সত্ত্বেও তার অন্তরের নিগূঢ় ব্যথার কথা ভুলে যাওয়া যায় না। অজয়ের মৃতদেহের পাশে "দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও দীন" যে মানসীকে আমরা দেখেছি, তার যে শোকোন্মত্ত—"প্রেম-ভিখারিণী দুর্বলা রমণীর" রূপ আমরা দেখেছি, তা'তে ব্যর্থ প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করার হাজার চেষ্টা দেখলেও মানসীকে কেউ প্রকৃত সুখী ব'লে মনে করতে পারবে না। সেবা-সুখের যত হাসিই তার মুখে ফুটে থাক, ক্ষয়ক্ষতির বেদনা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, বিষাদের ছায়ায় তার জীবন আচ্ছন্ন।

মনুষ্যত্ব-ভাব-রতির প্রাধান্য থাকার ফলে যদিও মানসীকে আমরা বিশ্বপ্রেম-রসের অবলম্বন ব'লে গণ্য করতে প্রবণায়িত হই, কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে ট্র্যাজেডি-কমেডির দুই কোটির কোন একটিতে মানসী-

চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে, কমেডির চেয়ে ট্র্যাজেড়ির কোটিকেই বেছে নেওয়ার ঝোঁক স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

এখানেই রস ও চরিত্র আলোচনার উপসংহার করা যাক। অন্যান্য রস এবং চরিত্র সম্বন্ধে গঠন-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যেটুকু বলা হয়েছে, আশা করি তা' থেকেই কৌতূহলী পাঠকের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হবে।

(সমাপ্ত)